সাইমুম-৫২

ক্লোন ষড়যন্ত্র

আবুল আসাদ

ইবুক সম্পর্কে কিছু কথা

সম্মানিত পাঠক,

আসসালামু আলাইকুম

সাইমুম সিরিজকে অনলাইনে টেক্সট আকারে আনার লক্ষ্য নিয়ে ২০১২ সালের ১৭ই আগস্ট গঠন করা হয় সাইমুম সিরিজ-ইউনিকোড প্রোজেক্ট (SSUP) গ্রুপ। তারপর বিভিন্ন ব্লগে ও ফেসবুকে প্রোজেক্টের জন্য স্বেচ্ছাসেবক আহ্বান করা হয়। সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে এগিয়ে আসেন একঝাক স্বেচ্ছাসেবক এবং এই স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে গঠিত হয় সাইমুম সিরিজ-ইউনিকোড প্রোজেক্ট টীম। টীম মেম্বারদের কঠোর পরিশ্রমে প্রায় ৮ মাসে সবগুলো সাইমুম অনলাইনে আসে। মহান আল্লাহ সবাইকে উত্তম প্রতিদান দিন।

ওয়েবসাইটঃ www.saimumseries.blogspot.com

ফেসবুক পেজঃ www.facebook.com/SaimumSeriesPDF

ফেসবুক গ্রুপঃ www.facebook.com/groups/saimumseries

১

গৌরীর ডাইরীর পাতা উল্টিয়ে চলেছে আহমদ মুসা।

ডাইরির পাতার দুই-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত লেখা।

বিস্মিত্ আহমদ মুসা! স্বগত কন্ঠে বলল, তবে যে গৌরী বলল সুড়ঙ্গে আমাকে প্রবেশ করতে দেখে সে ডাইরি লিখেছে, যা পড়ার জন্যে আমাকে বলেছে। কিন্তু পনের বিশ মিনিটে কি কেউ এতটা লিখতে পারে!

ডাইরির পাতা উল্টিয়েই চলল আহমদ মুসা।

ডাইরির পাতার দুই-তৃতীয়াংশের মত শেষ হলো।

শেষের কয়েকটা পাতা লাল কালিতে লেখা।

আহমদ মুসার বুঝার বাকি রইল না নিশ্চয় এই লাল কালির লেখাগুলোই গৌরী তার জন্যে লিখে গেছে।

পড়া শুরু করল আহমদ মুসা:

'আমার নিজের কথা শেষ করতে পারলাম না। তোমাকে সুড়ঙ্গে দেখে..., মনে কিছু করো না 'তুমি' বলেই সম্বোধন করলাম। তোমাকে সেদিন হোটেলে দেখার পর থেকেই কেন জানি মনে হচ্ছে, শত বছরের চেনা তুমি আমার, যাকে 'আপনি' বলে দূরে ঠেলে দেয়া সম্ভব নয়। যে কথা বলছিলাম, তোমাকে সুড়ঙ্গে

দেখার পরেই আমার মনে হলো আমার সময় শেষ। তোমাকে আমার সাহায্য করতেই হবে। সেটা শুধু তোমার জন্যে নয়, আমার জন্যেও। আমার কথা, যা এ পর্যন্ত লিখেছি, পড়লে দেখতে পাবে, আমি আমাকে, আমার পরিবারকে মুক্ত করার জন্যে ব্ল্যাক সানে যুক্ত হয়েছিলাম। কিন্তু এখানে এসে সবই হারিয়েছি। তুমি আর কি কি করবে সব আমি জানি না, কিন্তু তুমি আমার সেভিয়ার তা নিশ্চিত। তোমার দ্বারা মুক্তি ঘটবে আমার আত্মার, এই অন্ধকার জীবন থেকে। আমি আনন্দিত। দু:খ আমার একটাই আমার পরিবারকে আমি রক্ষা করতে পারলাম না। এই রক্ষা করতে না পারার দু:খ আমার, সে কথা তোমাকে বলার জন্যেই আমার এই লেখা।

সেটা আমার পরিবারের চরম দুর্ভাগ্যের কাহিনী, আমার আতংকের কাহিনী।

আমাদের দুর্ভাগ্য, আমাদের আতংক আমার মাকে নিয়ে। আমার ২২ বছর বয়স পর্যন্ত মাকে নিয়ে আমার এই আতংক মনে জাগেনি। আমার মা আমাদের পরিবারের কেন্দ্রবিন্দু। আমরা দু'বোন ও আমার বাবার প্রাণ যেমন আমাদের মা, তেমনি আমরাও তার প্রাণস্বরূপ। অত্যন্ত সুখী ছিল আমাদের পরিবার।

আমার নির্মেঘ এই সুখের আকাশে প্রথম কালো মেঘ মাথা তুলল, আমার ২২ বছর বয়সে, যা আগেই বলেছি। শিক্ষা জীবনের চৌকাঠ পেরিয়ে সবে বন বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকেছি একজন জুনিয়র অধ্যাপক হিসাবে। শুরুর দিকে বাড়ি থেকে গিয়েই ক্লাস নিতাম, রাইন হাইওয়ে ও রাইন রেল কমিউনিকেশন এত সুন্দর যে, আমাদের বাড়ি থেকে বনকে 'নেক্সট ডোর' বলে মনে হতো। এর ফলে বাড়িতে অনেক বেশি সময় দিতে পারতাম। প্রথম ঘটনাটা ঘটল এই সময়ের এক রোববারে। দিনটা ছিল মেঘলা-যে কোন সময় বৃষ্টি আসবে এরকম অবস্থা। দু'তলায় আমার শোবার রুম থেকে নামছিলাম, নামতে নামতে দেখলাম সিঁড়ির জানালা খোলা। এগিয়ে যেয়ে জানালা বন্ধ করলাম। ঘুরে দাঁড়িয়ে সিঁড়ির ধাপের দিকে আসছিলাম। দেখলাম আমার আম্মার শোবার ঘরের পাশে তার ড্রেসিং রুমের ছোট ভেন্টিলেশনটা খোলা, যা সব সময় ভিতর থেকে বন্ধ থাকে। বুঝলাম,

সাপ্তাহিক ক্লিনিং-এর সময় নিশ্চয় ক্লিনার বেচারা ভেন্টিলেশনটা বন্ধ করতে ভুলে গেছে।

আমি ভেন্টিলেটরের দিকে এগোলাম। ইচ্ছা ছিল, মাকে ডেকে দেখি, যদি তিনি ঘরে থাকেন, তাহলে ভেন্টিলেটর বন্ধ করতে বলব।

ছোট্ট জানালা দিয়ে আমি উঁকি দিলাম।

এ জানালা দিয়ে মা'র ড্রেসিং রুমটা দেখা যায়। এর পরেই মায়ের বেড রুম।

ভিতরে তাকিয়েই অপার বিস্ময় নামল আমার চোখে-মুখে! মায়ের মাথা ভরা কালো চুল খোলা, এলোমেলো। হেয়ার ড্রাইয়ে শুকাচ্ছেন। বিস্ময়ে আমার দুই চোখ ছানাবড়া- মায়ের মাথা থেকে সাদা চুল কোথায় গেল! তার মাথার সামনের দিকে অন্তত কয়েক গুচ্ছ চুল সাদা। তিনি চুলে কালার ব্যবহার কোন সময়ই করেন না। তাহলে সাদা চুল গেল কোথায়? কৌতুহল আমার তুংগে। জানালা থেকে সরে আসতে চাচ্ছিলাম। কিন্তু হলো না আসা। মা ড্রেসিং টেবিলে বসে ছিলেন। দেখলাম, তিনি দ্রুত ড্রয়ারের লক খুলে ছোট একটা বক্স বের করলেন। বক্সটি দ্রুত খুললেন। সাদা কালারের মত কিছু বের করলেন। তারপর সাদা কলপটি তুলে নিয়ে খুব যত্নের সাথে নির্দিষ্ট কয়েকটা গুচ্ছের উপর সাদা রংয়ের স্প্রে শুরু করলেন। অবাক বিস্ময়ে আমি দেখলাম, তার মাথার সামনের নির্দিষ্ট কয়েক গুচ্ছ চুল সাদা হয়ে গেল, যেমনটা আমরা দেখে আসছি।

ডায়িংটা ধীরে ধীরে শেষ করার সংগে সংগেই মা ডায়িং উপকরণগুলো ড্রয়ারে তালাবদ্ধ করে দরজা খুলে ড্রেসিং রুমের বাইরে চলে গেলেন। কৌতুহল ও বিস্ময় আমাকে এতটাই বিব্রত করেছিল যে, আমি কিছু বলতে পারলাম না। আমিও নেমে এলাম সিঁড়ি দিয়ে। ডাইনিং-এ মায়ের সাথে আমার দেখা হলো। বিষয়টা নিয়ে তাকে কিছু বলতে গিয়েও গলায় আটকে গেল। মন যেন কোন কারণে প্রবল বাধা দিল!

আরেক দিনের ঘটনা। আমি মায়ের স্টাডি রুমে ঢুকতে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ মায়ের একটা কথায় থমকে দাঁড়ালাম। তিনি বলছিলেন, 'কি বলছ তুমি, আমি

তো সবচেয়ে কষ্টে আছি! আত্মঘাতি অভিনয় করছি আমি। তাড়াতাড়ি শেষ করো।'

কথাগুলো আমার কানে পৌঁছার সাথে সাথে আমার গোটা দেহে দেহ অবশকারী এক ঠাণ্ডা স্রোত যেন বয়ে গেল!

আমি উঁকি দিয়ে দেখলাম, মা টেলিফোনে কথা বলছেন স্টাডি টেবিলে বসে।

আর শোনার ধৈর্য আমার ছিল না।

আমি সরে এলাম।

আমি ভেবে কুল পেলাম না। মা কী কষ্টে আছেন? কি আত্মঘাতি অভিনয় করছেন মা? কার সাথে টেলিফোনে কথা বলছিলেন তিনি?

প্রশ্নের কোন শেষ নেই! উত্তর নেই একটারও। এই সময় একদিন রাইনের তীরে নিরিবিলি একটা বেঞ্চিতে বসেছিলাম। একটু নিচ দিয়েই বয়ে যাচ্ছিল রাইনের শান্ত স্রোত। ভাবছিলাম মাকে নিয়েই। যতই ভাবি ততই মায়ের বিভিন্ন অসঙ্গতি আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। সেদিন মায়ের বাম হাতের বুড়ো আঙুলে একটা কাটা দাগ দেখলাম। দাগটা প্রথম দেখলাম। তার হাত নিয়ে কত খেলা করেছি এ দাগ কখনো দেখিনি! দাগটা কিন্তু পুরাতন। এত দিন চোখে পড়েনি কেন? অল্প সময়েই আরেকটা বিষয় আমার নজরে পড়েছে। সেটা হলো, মা এখন আমাদের অতীত জীবন মানে ছোটবেলা নিয়ে কোন সম্প্রীতির গল্প বলেন না। অথচ আমাদের পরিবারিক গল্পগুজবে ও আমাদের ব্যক্তি-সংশ্লিষ্ট কথাবার্তাতেও আমাদের ছোটবেলার বিভিন্ন ঘটনা ও কথাবার্তা আগে বলতেন। এখন মাকে এ ব্যাপারে কিছুই বলতে শুনি না।

এসব চিন্তার মধ্যে আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলাম। এ সময় একটা কন্ঠ আমার কানে গেল, 'মা, বসতে পারি?'

মাথা তুলে দেখলাম বাবা দাঁড়িয়ে।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বাবাকে স্বাগত জানিয়ে বললাম, 'বসুন বাবা।'

বাবা এ সময় রাইনের তীর ধরে নিয়মিত হাঁটেন। আজকেও হাঁটছিলেন। আমাকে দেখেই সম্ভবত থেমেছেন।

বাবার সাথে কথা শুরু হলো। আবহাওয়া নিয়ে, এলাকার অবস্থা নিয়ে, শেষে আমার চাকরি, আমার বোনের লেখাপড়া নিয়ে অনেক কথা হলো। শেষে আলোচনা আমাদের মা ও পরিবার বিষয়ে গড়াল। এক সময় বাবা কেমন যেন আনমনা হয়ে গেছে, বললেন, 'তোমরা বোধ হয় খেয়াল করনি মা, তোমার মা'র সেই যে অসুখ হলো, হামবুর্গ হাসপাতালে থাকল, তারপর তার শরীর-স্বাস্থ্যের খুবই উন্নতি হয়েছে, কিন্তু সে যেন বদলে গেছে মা।'

আমি চমকে উঠলাম। কিন্তু স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করে বললাম, 'তাই মনে করেন বাবা?'

'তাই তো মনে হয়। অতীত যেন তার কাছে মুছে গেছে, অথচ ব্রেনের স্ক্যান আমাদের মেডিকেল ফাইলে আছে। ওদিক দিয়ে সম্পূর্ণ সুস্থ সে।' বললেন বাবা।

'তাহলে বাবা?' আমি বাবার যুক্তিগুলো জানতে চাইলাম, যাতে আমার পাওয়া তথ্যের সাথে তা মেলানো যেতে পারে।

'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না মা। তবে আমি নিশ্চিত, তার দেহ, মন সব কিছুরই পরিবর্তন ঘটেছে।' বলল বাবা।

আমি চমকে উঠলাম। বাবা কি বলছেন বুঝলাম না। তিনিই তো মায়ের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ। সবই তিনি জানবেন। বাবার মুখের দিকে চাইতে পারলাম না। কিছু বলতেও পারলাম না আমি। বিস্ময়, বিভ্রান্তি আরও বেড়ে গেল।

বাবাই কথা বললেন, 'থাক মা এসব কথা। তুমি আমার বড় সন্তান, তাই তোমাকে আমি একথা জানালাম। তুমি এ কথাগুলো তোমার মধ্যেই রাখবে।'

বাবা উঠলেন। বললেন, 'চল মা, বাসায় ফিরি।'

আমাদের বাসা ক্রুমসারবার্গ দূর্গ থেকে কয়েকশ' গজ উত্তরে রাইনের তীরেই। আমাদের বাড়িটাও ক্রুমসারবার্গ দুর্গেরই একটা অংশ। ক্রুমসারবার্গ দুর্গের মালিকানা আমাদেরই ছিল। আমার নানী তার দাদুর কাছে শোনা অনেক গল্প বলতেন। নবম শতকে স্যাক্সনদের প্রথম রাজা হেনরি ও স্যাক্সনদের প্রথম সম্রাট অটো দি গ্রেটরা আমাদের পূর্বপুরুষ। তাদের দুর্গ ও প্রাসাদ ছিল এই ক্রুমসারবার্গেই। শুরুতে এর নাম ছিল দি নিডারবার্গ। ঊনিশ শতক পর্যন্ত

অধিকাংশ সময় এই দুর্গ এই অঞ্চলের বিশপের অধীন ছিল। বিভিন্ন সময় নাইটরা এখানে এসে বাস করতো। এক সময় এটা তাদের দখলে চলে যায়। তবে আমাদের পূর্বপুরুষের ক্রুমসারবার্গ দুর্গ তাদের দখলে গেলেও এ দুর্গের কিছু দূরের আরেকটি প্রাসাদ আমাদের পারিবারিক দখলে থেকে যায়। এ প্রাসাদটি তৈরি হয়েছিল ১১৮০ খৃস্টাব্দে অটো দি গ্রেটের পৌত্র ডিউক হেনরি দি লায়নের জন্যে। হেনরি তার চাচাত ভাই সম্রাট ফ্রেডারিক রোমার আনুগত্য করতে অস্বীকার করেন এবং স্যাক্সন-সম্রাট অটো দি গ্রেটের রাজা দুই ভাগ হয়ে যায় তাদের মধ্যে। সেই থেকে ডিউক হেনরির এই বাড়িটি নানা উত্থান-পতনের মধ্যে দিয়ে আমাদের পারিবারিক দখলে রয়ে গেছে। এছাড়াও রাইনের এপার-ওপারে দশ হাজার একরের একটা ফার্মল্যান্ড আছে আমাদের। অতীত সাম্রাজ্যের এই একটাই স্মৃতিচিহ্ন আমাদের।

হাঁটতে হাঁটতে আমরা বাড়ি পৌঁছলাম।

ভিতরে ঢুকে অবাক হলাম। জিনিসপত্র সব লণ্ডভণ্ড।

প্যাকিং চলছে।

বাইরের ড্রয়িংই রুমেই আম্মা বসে আছেন।

আমরা ভিতরে ঢুকতেই আম্মা বসে থেকেই বলল বাবাকে লক্ষ্য করে, ‘তোমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারলে না। আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছি। কাল সকালেই আমরা বনে শিফট হচ্ছি।’

‘সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছ?’ বলে আর কিছু না বলে বাবা তার ঘরের দিকে চলে গেলেন। অনেক দিন থেকেই মা জেদ ধরেছেন সবাইকে নিয়ে বনে গিয়ে থাকবেন। খুব সাধারণ হলেও থাকার মত বাড়িও কিনেছেন। তার যুক্তি, ছোট মেয়ে বনে লেখাপড়া করে, বড় মেয়ে বনের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি করে। সুতরাং বনে থাকাই ভালো। মা’র এ প্রস্তাবে আমরা কেউ রাজি হইনি। বাড়ি ও ফার্মল্যান্ড আমাদের প্রাণ। এসব ছেড়ে বনে গিয়ে থাকার কোন যুক্তি নেই। কিন্তু মা আমাদের কথা মেনে নেননি। অবশেষে তার জেদই তিনি রাখলেন।

‘হঠাৎ এই সিদ্ধান্ত কি ঠিক হলো মা? কোথাও থাকার বিষয়টা তো সকলের।’ বাবা চলে যেতেই বললাম আমি।

‘চুপ করো। এ নিয়ে আর কোন কথা বলব না আমি।’ বলল মা।

‘এ তোমার জেদ মা। এত বড় বাড়িটার কি হবে?’ বললাম আমি।

‘সে ব্যবস্থা আমি করেছি। ফার্মল্যান্ড ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব যাদের দিচ্ছি, তারাই থাকবে এ বাড়িতে। এর জন্যে আলাদা পয়সা পাওয়া যাবে।’ মা বলল।

‘ব্যবস্থা তুমি কবে করলে মা? বাবা জানেন?’ বললাম আমি।

‘আমি যখন ওদের সাথে কথা বলি, তখন উনি আমার সব কথাই শুনেছেন।’ মা বলল।

‘বাবা কিছু বলেনি?’ বললাম আমি।

‘তোমার বাবার জন্যে বলার তেমন কিছুই ছিল না।’ মা বলল।

মা’র কথা আমার কানে খুব বাজল। মনে হলো বাবার কোন অবস্থানই তাঁর কাছে নেই। আমি চমকে উঠলাম। মা তো এমন ছিলেন না! বাবার মত নেয়া ছাড়া মা পরিবারের ছোট-খাট সিদ্ধান্তও নিতেন না। আমি চমকে উঠলাম ভীষণভাবে। মা কি বদলে গেছেন, বাবা যেমন বললেন? কিন্তু মা কি এভাবে বদলাতে পারেন? না, পারেন না। তাহলে?

পরদিন সকালে ব্রুমসারবার্গের আমাদের বাড়ি থেকে যাবার মুহূর্ত। মালপত্র সব চলে গেছে।

আমরাও যাবার জন্যে প্রস্তুত। গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। তিনটি গাড়ি।

আমাদের দু’টি, অন্যটি অপরিচিত।

‘ঐ গাড়িটি কেন?’ আমি বললাম।

আমার পাশে বাবা দাঁড়িয়ে ছিল। বলল, ‘আমি এনেছি।’

‘কেন? দু’টি গাড়িই তো আমাদের দরকার হয় না।’ আমি বললাম।

‘আমি হামবুর্গ যাচ্ছি মা, বন যাচ্ছি না।’ বলল বাবা।

হামবুর্গ আমার বাবার পৈত্রিক বাড়ি। উল্লেখ্য,ব্রুমসারবার্গ প্রাসাদ ও দশ হাজার একরের ফার্মল্যান্ড আমার মায়ের পৈত্রিক সম্পত্তি। এত বড় সম্পত্তি অরক্ষিত থাকবে এই কারণে মায়ের একান্ত অনুরোধ বিয়ের পর বাবা ব্রুমসারবার্গে এসে স্থায়ীভাবে বসবাসের সিদ্ধান্ত নেন।

বাবার কথায় আমি আকাশ থেকে পড়লাম।

আমি রাজ্যের বিস্ময় নিয়ে মা'র দিকে তাকালাম। বললাম, 'মা, বাবা হ্যামবুর্গ যাচ্ছে? কেন?'

মা মুখ তুলল না। যেমন ছিল, তেমন থেকেই বলল, 'আমি কিছু জানি না।'

বলে মা বাবার দিকে তাকাল। বলল, 'সত্যি তুমি হামবুর্গ যাচ্ছ?' মা'র নির্বিকার কন্ঠ। যেন কিছুই না বিষয়টা-এমন স্বাভাবিক মুখ তার!

'হ্যাঁ যাচ্ছি।' বলল বাবা খুব স্বাভাবিক কন্ঠে।

মা শুনল। কিছুই বলল না। আমার মনে হলো তার মুখে বিস্ময় ও বিব্রত হওয়ার চাইতে স্বস্তির একটা উজ্জ্বলতাই ফুটে উঠেছে।

বিস্ময় আমাকে অভিভূত করে তুলল। মায়ের হলো কি? আমার মা এমন করতে পারেন না। আমার মা এমন নন। আমি ছুটে গেলাম মায়ের কাছে। বললাম, 'মা, বাবা কেন একা হামবুর্গ যাবেন? তাঁকে নিষেধ করছ না কেন?'

'তোমার বাবা এককভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তিনি স্বাধীন। আমি কারও স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করব না।' বলল আমার মা।

আমার বিস্ময় আরও বেড়ে গেল। মনে হলো এটা আমার মায়ের কন্ঠ নয়।

কথা বলেই মা গাড়ির দিকে চলল।

আমি ছুটে গেলাম বাবার কাছে। বললাম, 'বাবা তোমার হামবুর্গ যাওয়া হবে না, তুমি আমাদের সাথে বন যাবে।'

বাবা ম্লান হাসলেন। আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'মা তোমরা মন খারাপ করো না। হামবুর্গ তো বেশি দূর নয়। তোমরা মা'র সাথে বন যাও।' বাবার শান্ত, স্থির কন্ঠস্বর।

'আলিনা, তাড়াতাড়ি এস।' ওদিক থেকে মা আমাকে ডাকল।

হঠাৎ আমার বুকে ক্ষোভের আগুন জ্বলে উঠল। মা সুস্পষ্টভাবে বাবাকে এড়াতে চাইছেন। কেন?

আমি ছুটে পেলাম মায়ের কাছে। তার দু'হাত ধরে অনেকটা চিৎকার করে বললাম, 'মা, তুমি এমন করছ কেন? কি হয়েছে তোমার?'

মা একটা হ্যাঁচকা টানে তার দুই হাত ছাড়িয়ে নিল। গাড়িতে ঢুকতে ঢুকতে বলল, 'যাও গাড়িতে গিয়ে ওঠ।'

হাত টেনে নিতে গিয়ে মা'র আঙুল থেকে একটা আংটি খুলে পড়েছিল মাটিতে। সেটা তুলে নেবার মত মানসিক অবস্থা আমার ছিল না। আমি মার দিকে এক ধাপ এগিয়ে ক্রুদ্ধ কন্ঠে বললাম, 'আমরা দু'বোন কি বাবার সংগে যাব?'

'আমি কারও স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করব না।' তীব্র কন্ঠে মা বলল।

মার কথা তীরের মত গিয়ে বিদ্ধ হলো আমার বুকে। এবার কিন্তু ক্ষোভ নয়, জগৎ-জোড়া বিস্ময় নামল মনে! মা কি বাবার মত আমাদেরকেও এড়াতে চাচ্ছেন?

আমি পিছু হটলাম। মা'র গাড়ির দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

আমি পেছনে হটে মা'র পড়ে যাওয়া আংটি মাটি থেকে তুলে নিলাম। এগোলাম আমাদের গাড়ির দিকে। গাড়ির পাশে আমার ছোট বোন ব্রুনা চোখে রাজ্যের বিস্ময় নিয়ে পাথরের মত স্থির দাঁড়িয়েছিল! আমি তাকে নিয়ে গাড়িতে বসলাম।

মা'র গাড়ি স্টার্ট নিয়েছে। আমাদের গাড়িও স্টার্ট নিল। ড্রাইভ করছে ব্রুনা।

বাবার গাড়ি তখনও দাঁড়িয়ে।

আমি পেছনে তাকিয়ে বাবার দিকে হাত নাড়লাম।

বাবাও আমাদের দিকে তাকিয়ে ছিল। সেও হাত নাড়ল।

আমাদের পরে বাবার গাড়িও স্টার্ট নিতে দেখলাম।

বন চলে এলাম। সেদিনেরই রাত।

ঘরটা গুছিয়ে নেবার পর বাড়িটা ঘুরে ফিরে দেখছিলাম। যাচ্ছিলাম মায়ের বেড রুমের দরজার সামনে দিয়ে। মায়ের কন্ঠ পেলাম। কথা বলছেন কারও সাথে।

দরজায় দাঁড়ালাম। খোলা দরজা।

মা'র কন্ঠ ভেসে আসছে'.. পারব না কেন? আমি বিন্দী ব্রিজিটি। বুকে চেপে বসা বুড়ো শয়তানটাকে সরিয়েছি। বাকি থাকল অপগণ্ড দু'টি মেয়ে। ওদের মাইনাস করতে সময় লাগবে না।'

একটু নিরবতা। নিশ্চয় ফোনের অপর প্রান্ত কথা বলছে।

আবার কথা বলে উঠল মায়ের কন্ঠ: 'ইয়ার্কি করছ? বুকে চেপে বসা নয়তো কি? নিজেকে তুলে দিয়েছি আরেকজনের হাতে। নেকড়েরা চিবিয়ে খেয়েছে আমাকে। বিষ পান করেছি দিনের পর দিন। তোমাদের স্বার্থে সব করেছি আমি। কিন্তু সে অনুভূতি তোমার নেই, তোমাদের নেই।' শেষের দিকে অভিমানক্ষুব্ধ মায়ের কন্ঠ।

গোটা শরীর আমার কাঁপছিল। মায়ের কথা আর শোনার প্রবৃত্তি হলো না। যা শুনেছি, তা গোটা শরীরে জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছে। মা নিজের নাম 'বিন্দা ব্রিজিটি' বললেন কেন? বাবাকে কি 'বুড়ো শয়তান' বলা হলো! বাবা কি তার বুকে চেপে বসে ছিলেন। বাবা কি 'আরেক জন' হলেন! মা কার স্বার্থে কি করছেন? 'তোমাদের' বলতে কাদের বুঝিয়েছেন?

আমি শিথিল পায়ে টলতে টলতে নিজের ঘরে চলে এলাম। মনে পড়ল মার কালো চুলে সাদা রং করার কথা। কিছুদিন আগে টেলিফোনে বলা মায়ের সেই কথাও। তিনি সবচেয়ে কষ্টে আছেন, আত্নঘাতি অভিনয় করছেন তিনি।

নিজের ঘরে ঢুকেই বেডের উপর নিজেকে ছুঁড়ে ছিলাম। শুয়েই দেখতে পেলাম আমার ছোট বোন ব্রুনা ব্রুনহিল্ড সোফার এক কোণে গুটি মেরে বসে আছে। চোখে-মুখে তার ক্ষোভের আগুন।

আমার ছোট বোন ব্রুনা ব্রুনহিল্ড বন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষের ছাত্রী। খুব চঞ্চল, খুব মুখরা। সেই ব্রুনা যে ব্রুমসারবার্গের ঘটনা থেকে এ পর্যন্ত চুপ করে আছে, এটা বিস্ময়ের।

আমার মনের অবস্থা সামলে নিয়েছি। বললাম, 'কিরে ব্রুনা, এখানে এসে চুপ করে বসে আছিস কেন?'

সে উঠে গটগট করে আমার বেডে আমার পাশে এসে বসে বলল, 'আমি তোমার অপেক্ষা করছি।'

'কেন? তোর ঘরের সব কিছু ঠিকঠাক করে নিয়েছিস?' বললাম আমি।

'না।' বলল রুনা।

'তাহলে এখানে বসে কি করছিস? তোর জিনিসপত্র ঠিকঠাক রাখা হয়েছে কিনা দেখে নিবি না?' আমি বললাম।

'রাখ এসব। বল এসব কি হচ্ছে?' বলল রুনা। বিক্ষুব্ধ কন্ঠ তার।

'কিসের কথা বলছ তুমি?' আমি বললাম।

'মায়ের কি হয়েছে?' মা এসব কি করছেন?' বলল রুনা তীব্র কন্ঠে।

'আস্তে কথা বল রুনা। নিজেকে সংযত কর।' আমি বললাম।

'না, আস্তে কথা বলব না। মা! আমাদের মা নেই। বদলে গেছেন। তিনি এখন অন্যের হাতে।' বলল রুনা। ক্ষোভ, আবেগ, উত্তেজনায় তার কন্ঠ রুদ্ধ হয়ে এসেছিল।

আমি চমকে উঠেছিলাম তার শেষ কথায়! আমি উঠে বসে তাকে কোলে টেনে নিয়ে বললাম, 'আস্তে আস্তে কথা বল! এটা তুমি কি বললে? মা অন্যের হাতে মানে?'

ঠিক তাই আপা। গতকাল যাদেরকে আমাদের বাড়ি ও ফার্মল্যান্ড দেখাশুনা করতে দেয়া হয়েছে তাদের একজন এসেছিল। তখন তুমি ও বাবা বাসায় ছিলে না। মা'র সাথে লোকটি নিরিবিলি কথা বলেছে। এসেই লোকটি মাকে যেভাবে সম্বোধন করেছে, তা আপত্তিকর। আমার কৌতুহল হওয়ায় আমি আড়ালে লুকিয়ে তাদের কথা শুনেছি...।'

রুনার কথার মাঝখানেই আমি বলে উঠলাম, আপত্তিকর বিষয়টা কি রুনা?'

'লোকটি মাকে ডারলিং বলে সম্বোধন করেছে!' বলল রুনা।

বুকে প্রচণ্ড এক খোঁচা লাগল। এতদিনের সব বিষয় সব সত্য ওলট-পালট হয়ে গেল।

আমি কিছু বলার আগেই রুনা আবার শুরু করল, 'আপা, আমি শুধু শুনিনি, দেখেছিও। শুধু ডারলিং বলা নয়, লোকটি মা'র গায়ে হাতও দিয়েছে। প্রতি ব্যাপারে মাকে সে কমান্ড করেছে। তাদের নির্দেশেই রুমসারবার্গ ও

ফার্মল্যান্ড থেকে মা আমাদের সরিয়ে দিলেন। কিন্তু মাকে সরিয়ে দেয়া হয়নি। লোকটি মাকে বলেছে জঞ্জাল থেকে মুক্ত হলেই তুমি ব্রুমসারবার্গে ফিরে আসবে।'

'জঞ্জাল কি?' আমি বললাম।

'এটা বুঝলে না আপা, মা'র সাথে বাবা, আমি, তুমি যারা আছি, তারাই জঞ্জাল।' বলল ব্রুনা।

আমি বুঝিনি তা নয়, কিন্তু স্বীকার করতে কষ্ট হচ্ছিল। যা স্বীকার করতে আমার কষ্ট হচ্ছিল, সেটা স্পষ্টবাদী ব্রুনা অবলীলাক্রমে বলে ফেলল। আরেকটা কথা এ সময় আমার কাছে খুব বড় হয়ে উঠল, আমরা যদি জঞ্জাল হই, তাহলে সে জঞ্জাল থেকে মা মুক্ত হবেন কি করে?

এ প্রশ্নের জবাবও কয়েক দিনের মধ্যেই মিলল।

আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবার সময় আমার সাথে ব্রুনাও যাচ্ছিল। আমরা 'বন'-এর বিখ্যাত পার্কের মাঝের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম। জনবিরল রাস্তা। এ্যাকসিডেন্টের শিকার হলাম। একটা হেভি জীপ ইচ্ছা করে রং সাইডে এসে আমাদের গাড়িতে ধাক্কা দিয়ে চলে গেল। আমি যদি শেষ মুহূর্তে গাড়িটা ঘুরিয়ে নিতে না পারতাম, তাহলে আমাদের গাড়ির মাথাটা গুড়ো হয়ে যেত, তার সাথে সামনে বসা আমরাও শেষ হয়ে যেতাম। কিন্তু আমরা দু'বোন আহত হবার মধ্যে দিয়ে বিরাট ফাঁড়া আমাদের কেটে গেল।

আমাদের দু'বোনকে কয়েকদিন হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল। পুলিশ সূত্রে জেনেছিলাম যে, গাড়িটা এ্যাকসিডেন্ট ঘটায় তার নাম্বারটা ভূয়া ছিল এবং গাড়িটাকে আর বনে পাওয়া যায়নি। তার মানে গাড়িটা পরিকল্পিতভাবেই এ্যাকসিডেন্ট ঘটায় এবং তার লক্ষ ছিল আমাদের মেরে ফেলা।

মা হাসপাতালে এসেছিলেন। আমাদের কিছু দেখাশুনাও করেছেন। কিন্তু সবই ছিল পোষাকি- তা বুঝতে আমাদের দু'বোনের কারোই কষ্ট হয়নি।

হাসপাতালের বেডে শুয়েই সিদ্ধান্ত নিলাম, বন থেকে শুধু নয়, জার্মানি থেকেও পালাতে হবে। বাবাকেও সাবধান করে দিলাম। বললাম, নিশ্চয় মা কোন কারণে একদমই বদলে গেছেন । তিনি এখন আমাদের কারও জন্যেই নিরাপদ

নন। বাবা বলেছিলেন, ফার্মল্যান্ডের ১০ হাজার একরের বিরাট সম্পদই সকল অনর্থের মূল। এ সম্পদ উত্তরাধিকারসূত্রে তোমার মা'র। আমরা যদি না থাকি, তাহলে তোমার মা'র মাধ্যমে অন্য কেউ এ সম্পত্তির মালিক হতে পারে।'

বাবার এই কথায় সব কিছু আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এরপরও আমার মনে প্রশ্ন থেকে গিয়েছিল, আমার মা'র এই পরিবর্তন কিছুতেই হতে পারে না। তার কি হলো? কি ঘটলো? সমগ্র হৃদয়ের এই আকুল প্রশ্নের সমাধান পাইনি। আমার বোন ব্রুনা ও বাবারও কথা হলো, 'এই মা, আমাদের মা নয়'। তাহলে ইনি কে? আমার মা গেল কোথায়? দু'জনের একমাত্র বয়স ছাড়া একই চেহারা হলো কি করে? এসব জিজ্ঞাসা ও থ্রিলিং কিছু করার ইচ্ছাই আমাকে বাধ্য করেছিল ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেটে যোগ দিতে। কিন্তু আমার সেই জিজ্ঞাসার পরিধি বেড়েছে বই কমেনি। ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেট আমাকে সাহায্য করেনি, বরং বলেছে যা গেছে ভুলে যাও, যা যায়নি তা রক্ষা কর। কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বের করো না।' তারা সাপের কথা বলায় আমার উদ্বেগ জিজ্ঞাসা আরও বেড়ে গেছে। তাহলে তো আমরা সাংঘাতিক এক ষড়যন্ত্রের শিকার। এই ষড়যন্ত্রের ছোবল থেকে আমার বোন, বাবা কি বাঁচবে? আমি তো পারলাম না, আমার সব প্রশ্ন, সব শংকা সামনে রেখে কেউ একজন কি সেই সাপের সন্ধানে এগোতে পারেন! এ ব্যাপারে প্রাথমিক সাহায্য করতে পারে আমার বোন ব্রুনা। তার ঠিকানা এই ডাইরির শেষ পাতায় থাকল।'

ডাইরি পড়া শেষ হলো আহমদ মুসার।

পাতা উল্টিয়ে সে শেষ পাতায় গেল।

শেষ পাতার দুই পৃষ্ঠায় কোন লেখা দেখল না আহমদ মুসা। মনে মনে হাসল আহমদ মুসা। এত সহজে ঠিকানাটা দেখা যাবে তা ভাবা ঠিক হয়নি। তার বোনের ঠিকানা তার বোনের মতই মূল্যবান। বোনকে যেমন সাপের ছোবল থেকে বাঁচাবার জন্যে লুকিয়ে রেখেছে, তেমনি ঠিকানা লুকাবারও তার দরকার পড়েছে। নিশ্চয় স্পাই ডাস্ট দিয়ে ঠিকানাটা পড়া যাবে।

আহমদ মুসা পাশ ফিরে ব্যাগ টেনে নিয়ে ইমারজেন্সি প্যাক থেকে একটা স্প্রে-টিউব বের করে প্রথমে উপরের পৃষ্ঠার উপর স্প্রে করল। কয়েক মুহূর্তের

মধ্যে পৃষ্ঠার মাঝখানে লাল রংয়ের তিনটি লাইন ফুটে উঠল। গৌরীর ছোট বোন ব্রুনা ব্রুনহিল্ড-এর ঠিকানা। মনোযোগ দিয়ে ঠিকানাটা একবার পড়ে নিল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা ডাইরি বন্ধ করতে গিয়ে থেমে গেল।

গৌরীর পুরো নামটা তো জানা হলো না। তার ছোট বোন, মা, বাবার সবার নাম জানা হয়েছে, কিন্তু গৌরীর পুরো নাম জানা হয়নি। নিশ্চয় ডাইরির শুরুতে সে এটা বলেছে।

আহমদ মুসা ডাইরির পাতা উল্টিয়ে আবার তার শুরুতে চলে গেল।

শুরুতেই পেয়ে গেল গৌরীর নাম।

ডাইরি লেখা শুরুই করেছে এভাবে, 'আমার নাম আনালিসা অ্যালিনা।' খাস স্যাক্সন নাম। আমরা খাঁটি স্যাক্সন রাজপরিবারের উত্তরসূরী। আমার মা বলেছেন, স্যাক্সনদের প্রথম রাজা হেনরীর প্রথম মেয়ের নাম নাকি ছিল আনালিসা অ্যালিনা।'

গৌরীর নাম জানা হয়ে গেল। এখন আর অন্য কিছুর দরকার নেই। ডাইরি তো সাথেই থাকবে যা যখন প্রয়োজন দেখে নেবে।

ডাইরি বন্ধ করল আহমদ মুসা।

পা ছড়িয়ে ভালো করে শুয়ে পড়ল সে।

নৌবাহিনীর জাহাজটি চলছে দ্রুত তাহিতির উদেশ্যে।

মৃদু একটা কাঁপুনি জাহাজে।

আরামে শান্তির পরশে চোখ বুজল আহমদ মুসা।

চোখ বুজলেও মনের দরজা বন্ধ হলো না। নানা কথা, নানা চিন্তা ছুটে এল সেই দরজা পথে। এখন কি করণীয় আহমদ মুসার? গৌরীর মায়ের ঘটনা তাকেও স্বম্ভিত করে দিয়েছে। গৌরীর সব কথা থেকে একথা পরিষ্কার গৌরীর এ মা তার আসল মা হতে পারে না। কিন্তু এটাই বা সম্ভব হয় কি করে? মানুষের মত মানুষ হয়, কিন্তু দুই মানুষ এমনভাবে এক হতে পারে না। কিন্তু হলো কি করে? যা বুঝেছে আহমদ মুসা, তাতে দু'জনের মধ্যে বয়স ও আচরণের পার্থক্য ছাড়া আর কোন পার্থক্য নেই। আচরণের পার্থক্য মৌলিক বিষয় নয়। কারণ আচরণ কৃত্রিম

হতে পারে। মৌলিক বিষয় শুধু বয়সটাই যা আড়াল করার জন্যে গৌরীর এ মা কলপ দিয়ে পাকা চুল তৈরি করে থাকে।

ভেবেই চলল আহমদ মুসা।

তার মনের খোলা দরজাটা এক সময় ধুসর হয়ে অন্ধকারের একটা যবনিকা নেমে এল।

ঘুমিয়ে পড়ল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসার সম্মানে একটা বিদায়ী ভোজের আয়োজন করেছিল তাহিতির ফরাসি গভর্ণর তার পরিবার, বন্ধু-বান্ধব ও পরিচিত জনদের নিয়ে। ভোজ শেষ হয়েছে।

অতিথিরা প্রায় সবাই চলে গেছে।

আহমদ মুসা বসেছিল ডিনার হলের পাশের লাউঞ্জে। তার দু'পাশে সোফায় বসেছিল তাহিতির স্বরাষ্ট্র সচিব ও পুলিশপ্রধান দ্যাগল।

অতিথিদের বিদায় দিয়ে তাহিতির গভর্ণর ফ্রাসোয়া বুরবন ফিরে এল। সে সামনে আসতেই উঠে দাঁড়াল স্বরাষ্ট্র সচিব ও পুলিশ প্রধান দ্যাগল। গভর্নরের দিকে একটা বড় ইনভেলাপ তুলে ধরে বলল, 'সব হয়ে গেছে স্যার।'

ইনভেলাপটি হাতে নিয়ে আহমদ মুসার পাশে বসল গভর্নর। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, 'ডিনার ঠিক সময়ে শেষ হয়েছে আহমদ মুসা। তুমি ধীরে সুস্থে গিয়ে প্লেন ধরতে পারবে।'

বলে গভর্নর ফ্রাসোয়া বুরবন একটু থামল। হাতের ইনভেলাপের ভিতরটা একটু দেখে নিয়ে সেটা আহমদ মুসার দিকে তুলে ধরে বলল, 'আহমদ মুসা, ইনভেলাপে তোমার পাসপোর্ট ও প্লেনের টিকিট আছে। তোমার মার্কিন পাসপোর্টে ইউরো ভিসা লাগানো হয়েছে। কুটনৈতিক সমমানের ভিআইপি ভিসা তোমাকে দেয়া হয়েছে। কুটনীতিকদের অনুরূপ সুযোগ-সুবিধা তুমি পাবে। ইনভেলাপের ভিতর আরেকটা ইনভেলাপ তোমার জন্যে ফরাসি প্রেসিডেন্টের

লেটার অব থ্যাংকস রয়েছে। ফরাসিরা তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে এক অমূল্য সাহায্য দেয়ার জন্যে। ফরাসি প্রেসিডেন্ট তোমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে গেস্ট অব অনার হিসাবে ফ্রান্সের আগামী জাতীয় দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার জন্যে। আরেকটা কথা আহমদ মুসা, ফরাসি সরকার আমাদের অস্ট্রিয়া ও জার্মানিস্থ রাষ্ট্রদূতদের তোমার ব্যাপারে কমপ্লিট ব্রীফ করেছে। আর জার্মানির সাচেন প্রদেশের গোয়েন্দাপ্রধান আমার ক্লাসমেট। তোমার বন, ব্রুমসারবার্গ সবই তার এলাকায় পড়বে। সে তোমাকে সব রকম সাহায্য করবে।'

থামল গভর্নর, ফ্রাসোয়া বুরবন।

'ধন্যবাদ স্যার্। আপনার সরকারকে অশেষ ধন্যবাদ। আমাকে এখন উঠতে হয় স্যার।' আহমদ মুসা বলল।

'তুমি সোনার মানুষ আহমদ মুসা। কারণ কোন বিনিময় তুমি চাও না। আমার সরকার আর কি করল তোমার জন্যে। তোমাকে অনেক ধন্যবাদ আহমদ মুসা।'

বলেই গভর্নর উঠে দাঁড়াল।

আহমদ মুসা ও স্বরাষ্ট্র সচিব ও পুলিশপ্রধান দ্যাগলও উঠল।

গভর্নর ফ্রাসোয়া বুরবনই আবার কথা বলল, 'জানি তুমি তেপাও-এর গাড়িতেই যাবে। মি. দ্যাগলও একটা পুলিশ ফোর্স নিয়ে তোমার সাথে থাকবে।'

'ধন্যবাদ স্যার।' আহমদ মুসা বলল।

'ওয়েলকাম। চল আহমদ মুসা।' সবাই বেরিয়ে গভর্নর হাউজের গাড়ি বারান্দায় এল।

তেপাও-এর গাড়ির পাশে মুখ ভার করে দাঁড়িয়ে আছে মারেভা ও মাহিন। তাদের পাশে দাঁড়িয়ে আচে 'আরু'র রাজ উপাশনালয় প্রধান মা-কোহ।

আহমদ মুসা তাকে সালাম দিল। বলল, 'স্যার, আপনি কষ্ট করে এসেছেন? দু:খিত, আমারই যাওয়া উচিত ছিল কিন্তু আরেকটা প্রোগ্রামে হঠাৎ আমাকে জড়িয়ে পড়তে হয়েছে।'

'সে জানি বেটা, তোমাদের মত লোকদের আল্লাহ গণ্ডায় গণ্ডায় সৃষ্টি করেন না। মতুতুংগার ঘটনায় গোটা দুনিয়া স্তম্ভিত। তোমার জন্যে আমরা গর্বিত। কিন্তু একথা বলার জন্যে আমি আসিনি বেটা। বলল মাহকোহ।

'আদেশ করুন স্যার।' আহমদ মুসা বলল।

'আদেশ নয়, বলতে এসেছিলাম, এবার 'আরু'তে গেলে তোমার ভালো লাগত। সেই রাজউপাশনালয় এখন রাজমসজিদ। তুমি আসার পর রাজ-উপাশনালয়ের চারদিকটা পরিষ্কার ও সমান করতে গিয়ে একটা শিলালিপি পাওয়া গেছে। আরবি ও তাহিতি ভাষায় লেখা। ওটা যে মসজিদ তা ওতেই লেখা আছে। সন, তারিখও শিলালিপিতে লেখা হয়েছে। পমেরী বংশের প্রথম অংশ আরি আবদুল্লাহ অ্যারিন্যু এই মসজিদটি নির্মাণ করেন। মসজিদটি ধন্য হবে তোমাকে পেলে।' বলল মাহকোহ।

'আলহামদুলিল্লাহ! খুব খুশি হলাম এই খবর শুনে। প্রার্থনা করি তাহিতির মাটিচাপা ইতিহাস এভাবেই বের হয়ে আসুক। মুহতারাম, এবার আমি এসেছিলাম বিশেষ কাজে, তবে এরপর আসব বেড়াতে। সেবার প্রথমেই আপনার অতিথি হবো ইনশায়াল্লাহ।' আহমদ মুসা বলল।

'ওয়েলকাম বেটা! আল্লাহ তোমাকে সে ধরনের সময় দিন।' বলল মাহকোহ।

'তাহলে স্যার, দোয়া করুন।' বলে আহমদ মুসা একবার হাতঘড়ি দেখে তাকাল মাহিন ও মারেভার দিকে। বলল, 'সবাই গাড়িতে ওঠ, হাতে সময় কিন্তু বেশি নেই।'

বলে আহমদ মুসা হাতের ব্যাগটা সামনের সিটে ঠেলে দিয়ে তাতে উঠে বসল।

সবাই গাড়িতে উঠেছে।

মাহিন, মারেভা ও মাহকোহ পেছনের সিটে বসলো। ড্রাইভিং সিটে তেপাও। তার পাশে আহমদ মুসা।

সামনে স্বরাষ্ট্র সচিব ও পুলিশপ্রধান দ্যাগলের গাড়ি। পেছনেও আরও দুটি গাড়ি পুলিশের।

গাড়ি চলতে শুরু করল তাহিতি এয়ারপোর্টের দিকে।

আহমদ মুসা পেছনে তাকিয়ে বলল, 'ম্যারেভা-মাহিন, তোমরা কথা বলছ না যে!'

কোন কথা এল না তাদের দিকে থেকে।

ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ পেল আহমদ মুসা। পেছন ফিরে দেখল, দু'হাতে মুখ ঢেকে কাঁদছে মারেভা। কান্না চাপতে গিয়ে কাঁপছে সে।

ম্লান হাসি ফুটে উঠল আহমদ মুসার মুখে।

একটা আবেগ এসে তাকেও স্পর্শ করল। এই যে দেখা হলো, পরিচয় হলো, মায়ার বাঁধন এসে বাঁধল। তারপর এই যে যাচ্ছে, আর কি দেখা হবে! সবাই আমরা বলি, আবার আসব। ক'জন ফিরে আসে! ফেরা কি যায়!

একটা শুকনো হাসি ফুটে উঠল আহমদ মুসার ঠোঁটে। বলল নরম কন্ঠে, 'মারেভা, বোন, তোমাদের খুব বাস্তববাদী বলে আমি জানি। তোমাদের তাই আশ্বস্ত করার কোন দরকার নেই। মিলন ও বিচ্ছেদ দু'টোই জীবনের বাস্তবতা। এর চেয়ে বড় বাস্তবতা হলো, দুনিয়ার জীবনটা এক গতিমান চলার পথ। আমরা সবাই এই গতির অধীন, আর গতির নিয়ন্ত্রক স্বয়ং আল্লাহ। গতিমান চলার পথ কাকে কোথায় নিয়ে যাবে কেউ বলতে পারে না। চলার পথ আমাকে নিয়ে এসেছিল স্বপ্নের তাহিতিতে, আজ আবার চলে যাচ্ছি সেই তাহিতি থেকে। এই অমোঘ বাস্তবতা আমাদের সবাইকে মানতে হবে বোন।'

থামল আহমদ মুসা।

থামল না মারেভা। তার কান্নাটা আরও বাড়ল। আহমদ মুসা দেখল চোখ মুছছে ড্রাইভার তেপাও।

নিরবতা ভাঙল মাহকোহ। বলল, 'অংকের নিয়মে তোমার কথা ঠিক বেটা। কিন্তু হৃদয় এই অংক মানে না। মানুষের ইতিহাস যত পুরনো, মানুষের বেদনার অশ্রু, বিয়োগের অশ্রু, শোকের অশ্রুর ইতিহাস বোধ হয় ততটাই পুরনো। অশ্রু হলো ভালোবাসাসিক্ত হৃদয়ের স্বর্গীয় প্রস্রবণ। মারেভা কাঁদুক আহমদ মুসা। ওর অশ্রু শুধু ওর নয় সমগ্র তাহিতির অশ্রু।'

থেমে গেল মাহকোহর শান্ত কন্ঠ।

আহমদ মুসা কিছু বলল না, বলতে পারল না। বিদায়ের বেদনাসিক্ত যে আবেগকে সে দূরে সরিয়ে রাখছিল, সেটা এবার এসে তাকে ঘিরে ধরল। দুই চোখের কোণ তারও ভারি হয়ে উঠল। চোখ বুজল আহমদ মুসা।

এক সময় চোখ খুলে পকেটে হাত দিয়ে একটা ইনভেলাপ বের করল। পেছনে তাকিয়ে ইনভেলাপটা মাহিনের দিকে তুলে ধরে বলল, এতে কয়েক হাজার ডলার আছে মাহিন। এটা দিয়ে তেপাওকে একটা ভালো গাড়ি কিনে দিও। ও কিছুতেই টাকা নিত না। তাই এ দায়িত্ব তোমাকে দিয়ে গেলাম।'

আগেই তেপাও-এর চোখে পানি গড়াচ্ছিল। এবার সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

আহমদ মুসা সোজা হয়ে বসল। কিছু বলল না। কান্নায় বাধাও দিল না।

চোখ দু'টি তার প্রসারিত হলো সামনে।

চোখে শূন্য দৃষ্টি।

তাতে যেন অচেনা ঠিকানার অজানা কাহিনীর অস্পষ্ট সব দৃশ্য!

চলছে গাড়ি।

চলছে এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যে।

‘বাবা, আমার খুব চিন্তা হচ্ছে। দু’তিন দিন ধরে অ্যালিনা আপার ফোন বন্ধ।’ বলল ব্রুনা ব্রুনহিল্ড। তার হাতে মোবাইল। কথা বলছে সে মোবাইলে তার বাবা আলদুনি সেনফ্রিডের সাথে।

‘হ্যাঁ, মা ব্রুনা। দিন পাঁচেক আমার সাথেও তার কোন কথা হয়নি। জরুরি প্রয়োজন ছাড়া আমাকে টেলিফোন করতে না করেছে সে। সেই প্রতি সানডে সকালে সে টেলিফোন করে। ৫ দিন আগে গত রোববারে তার সাথে কথা হয়েছে। তোমার সাথে শেষ কবে কথা হয়েছে?’ ব্রুনা ব্রুনহিল্ডের বাবা আলদুনি সেনফ্রিড বলল। তার চোখে দুর্ভাবনার চিহ্ন।

‘তিন দিন আগে বেলা সাড়ে ৩টায় টেলিফোন করেছিল। তার মানে তার সময় রাত তিনটায় তার টেলিফোন পেয়েছিলাম। এমন ‘অড’ সময়ে আপা কোনদিন টেলিফোন করেননি। আর বাবা, সে কথাগুলোও বলেছিল সব অস্বাভাবিক...।’

কথা আটকে গেল ব্রুনার গলায়। কান্নায় ভেঙে পড়ল ব্রুনা ব্রুনহিল্ড।

ওপার থেকে ব্রুনার বাবার উদ্বিগ্ন কন্ঠস্বর শোনা গেল। বলল, ‘ব্রুনা মা, প্লিজ কেঁদো না। তুমি তো খুব সাহসী মা। আমরা তো এমনিতেই সংকটে। সাহস ও ধৈর্য হারালে চলবে না আমাদের। অ্যালিনা অস্বাভাবিক কি বলেছিল মা?’

‘আমাকে অনেক উপদেশ দিয়েছিল বাবা। লেখাপড়ার ব্যাপারে, চলাফেরার ব্যাপারে, তোমাকে দেখাশুনার ব্যাপারে এবং সবশেষে বলেছিল, আমাদের ‘মা-রহস্য’ খুঁজে বের করতেই হবে। এটা সম্পত্তির জন্যে নয়, মা’র স্বার্থে। আপার এই ধরনের উপদেশ আমার তখনি ভালো লাগেনি। আমি বলেছিলাম, আপা, তুমি কি কোনো মহাযাত্রা করছ যে, এই ধরনের উপদেশ দিচ্ছ? তুমিই তো এসব করবে! আমি তোমার সাথে থাকব। আপা বলেছিল, মানুষের মহাযাত্রা প্রস্তুতি নিয়ে হয় না। এটা হঠাৎই হয়। যাক এসব কথা,

তোমাকে বলার জন্যে মনে এই কথাগুলো এসে ভিড় করেছিল তাই বললাম। মন আল্লাহর আবাস, বিবেক আল্লাহর কন্ঠ। এজন্যে মন ও বিবেকের কথা শুনতে হয়। আমি আপার মুখে আল্লাহ শব্দ শুনে বিস্মিত কন্ঠে বলেছিলাম, আমরা তো ‘গড’ বলি, হঠাৎ তুমি ‘আল্লাহ’ বলছ কেন আপা? অ্যালিনা আপা বলেছিল, স্রষ্টা, পালনকর্তা হিসাবে ‘গড’-এর যত নাম দুনিয়াতে আছে তার মধ্যে ‘আল্লাহ’ নামটাই সবচেয়ে মৌলিক ও যথার্থ। এজন্যে ‘আল্লাহ’কেই আমি গ্রহণ করেছি ব্রুনা। আমি আরও বিস্মিত হয়ে কথা বলতে যাচ্ছিলাম। আপা বাধা দিয়ে বলল, সময় নেই ব্রুনা শোন, ‘মা-রহস্যে’র সন্ধানে এতদিনেও আমি কিছুই করতে পারিনি। কিভাবে এই সংকটের সমাধান হবে আমি জানি না। তবে আমার মনে একটা আশা জেগেছে, একজন মহান মানুষ আমাদের এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারেন। সংগে সংগে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কে তিনি? আপা বলল, আমি নিশ্চিত নই ব্রুনা তিনি সাহায্য করবেন কিনা। তবে সাহায্য করতে পারেন তিনি এবং যে কোন সংকট সমাধানের সামর্থ্য তার আছে, এটা শুধু আমার বিশ্বাস নয়, এটাই সত্য। কে তিনি আপা, আবার আমি জিজ্ঞাসা করলাম। আপা বললেন, তার নাম টেলিফোনে বলা যাবে না। তবে মনে রেখ স্বচ্ছ, সুন্দর, নিষ্পাপ চেহারার মানুষ তিনি। তাঁর নামের দুই অংশ। প্রথম অংশের প্রথম বর্ণ ‘এ’... এখানে এসে হঠাৎ কথা বন্ধ হয়ে যায় আপার। লাইনটা কেটে যাওয়ার আগে তার মোবাইলে ভেসে আসা অন্য কারো ক্রুদ্ধ কন্ঠ শুনেছি।’

থামল ব্রুনা ব্রুনহিল্ড। তার শুকনো, উদ্বিগ্ন কন্ঠ।

‘মা ব্রুনা, তুমি যা বললে তা সত্যিই উদ্বেগের মা। কিন্তু আমরা এখন কি করব?’ বলল ব্রুনার বাবা। তার কম্পিত কন্ঠস্বর।

‘অনেক ভেবেছি, কিছুই বুঝতে পারছি না বাবা। তার কোন নির্দিষ্ট ঠিকানা আমাদের কাছে নেই। সর্বশেষ তিনি তাহিতিতে ছিলেন। তার টেলিফোন নিরব হয়ে যাবার ঘটনা আর কোন সময়ই ঘটেনি। এবার সব কিছুই অস্বাভাবিক ঘটেছে।’ ব্রুনা ব্রুনহিল্ড বলল।

‘আমরা কি তাহিতি যাবার চিন্তা করতে পারি? আমরা তো এভাবে বসে থাকতে পারি না।’ বলল ব্রুনার বাবা।

কলিংবেল বেজে উঠল।

ভ্রকুঞ্চিত হলো ব্রুনা ব্রুনহিল্ডের। তার বাসায় তো আসার কেউ নেই! হোম সার্ভিসের কেউ কি হবে? ওরা মাঝে মাঝে আসে।

'বাবা, কেউ এসেছে, পরে কথা বলব তাহলে।' বলল ব্রুনা।

'ঠিক আছে মা। তুমি সাবধানে থেকো। ওরা কিন্তু জার্মানি চষে ফিরছে।

'জার্মানির বা্ইরেও তারা নজর দেবে।' ব্রুনার বাবা বলল।

'ধন্যবাদ বাবা।' বলে মোবাইলের কল ক্লোজ করল ব্রুনা।

দরজা খোলার আগে ডোর ভিউ দিয়ে দেখল, মিউনিসিপ্যাল করপোরেশনের ইউনিফরম পরা লোক।

দরজা খুলে দিন ব্রুনা। ভেবে পেল না, মিউনিসিপ্যালিটির লোক কেন এ সময়? ওদের কোন প্রোগাম চলছে বলে তো জানা নেই।

দরজা খুলে যেতেই 'গুড মর্নিং ম্যাডাম' বলে ছোট্ট একটা বাউ করল লোকটি।

'গুড মর্নিং স্যার। আপনি নিশ্চয় মিউনিসিপ্যালিটি থেকে এসেছেন? কি করতে পারি আপনার জন্যে?' বলল ব্রুনা।

'এক্সকিউজ মি ম্যাডাম। নোটিশ ছাড়া এসেছি। আমি এসেছি আমাদের সালজবার্গ মিউনিসিপ্যাল করপোরেশনের কমিউনিটি সার্ভিস থেকে।' বলল আগন্তুক।

'কমিউনিটি সার্ভিসের সেনসাস গ্রুপের লোকরা তো ক'দিন আগে এসেছিল।' ব্রুনা বলল।

'কিন্তু তারা কিছু ভুল করে গেছে। যেসব দরকারি তথ্য নেয়ার কথা ছিল নেয়নি, বিশেষ করে জার্মান ন্যাশনালদের কিছু তথ্য বাদ পড়েছে।' বলল আগন্তুকটি।

'যেমন? প্রোফরমা অনুসারে সব তথ্য তারা নিয়েছে।' ব্রুনা বলল।

'হোম টাউনের নাম, বার্থ সার্টিফিকেটের নাম্বার, তারিখ ইত্যাদি।' বলল আগন্তুকটি।

চমকে উঠল ব্রুনা ব্রুনহিল্ড! হোম টাউনের নাম ও বার্থ সার্টিফিকেটের নাম্বার, তারিখ প্রকাশ হয়ে পড়লে তার নাম-পরিচয় জানাজানি হয়ে যাবে। তার নিরাপত্তাও বিঘ্নিত হয়ে পড়বে। নিরাপত্তার স্বার্থেই সে জার্মানি ছেড়েছে। অস্ট্রিয়ার ছোট্ট শহর সালজবার্গে এসে বাস করছে। অস্ট্রিয়ার সীমান্তে আল্পসের উত্তর দেয়ালে জার্মান সীমান্তের খুব কাছে এই সালজবার্গ শহর। সুন্দর এই পার্বত্য শহরটি পুরানো ও অভিজাত। অনেক ঐতিহ্যের স্মারক এখানকার তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে বসতি গড়ে ব্রুনা নিজের নিরাপত্তা ও শিক্ষা অব্যাহত রাখা উভয়ই রক্ষা করতে চাইছে। জার্মানির কোথাও সে নিরাপদ থাকতে পারেনি। দু'দিনেই শত্রুদের চোখে পড়ার উপক্রম হয়েছে, এতই শক্তিশালী মায়ের খুনি গ্যাংটি। ছদ্মনামে এই বাড়িটা ভাড়া নিয়েছে ব্রুনা। বিশ্ববিদ্যালয় ও এই বাসা ছাড়া আর কোথাও যায় না ব্রুনা। একা এ বাসায় অনেকটা বন্দীর মত জীবন যাপন করছে সে। এখন যে পরিচয় গোপন রেখেছে, সে পরিচয় মিউনিসিপ্যালেটিতে দেবে কি করে! আরেকটা চিন্তা তার কাছে বড় হয়ে উঠেছে। সেটা হলো, মাত্র কয়েকদিন আগে মিউনিসিপ্যালেটির কম্যুনিটি সার্ভিসের লোকরা ফরমের সব অপসন পুরোপুরি ফিল আপ করে নিয়ে গেছে। ফরমে যা নেই, এমন তথ্যের জন্যে এভাবে লোক পাঠানো কি স্বাভাবিক? কিছুতেই স্বাভাবিক মনে হচ্ছে না।

হঠাৎ ব্রুনার মাথায় একটা বুদ্ধি এল। বলল, 'স্যরি স্যার, কম্যুনিটি সার্ভির্সের এসব তথ্য দরকার তা আমার জানা ছিল না। বার্থ সার্টিফিকেট তো আমার কাছে নেই। নাম্বার তারিখও আমার জানা নেই।'

আগন্তুকের মুখটা কেমন যেন ম্লান হয়ে গেল! ভাবল একটু। বলল, 'ঠিক আছে তাহলে হোম টাউনের নামটা দিন।'

বলে সে তার ফাইলটা খুলল এবং কলমটা হাতে নিল।

দ্রুত ভাবছিল ব্রুনা। হোম টাউনের নাম দিলেই তার পরিচয় পরিষ্কার হয়ে যেতে পারে। না, কিছুতেই সে তার হোম টাউনের নাম দেবে না। অন্য কোন জায়গার নাম বলবে। তাহলে ধরা পড়ার আপাতত ভয় নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের

কোন ডকুমেন্ট তার হোম টাউনের নাম নেই। বার্লিনের রয়্যাল স্যাক্সন বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট নিয়ে সে এখানে এসেছে

ইউরোপের প্রাচীন ইতিহাস বিষয়ে পড়ার জন্যে। বার্থ সার্টিফিকেট বা তার নাম্বার না হলে হোম টাউনের অথেনটিসিটি যাচাই করার সহজ কোন উপায় নেই, বিশেষ করে হোম টাউন যদি বড় শহর হয়।

এসব চিন্তা করেই ব্রুনা বলল, 'আমার হোম টাউন বার্লিন।'

'বার্লিন? একদম রাজধানী শহর!' বলল আগন্তুক।

'হ্যাঁ, আমাদের কয়েক পুরুষের শহর।' ব্রুনা বলল।

'ধন্যবাদ!' বলে আগন্তুক উঠে দাঁড়াল।

ব্রুনা তাকে বারান্দা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে ফিরে এল ঘরে। হাউজ ডকুমেন্ট ফাইল বের করে মিউনিসিপ্যালিটি কম্যুনিটি সার্ভিসের টেলিফোন নম্বর জেনে নিয়ে সেখানে টেলিফোন করল।

ওপার থেকে সাড়া পেতেই ব্রুনা 'গুড় মর্নিং' জানিয়ে 'এক্সকিউজ মি' বলে জিজ্ঞাসা করল, 'কম্যুনিটি সার্ভিস থেকে আপনারা কয়েক দিন আগে কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছেন, আবারও কি আপনারা তেমন কোন লোক পাঠিয়েছেন?'

'হ্যাঁ, আমরা একটা এনজিও-কে সহযোগিতা করছি। তারা একটা সমীক্ষার জন্যে কিছু তথ্য সংগ্রহ করছে জার্মান সেটলারস ও জার্মান প্রবাসীদের উপর। কোন সমস্যা? কেন জিজ্ঞাসা করছেন?' বলল ওপার থেকে কম্যুনিটি সার্ভিসের লোকটি।

'কিছু নয়, কৌতুহল থেকে জিজ্ঞাসা করছি। এনজিওটার নাম কি বলতে পারেন প্লিজ?' বলল ব্রুনা।

'এক মিনিট প্লিজ।' ওপার থেকে কম্যুনিটি সার্ভিসের লোক বলল।

মিনিট খানেকের মধ্যেই তার কন্ঠ শোনা গেল। বলল, হ্যাঁ, এনজিওটা খুবই নামকরা, 'উই আর ফর অল'।

'ধন্যবাদ স্যার। বাই!' বলে ব্রুনা তার কল অফ করে দিল।

ধপ করে বসে পড়ল সোফার উপর ব্রুনা। তার চোখে-মুখে ভয়ের চিহ্ন।

তার নিশ্চিতই মনে হচ্ছে, এনজিও'র ছদ্মাবরণে তার মায়ের গ্যাংগটাই তার তালাশ করছে! তার মানে তারা জার্মানির বাইরেও নজর দিচ্ছে? কেন তারা এভাবে আমাদের পেছনে লেগেছে? আমরা তো চলে এসেছি সেখান থেকে!

এরপরও তারা আমাদের অস্তিত্ব কেন বরদাশত করতে পারছে না? কেন? কি চায় তারা?

এসব ভাবতে ভাবতে এক সময় চোখ ধরে এসেছিল ব্রুনার।

আবার কলিং বেলের শব্দ।

তন্দ্রা ভেঙে গেল ব্রুনার।

'আবার কে এল!' মনে মনে বলে তাকাল দরজার দিকে। উঠে দাঁড়াল।

দরজার দিকে দু'ধাপ এগিয়েই আবার থমকে দাঁড়াল। ভয় এসে ঘিরে ধরল তাকে। যারা তাকে খুঁজছে তাদের কেউ এসে গেল কি?

ধীরে ধীরে এগোলো ব্রুনা দরজার দিকে।

এক বুক শংকা নিয়ে ডোর ভিউ দিয়ে বাইরে তাকাল।

বাইরে দাঁড়ানো আগন্তুকের দিকে নজর পড়তেই চমকে উঠল ব্রুনা ব্রনহিল্ড। সমগ্র মনটাই তার এক সাথে বলে উঠল অ্যালিনা আপার মহান মানুষটিকে সে দেখছে। সেই সুন্দর, স্বচ্ছ, নিষ্পাপ চেহারা। দেখেই ব্রুনার মনে হচ্ছে বহুদিন ধরে একে সে চেনে।

আর ভাবতে পারল না ব্রুনা।

হাত তার আপনাতেই এগিয়ে এসে দরজার সেফটি চেইন খুলে লক ঘুরিয়ে দিল দরজার।

দরজা খুলে দিল ব্রুনা।

ব্রুনা ও আগন্তুক মুখোমুখি দাঁড়িয়ে।

নির্বাক ব্রুনার দৃষ্টি আটকে গেছে আগন্তুকের মুখে।

আগন্তুকের ঠোঁটে এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল। তার চোখ দু'টিও যেন হাসছে। বলল আগন্তুক ব্রুনাকে লক্ষ করে, 'গুড মর্নিং, আমি নিশ্চিত তুমি ব্রুনা ব্রুনহিল্ড, আনালিসা অ্যালিনার বোন।'

প্রায় সম্মোহিত ব্রুনা ব্রুনহিল্ডের জন্যে বিস্ময়ের পর বিস্ময়! আগন্তুক তার নাম জানে? আর অবলীলাক্রমে তার নামটা বলেও ফেলল এতটা নিশ্চিতভাবে! সেই সাথে একটা আনন্দও! অবশ্যই উনি আপার সেই মহান মানুষ। এক পশলা বৃষ্টির মত নিরাপত্তার একটা প্রশান্তিও নামল তার মনে।

অভিভূত ব্রুনার মুখ থেকে যেন আপনাতেই কথা বেরিয়ে এল, 'গুড মর্নিং স্যার, আমি ব্রুনা ব্রুনহিল্ড, আনালিসা অ্যালিনার বোন।'

বলে ব্রুনা ব্রুনহিল্ড হ্যান্ডশেকের জন্যে হাত বাড়াল আগন্তুকের দিকে।

তবে হাত এগিয়ে না দিয়ে আগন্তুক বলল, 'এক্সকিউজ মি ব্রুনা, আমাদের সংস্কৃতি এ ধরনের হ্যান্ডশেকের অনুমতি দেয় না।'

ব্রুনা হাত টেনে নিল। বিব্রত ভাব তার চোখে-মুখে। তার দৃষ্টি আহমদ মুসার মুখের দিকে। এমনটা ব্রুনার জীবনে এই প্রথমবার ঘটল। অতিথি অভ্যাগতদের স্বাগত জানানোর সবচেয়ে অন্তরংগ প্রকাশই তো হলো হ্যান্ডশেক। হ্যান্ডশেক অস্বীকার করা অসৌজন্যমূলক, অপমানকরও। অ্যালিনা আপার 'মহান মানুষের' কাছ থেকে তো এমন প্রত্যাশা করা যায় না!

ব্রুনা নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, ' ওকে স্যার, ভিতরে আসুন প্লিজ।'

দরজা পুরোটা খুলে এক পাশে দাঁড়াল ব্রুনা।

ভিতরে প্রবেশ করল আগন্তুক।

ব্রুনা দরজা বন্ধ করে আগন্তুককে নিয়ে বসিয়ে তার পাশের সোফায় বসল সে। মুহূর্ত কয়েক নিরবতা।

'আমি অনাহুত আগন্তুক। প্রয়োজনের কথাই আমার প্রথম বলা দরকার। বলল আগন্তুক।

কথা শেষ করেই আগন্তুক আবার বলার জন্যে মুখ খুলেছিল।

'এক্সকিউজ মি স্যার, তার আগে আমার একটা প্রশ্ন আছে।' ব্রুনা বলল।

'প্রশ্ন? বল।' আগন্তুক মুখ তুলে ব্রুনার দিকে চেয়ে বলল।

'আপনার মূল নামের কয়টা অংশ?' জিজ্ঞাসা ব্রুনার।

আগন্তুক আবার মুখ তুলে তাকাল ব্রুনার দিকে। ভ্রুকুঞ্চিত হয়েছে তার। যেন মুহূর্তকাল ভাবল সে। বলল, 'অংশ দু'টি।'

‘প্রথম অংশের প্রথম ইংরেজি অক্ষরটা কি?’ আবার জিজ্ঞাসা ব্রুনার।

ঠোঁটে ছোট্ট এক টুকরা হাসি ফুটে উঠল আগন্তুকের। বলল, ‘ইংরেজি ‘এ’ হলো সেই আদ্যাক্ষর।’

খুশিতে চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল ব্রুনার। বলল, ‘এবার বলুন স্যার।’

‘কিন্তু আগে বল, আমি পাস করতে পেরেছি কিনা?’ আগন্তুক বলল।

মুখে হাসি ফুটে উঠল ব্রুনার। বলল, ‘স্যার, প্রথম দর্শনেই আপনি পাস করেছেন।’

‘কিভাবে?’ জিজ্ঞাসা আগন্তুকের।

‘আপা আপনার চেহারার যে বিশেষ গুণগুলো দিয়েছিলেন তার সাথে আপনি মিলে গেছেন।’ বলল ব্রুনা।

‘আমি তাহিতি থেকে আসছি। গৌরী মানে আপনার বোন আনালিসা অ্যালিনা শেষ পর্যন্ত ওখানেই ছিলেন। আর আমার নাম নিশ্চয় আপনার বোনের কাছে শুনেছেন।’ আগন্তুক বলল।

‘নাম বলেননি। নাম টেলিফোনে বলবেন না বলেই দুই অংশ নামের প্রথম অংশের আদ্যক্ষর বলার পর তাঁর টেলিফোন কেটে যায়। তারপর থেকেই আপার সাথে আমাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন।’ বলল ব্রুনা। তার শেষ কথাগুলো কান্নায় ভারি হয়ে উঠেছিল।

নিজেকে একটু সামলে নিয়ে ব্রুনা সংগে সংগেই আবার বলে উঠল, ‘আপনি বললেন শেষ পর্যন্ত আপা ওখানে ছিলেন, ‘শেষ পর্যন্ত অর্থ...।’

কথা শেষ করতে পারল না ব্রুনা। দু’হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল সে।

আগন্তুক তাকাল ব্রুনার দিকে। তারপর মাথা নিচু করে আস্তে নরম কন্ঠে বলল, ‘হ্যাঁ, ব্রুনা, আনালিসা অ্যালিনা নেই।’

ব্রুনা অস্ফুস্ট চিৎকার করে সোফার উপর আছড়ে পড়ল। এক বাঁধ ভাঙা কান্নায় ভেঙে পড়ল সে।

আগন্তুক মাথা তুলল না। তাকাতে পারল না ব্রুনার দিকে। মনে মনে বলল, ‘কাঁদুক ব্রুনা, তার কাঁদা উচিত।

অল্পক্ষণ পর মুখ তুলল রুনা। অশ্রুধোয়া তার মুখ। বলল, 'কি ঘটেছিল, কি হয়েছিল জানতে পারি কি মি.।' অশ্রুরুদ্ধ কন্ঠ তার।

'আমার নাম আহমদ মুসা। আনালিসা অ্যালিনার মৃত্যুর ঘটনা...।'

আহমদ মুসার কথার মাঝখানেই রুনা বলে উঠল, 'আহমদ মুসা আপনার নাম? তাহিতির জিম্মি উদ্ধারের ঘটনায় আপনার কথা পত্রিকায় পড়েছি। বলা হয়েছে প্রায় পৌনে একশ বিজ্ঞানী-বুদ্ধিজীবি জিম্মী উদ্ধার ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ঘটনা। বিস্ময়করভাবে আপনি সবাইকে মুক্ত করেছেন! বিশ্ব নেতৃবৃন্দের সবাই আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে। আরও অনেক কথা লিখেছে অনেক পত্রিকা। আপনি কিংবদন্তীর নায়ক। কিন্তু বুঝতে পারছি না, আমার আপার সাথে আপনার পরিচয় হলো কি করে?'

'আমি সে কথাই বলছি।' বলে আহমদ মুসা গৌরী ওরফে আনালিসা অ্যালিনার সাথে তার প্রথম পরিচয় থেকে শুরু করে সব কিছু সংক্ষেপে তুলে ধরে বলল, 'আমাকে বাঁচাতে গিয়েই তাদের নেতার গুলিতে জীবন দিয়েছে রুনা।'

'আপা আমাকে টেলিফোনে জানিয়েছিল, আমাদের 'মা সমস্যা'র সমাধানে আপনি আমাদের সাহায্য করতে পারবেন। আমাদের সমস্যার কথা আপনি জানেন বলে তো বললেন না?'

'অ্যালিনার মৃত্যুর আগে জানতাম না। গুলি লাগার পর সে মিনিট দেড়েক বেঁচেছিল। আমার হাতে সে একটা ডাইরি তুলে দিয়ে বলেছিল, ডাইরির শেষ কয়েক পাতায় আমার জন্যে কিছু লিখেছে। আমি যেন সেটা পড়ি। আর বলেছিল, আমার উপর সে কোন দায়িত্ব চাপাচ্ছে না, সব কিছু আমার ইচ্ছায় হবে। পরে ডাইরি আমি পড়েছি এবং সমস্যা সম্পর্কে জেনেছি। নিজের ইচ্ছাতেই আমি এসেছি রুনা।' আহমদ মুসা বলল।

'আমার ঠিকানাও কি আপা দিয়েছে?' বলল রুনা।

'হ্যাঁ। ডাইরিতেই সে লিখে রেখেছিল।' আহমদ মুসা বলল।

'ওয়েলকাম স্যার। আমরা সত্যিই অসহায় হয়ে পড়েছি। আপার অভাব আমাদের সব আশা-ভরসা চুরমার করে দিয়েছে। আব্বা আমাদের অভিভাবক হলেও আপাই আমাদের পরিচালনা করত। মা'র ঘটনায় বাবা একদমই ভেঙে

পড়েছেন, মনের দিক দিয়েও শরীরের দিক দিয়েও।' বলল ব্রুনা। ভারি কন্ঠ তার।

'স্বাভাবিক।' বলল আহমদ মুসা।

মুহুর্তকালের বিরতি নিয়ে আহমদ মুসা আবার বলে উঠল, 'আচ্ছা বল তো ব্রুনা, তোমার কি মত, তোমার মা কি বদলে গেছেন, না উনি তোমার মা-ই নন?'

'মা হবেন না কেন? বদলে গেছেন তিনি। অবশ্য বাবা বলেন, কোন প্রমাণ নেই এবং বিশ্বাস করাও যায় না, কিন্তু তাকে তোমার মা বলে বিশ্বাস করতে মন চায় না। আব্বার কথা আমি মানি না। ইনি আমার মা না হলে আমার মা কোথায়?' বলল ব্রুনা।

'আমি গৌরীর মানে অ্যালিনার ডাইরি গোটাটাই পড়েছি। অ্যালিনা কিছু তথ্য দিয়েছে তা কিন্তু নিশ্চিত করে উনি তোমাদের মা নন।' আহমদ মুসা বলল।

ব্রুনা বিস্ময় নিয়ে তাকাল আহমদ মুসার দিকে। বলল, কি তথ্য বলা যাবে স্যার?'

'অবশ্যই ব্রুনা। একদিন গোসলের পর তোমার মা তার ড্রেসিং রুমে বসে তার কালো চুল রং দিয়ে সাদা করছিলেন, এটা অ্যালিনা দেখেন। তোমার এ..।'

'মা কালো চুল পাকা করছিলেন? তাহলে মায়ের পাকা চুলের গুচ্ছগুলো আসলে পাকা নয়। ও গড...।'

থামল ব্রুনা। তার কন্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেছে। কাঁপছে গোলাবের পাপড়ির মত তার নিরাভরণ ঠোঁট।

কয়েক মুহুর্ত, ব্রুনা নিজেকে সামলে নিয়ে বলে উঠল, 'ডাইরিতে আর কি আছে স্যার?'

'আরও আছে। ওটা আমি এনেছি। তুমিই রাখবে। পড়ে নিও তুমি।' আহমদ মুসা বলল।

'না, স্যার। ও ডাইরির অধিকার একমাত্র আপনার। আপনাকেই আপা দিয়ে গেছেন।' বলল ব্রুনা।

'কিন্তু ওটা তোমাদের পারিবারিক সম্পত্তি।'

আহমদ মুসা বলল।

'কিন্তু আপনি আপার কাছে পরিবারের চেয়েও বড়।' বলল রুনা।

'কেন, কেমন করে?' বলল আহমদ মুসা।

'জানি না। তবে আপার সাথে কথা বলে আমি এটাই বুঝেছি যে, তার আস্থা, সম্মান, ভালোবাসা সব যেন আপনার জন্যেই ছিল!' বলল রুনা।

অজান্তেই মনটা আহমদ মুসার চমকে উঠল। মুমূর্ষু গৌরীর কথাগুলো তার মনে পড়ল: স্রষ্টার কাছে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে, জীবনের অন্তিম লগ্নে এসে কেন আপনার দেখা পেলাম? কেন আপনার দেখা আগে পাইনি?... আপনার উপর আমার আস্থা সীমাহীন।' আরও মনে পড়ল তার শেষ কথাটা: 'আপনার উপর সে অধিকারও নেই।' অধিকার নেই, বলার মাধ্যমে সে তো এটাই বলতে চেয়েছে 'সে অধিকার তার আছে।'

আনমনা হয়ে পড়েছিল আহমদ মুসা। এসব চিন্তার মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিল সে।

আহমদ মুসার এই ভাবান্তর চোখ এড়াল না রুনার। তার মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তাহলে তার বড় বোন তার মনটা অবশেষে একজনকে দিয়েছিল! বলল রুনা, 'স্যার, আমার মা খুবই কনজারভেটিভ। তার অনুকরণেই আমরা গড়ে উঠেছি। জানেন, বড় আপার কোন ছেলে বন্ধু ছিল না। আমার খুশি লাগছে যে, আপা শেষে একজনকে বন্ধু বানিয়েছিলেন।

শেষ কথা বলতে গিয়ে কেঁদে ফেলল রুনা।

আহমদ মুসা নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'তোমাকে খুব শক্ত হতে হবে রুনা। আলিনা যে কাজ শেষ করতে পারেনি, তা তোমাকে শেষ করতে হবে।'

রুনা চোখ মুছল। বলল, 'সে শক্তি আমার নেই স্যার। আমি আপনার পাশে থাকতে চেষ্টা করব।'

কলিং বেল বেজে উঠল।

চমকে উঠল রুনা!

রুনার চমকে ওঠা আহমদ নজর এড়াল না।

বলল, 'দরজায় কে তুমি কি জান ব্রুনা?'

'না স্যার।' বলল ব্রুনা।

'তবে চমকে উঠলে যে?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

'কিছুক্ষণ আগে মিউনিসিপ্যাল করপোরেশনের কম্যুনিটি সার্ভিসের লোক এসেছিল কিছু ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ করতে। কোন এনজিও'র অনুরোধে তারা নাকি এটা করছে। কিন্তু কেন জানি আমার সন্দেহ হয়েছে এর মধ্যে অন্য কোন ব্যাপার আছে। আমার মধ্যে সত্যিই একটা ভয়ের সৃষ্টি হয়েছে।' বলল ব্রুনা।

আহমদ মুসা মুহূর্তের জন্যে চোখ বুজেছিল।

চোখ খুলে বলল, 'আমি বুঝেছি ব্রুনা। দেখ কে, গেট খুলে দাও।'

মুখে উদ্বেগ নিয়ে দাঁড়িয়ে ডোর ভিউ দিয়ে বাইরে একবার তাকিয়ে পেছনে ফিরে আহমদ মুসার দিকে তিনটি আঙুল তুলল।

আহমদ মুসা বুঝল, বাইরে তিনজন লোক। দরজা খুলে দেবার জন্যে আহমদ মুসা ইংগিত করল।

ব্রুনা দরজা খুলে এক হাতে দরজা ধরে রেখে মুখ বাড়িয়ে বলল, 'আপনারা কারা? কি চাই আপনাদের?'

'আপনার কাছে এসেছি। আমরা করপোরেশনের সিকিউরিটির লোক। আপনাকে আমাদের সাথে আমাদের অফিসে যেতে হবে।' বলল ওদের তিনজনের একজন।

ওরা তিনজন একই বয়সের। সকলেরই পরনে সিকিউরিটির ইউনিফরম।

ব্রুনার মুখ শুকিয়ে গেছে।

সে দরজা থেকে সরে ফিরে আসতে চাইল আহমদ মুসার দিকে।

ওরা তিনজনই ছুটে এসে ধরে ফেলল ব্রুনাকে। চিৎকার করে উঠল ব্রুনা।

আহমদ মুসা বসে ছিল। বসে থেকেই বলল, 'শোন তিন বীর পুরুষ। ছেড়ে দাও ব্রুনাকে। একজন তরুণীকে ধরতে তিন বীর পুরুষের দরকার হয় না।'

আহমদ মুসার কন্ঠ খুব ঠাণ্ডা কিন্তু শক্ত।

ওরা তিনজনই চমকে উঠে ছেড়ে দিল ব্রুনাকে। তারা আহমদ মুসাকে আগে দেখতে পায়নি। ব্রুনাকে ছেড়ে দিয়েই ওরা ঘুরে দাঁড়াল আহমদ মুসার দিকে। ব্রুনা দৌড়ে এসে আহমদ মুসার পেছনে দাঁড়াল।

'কে তুমি?' আহমদ মুসার দিকে ঘুরে দাঁড়াবার পর ওদের একজন বলল।

'আমার বন্ধু, আমার অভিভাবক।' আহমদ মুসা কিছু বলার আগেই বলে উঠল ব্রুনা।

ব্রুনার কথা তখন শেষ হয়ে সারেনি। ওদের তিনজনের একজনের হাত অকস্মাৎ উপরে উঠল।

একটা ছুরি ছুটে এল আহমদ মুসার লক্ষে।

আহমদ মুসা আগেই উঠে দাঁড়িয়েছিল। তার পেছনে ব্রুনা।

ছুরির সামনে থেকে আহমদ মুসার সরার উপায় ছিল না। তার পেছনেই দাঁড়িয়ে ছিল ব্রুনা। আহমদ মুসা সরলে ছুরি গিয়ে সরাসরি আঘাত করবে ব্রুনাকে।

সুতরাং আর কোন চিন্তা করার অবকাশ ছিল না। আহমদ মুসার বাম হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলল ছুরিটাকে। ছুরির তীক্ষ্ণ ফলা তার বাম হাতের তালুতে বিদ্ধ হলো।

আহমদ মুসা দেখল আরও একজনের হাত উপরে উঠেছে।

আহমদ মুসা ডান হাত দিয়ে বা হাতের তালু থেকে ছুরিটা বের করতে করতে চিৎকার করে উঠল, 'ব্রুনা, তুমি শুয়ে পড়।'

ব্রুনা আহমদ মুসার হাতে ছুরি বিদ্ধ হওয়া দেখেছে। ভয়ে কাঁপছিল সে। আহমদ মুসার নির্দেশের সাথে সাথে শুয়ে পড়ল ব্রুনা।

আহমদ মুসার কথা শেষ হওয়ার সাথে সাথে আরেকটি ছুরি ছুটে এল আহমদ মুসার লক্ষে।

চোখের পলকে আহমদ মুসা হাঁটু গেড়ে বসে মাথার উপর ছুটে চলা ছুরির বাঁট ধরেই ছুঁড়ল তৃতীয় লোকটির ডান বাহু লক্ষে। তারও ডান হাত উপরে উঠছিল। তার সে হাতে চকচকে তৃতীয় আরেকটা ছুরি।

আহমদ মুসা ছুরিটা ছুঁড়েই বাম হাতের তালু থেকে খুলে নেয়া রক্তাক্ত ছুরিটা ওদের তিনজনের দিকে তাক করে বলল, 'দেখ, আমার নিক্ষিপ্ত ছুরিটা লক্ষ ভ্রষ্ট হবে না। তার প্রমাণ দেখ তোমাদের তৃতীয় লোকটির বাহুতে গেঁথে যাওয়া আমার ছুরি। এখন বল, তোমাদের কে প্রথম মরতে চাও।'

আহমদ মুসার নিক্ষিপ্ত ছুরিটা তৃতীয় ব্যক্তির ডান বাহুর ভিতরের পাশ দিয়ে বাহুর ভিতরে ঢুকে গিয়েছিল। লোকটি ককিয়ে উঠে বাম হাতে ডান বাহু চেপে ধরে বসে পড়েছিল।

ওরা দু'জন সাথী লোকটির বাহুতে বিদ্ধ ছুরিটার দিকে একবার তাকিয়ে চোখ ফেরাল আহমদ মুসার দিকে। তারা আহমদ মুসার কথা অবিশ্বাস করল না। তারা দু'জন দু'হাত উপরে তুলে আত্মসমর্পণ করল।

উঠে দাঁড়িয়েছিল ব্রুনা।

আহমদ মুসা ছুরি নিয়ে এগিয়ে গেল ওদের তিনজনের সামনে।

আহমদ মুসার গা ঘেঁষে তার পেছন পেছন এগোলো ব্রুনা।

ছুরি ওদের দিকে তাক করে আহমদ মুসা বলল, 'দেখ, এক আদেশ আমি দু'বার করি না। বাঁচতে চাইলে বল তোমরা কারা? কেন এসেছিল মেয়েটিকে কিডন্যাপ করতে?' ঠাণ্ডা কিন্তু অত্যন্ত শক্ত কন্ঠস্বর আহমদ মুসার।

ওরা তিনজনেই আহমদ মুসার দিকে তাকাল।

আহমদ মুসার মুখের দিকে তাকিয়ে এবারও তারা আহমদ মুসার কথা অবিশ্বাস করল না। ওদের একজন বলল, 'স্যার, আমরা এই এলাকার একটা শরীর চর্চা ক্লাবের সদস্য। দু'জন লোক এসে আমাদের বলে, এই ম্যাডাম তাদের আত্মীয়, রাগ করে পালিয়ে এসে এখানে রয়েছে। তারা এলে সে দরজা খুলবে না এবং আবার পালিয়ে যাবে। এই কারণে তারা আমাদের দায়িত্ব দিয়েছে তাকে ধরে নিয়ে যেতে। আমাদের ক্লাবের পাশের পার্কে তারা অপেক্ষা করছে।

ম্যাডামকে নিয়ে তাদের হাতে পৌঁছে দেয়াই আমাদের কাজ। আমরা প্রত্যেকে এজন্যে এক হাজার ডলার করে পাব।'

আহমদ মুসা তাকাল একবার ব্রুনার দিকে। তারপর ওদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমাদের নিয়ে ওখানে গেলে তো ওদের পাওয়া যাবে?'

'পাওয়া যাবেই তো স্যার!' বলল ওদের তিনজনের একজন।

'তাহলে চল।'

বলে পেছনে তাকাল। বলল ব্রুনাকে, 'তুমি থাক, আমি আসছি।'

'না স্যার, একা আমি বাসায় থাকতে পারবো না। প্লিজ, আমি আপনার সাথে যাব।' বলল ব্রুনা তার মুখে ভয়ের চিহ্ন।

'ঠিক আছে, এস।' আহমদ মুসা বলল।

'স্যার, আপনার বাম হাত সাংঘাতিকভাবে আহত। রক্ত ঝরছে। এখনই ব্যান্ডেজ করিয়ে নেয়া দরকার।' বলল ব্রুনা।

'ঠিক বলেছ ব্রুনা। ওদেরও একজন আহত।' বলে আহমদ মুসা ওদের আহত লোকটিকে ডাকল।

ব্রুনা ছুটে গিয়ে ফার্স্ট এইড বক্স নিয়ে এসে বলল আহমদ মুসাকে, 'স্যার, চিন্তা করবেন না। আমার ফার্স্ট এইড ট্রেনিং আছে। আমি খারাপ ব্যান্ডেজ করবো না।'

বড় গামলা নিয়ে এসে প্রথমে আহমদ মুসার হাত এ্যান্টিসেপটিক ফ্লুইড মেশানো পানি দিয়ে ধুয়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিল। তারপর আহমদ মুসা ব্যান্ডেজ বেঁধে দিল ওদের আহত অন্য লোকটির হাতে।

সবাই বেরিয়ে এল ব্রুনার ফ্ল্যাট থেকে। সব শেষে বেরুল ব্রুনা ঘর লক করে।

ওদের তিনজনের দু'জন বসল ড্রাইভিং ও তার পাশের সিটে। আহত তৃতীয় জনের সাথে ব্রুনাকে বসাল পেছনে মাঝের সিটে। নিজেকে আড়ালে রাখার জন্যে পেছনের সিটে বসার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আহমদ মুসা।

গাড়িতে ওঠার সময় দৃষ্টির একটা পলক সামনের দিকে পড়তেই আহমদ মুসা দেখল অল্প দূরে একজন লোক রাস্তার পাশে একটা গাছে ঠেস দিয়ে তাদের

দিকে তাকিয়ে আছে। আহমদ মুসার চোখের সামনে পড়তেই লোকটা গাছের আড়ালে সরে গেল। পরক্ষণেই সে ওদিকে রাস্তার পাশের একটা ঝোপের দিকে দৌড়ে গেল। একটু পরেই ঝোপের আড়াল থেকে একটা গাড়ি বেরিয়ে ওদিকে চলে গেল।

লোকটির আচরণ আহমদ মুসার মধ্যে কিছু কৌতুহল সৃষ্টি করলেও এটা আহমদ মুসার মনে কোন ভাবনার সৃষ্টি করল না। উঠে বসল সে গাড়িতে।

গাড়ি দশ মিনিট চলার পর একটা পার্কে প্রবেশ করল। দাঁড়াল একটা ঝাউ গাছের পাশে।

নিরব পার্কটা। এ সময়ে পার্কে কেউ আসে না।

গাড়ির সামনের ওরা দু'জন লাফ দিয়ে গাড়ি থেকে নেমে পড়ল।

কিছুক্ষণ বাইরে পায়চারি করে তারা আহমদ মুসার কাছে এসে বলল, 'স্যার, কাউকে দেখছি না। কিন্তু এই ঝাউ গাছের পাশেই তো আমাদের দাঁড়াবার কথা! ওরা এখানে থাকবে কথা ছিল।'

আহমদ মুসার মনে পড়ল ব্রুনার বাড়ির ওপাশে দেখা সেই লোকটির কথা। ও কি এদের লোক ছিল। হওয়াই সম্ভব। গুণ্ডাদের পাঠিয়ে তাদের উপর চোখ রেখেছিল নিশ্চয়। মুক্তভাবে ব্রুনাকে বের হতে দেখে এবং সাথে আমাকে দেখে ওদের সন্দেহ হয়েছে। নিশ্চয় তাদের ব্যাপারে পুলিশকে বলা হবে, এ সন্দেহও তারা করতে পারে। সন্দেহ করেই কি তাহলে ওরা সরে পড়েছে?'

'ঠিক আছে, তোমরা আরেকটু দেখ।'

তারপর আহমদ মুসা ব্রুনাকে বলল, 'তুমিও নামো। গাড়ির বাইরে গিয়ে দাঁড়াও।'

আরও কিছু সময় পার হলো।

ওরা তিনজন এসে আহমদ মুসার সামনে গাড়ির জানালায় এসে দাঁড়াল। বলল, 'স্যার, ওরা নিশ্চয় ভেগেছে আপনার আসা টের পেয়ে।'

'লোক ওরা কয়জন ছিল?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

'দুই গাড়িতে ওরা ছয়জন। সবাই গাড়ি থেকে নামেনি। দু'জন আমাদের সাথে কথা বলেছিল।' বলল ওদের তিনজনের একজন।

'আচ্ছা, ওদের মধ্যে কি নীল প্যান্ট ও সাদা টি-শার্ট পরা কেউ ছিল?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

'হ্যাঁ স্যার ছিল। একজনের পরনে নীল প্যান্ট ও সাদা টি-শার্ট ছিল।' বলল ওদের তিনজনের মধ্যে আহত লোকটি।

'ব্রুনা যে বন্দী হয়ে এখানে আসছে না, তাদের কাছে এ ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে গেছে। এখানে এলে তাদের বিপদ হবে। এসব বিষয় তারা জেনে ফেলেছে। নিশ্চয় পালিয়েছে ওরা।' বলল আহমদ মুসা।

'সত্যিই তারা জেনেছে? আপনি কি করে জানলেন স্যার?' বলল ওদের একজন। তাদের চোখে-মুখে একটা ভীতি।

'ব্রুনার বাড়ির বাইরে ওদের একজন পাহারায় ছিল। আমরা গাড়িতে ওঠার সময় সেও ওখান থেকে চলে এসেছে। আমি তাকে দেখেছি।' আহমদ মুসা বলল।

'ওরা খুব জেঞ্জারাস লোক স্যার। আমাদের বিপদ হবে। আপাতত আমাদেরও পালাতে হবে দেখছি।'

বলল তিনজনের সেই আহত লোকটিই।

লোকটির কথা শেষ হতেই চোখের পলকে সব দিক থেকে চার থেকে পাঁচটা গাড়ি এসে আহমদ মুসার গাড়িকে ঘিরে দাঁড়াল। দশ বারোজন লোক নেমে এল সংগে সংগেই।

চারটি রিভলবার উদ্যত হলো চারদিক থেকে আহমদ মুসার গাড়ি লক্ষে। ঠিক এই সাথেই দু'জন এগিয়ে এসে যারা ব্রুনাকে কিডন্যাপ করতে গিয়েছিল এবং আহমদ মুসাদের সাথে এসেছে তাদের দু'জনকে আক্রমণ করল। কয়েকটি ঘুসি লাগিয়ে মাটিতে ফেলে দিল তাদের। ওদের আহত লোকটি চিৎকার করে বলল, 'স্যার, আমাদের কোন দোষ নেই। গাড়ির মধ্যে বসে থাকা লোকটি আমাদের সবাইকে মেরেছে। ওই আমাদেরকে তার সাথে আসতে বাধ্য করেছে।'

রিভলবারধারী একজন গিয়ে গাড়ির দরজায় একটা লাথি মেরে বলল, 'বেরিয়ে আয় শালা, দেখাচ্ছি মজা।'

আহমদ মুসা দরজা খুলে দু'হাত মাথার উপরে তুলে বের হয়ে এল গাড়ি থেকে।

রিভলবারধারীদের দু'জন গাড়ির এপাশে ছিল। গাড়ির ওপাশের দু'প্রান্তে দু'জন।

গাড়ি থেকে নেমে সোজা হয়ে দাঁড়াবার সময় চারদিকটা একবার তাকিয়ে দেখে নিল আহমদ মুসা।

সোজা হয়ে দাঁড়াতেই রিভলবার তাক করে কাছের লোকটি তার দিকে এগিয়ে এল।

গাড়ির ওপাশ থেকে একজন চিৎকার করে উঠল, 'শালাকে শেষ করে দাও। ব্রুনাকে আমরা গাড়িতে তুলছি।'

রিভলবারের একটা নল ধীরে ধীরে এসে আহমদ মুসার কপালে ঠেকল।

রিভলবারধারী দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'একটুও শব্দ হবে না। পুলিশ যখন আমাদের সন্ধানে আসবে তখন আমরা অস্ট্রিয়া পার।'

লোকটির কথা শেষ হবার সাথে সাথেই গাড়ির পেছন দিক থেকে একটা ছুরি এসে রিভলবারধারীর বাহুতে বিদ্ধ হলো। লোকটি ককিয়ে উঠে তার ডান বাহু চেপে ধরে বসে পড়ল।

আহমদ মুসা দ্রুত পেছন দিকে তাকাল। দেখল, গাড়ির পেছনে দাঁড়িয়ে সেই তিনজনের আহত লোকটি। সন্দেহ নেই আহমদ মুসার, এই লোকটিই ছুরি ছুঁড়েছে আহমদ মুসাকে হত্যা করতে যাওয়া রিভলবারধারীকে।

লোকটির উপর চোখ পড়তেই আহমদ মুসা দেখল তার চোখ ঘুরে গাড়ির ওপাশের দিকে। তার চোখে-মুখে আতংক।

আহমদ মুসা দ্রুত তাকাল গাড়ির ওপাশে। দেখল, একটা রিভলবার উঠে আসছে ছুরি ছুঁড়ে মারা সেই আহত লোকটিকে লক্ষে।

আহমদ মুসার ডান হাতটা দ্রুত চলে গেল মাথার পেছনে জ্যাকেটের নিচে এবং বেরিয়ে এল 'ব্ল্যাক কোবরা' নামের ছোট কালো কুচকুচে বিপদজনক রিভলবার নিয়ে। পরমানু নিয়ন্ত্রিত এক ধরনের বিস্ফোরণ এর বুলেটকে পরিচালনা করে। এক কমপ্লিট রাউন্ডে এর ১২টি বুলেট থাকে। সাধারণ

রিভলবারের চেয়ে অনেক দ্রুত, নি:শব্দ এর বুলেট এবং এটা অত্যন্ত ভয়ংকর। যে অংগকে এই বুলেট আঘাত করে তা বহু দিনের জন্যে ওজনহীন ও অবশ হয়ে যায়।

চোখের পলকে রিভলবার মাথার উপর দিয়ে ঘুরিয়ে এনে আহমদ মুসা ছুরিতে আহত লোকটিকে গুলি করতে উদ্যত হলো। নিমেষে লোকটির বাহু লক্ষে গুলি করল। গুলিটি ঠিক তার কনুইয়ের উপরের জায়গাটায় বিদ্ধ হলো। লোকটি ট্রিগার চাপতে যাচ্ছিল রিভলবারের। কিন্তু হলো না। খসে পড়ল তার হাত থেকে রিভলবার।

প্রথম গুলিটি করার পর এক সেকেন্ডও দেরি করেনি আহমদ মুসা। আরও দু'জন রিভলবারধারী রয়ে গেছে।

আহমদ মুসার রিভলবার ঘুরে এল ওদিক দিয়ে। আহমদ মুসার প্রথম গুলি এতটাই দ্রুত ও আকস্মিক ছিল যে, ঐ দুই রিভলবারধারীর বিমূঢ়তা কাটতে তাদের অনেক সেকেন্ড নষ্ট হলো। এই নষ্ট সেকেন্ডগুলোই আহমদ মুসা ব্যবহার করল ওদের দু'জনকে গুলি করার কাজে। সম্বিত ফিরে ওরা যখন তাদের রিভলবার তোলার চিন্তা করল, তখনই গুলি বিদ্ধ হলো ওদের রিভলবার ধরা হাত।

তৃতীয় গুলিটা করেই আহমদ মুসা দাঁড়ানো অবশিষ্ট লোকদের লক্ষে রিভলবার তুলে বলল, 'সবাই হাত তুলে দাঁড়াও, সামান্য বেয়াদবী করলে মাথার খুলি উড়ে যাবে। এক কথা আমি দু'বার বলি না।'

কথা শেষ করেই আহমদ মুসা রিভলবার নামিয়ে নিয়ে ব্রুনাকে বলল, 'তুমি পুলিশকে টেলিফোন কর। বল কিডন্যাপার ধরা পড়েছে। ওরা তিনজন তোমার সাক্ষী।'

আহমদ মুসা কথা বলার সময় কয়েক মুহূর্তের জন্যে চোখ নামিয়ে নিয়েছিল ওদের দিক থেকে। এরই সুযোগ গ্রহণ করেছিল ওদের একজন। ছুঁড়েছিল আধুনিক বুমেরাং সুইচ নাইফ। নি:শব্দে ছুটে আসছিল নাইফটি।

চিৎকার করে উঠেছিল ব্রুনা। দেখতে পেয়েছিল সে বিপদজনক ছুরি নিক্ষেপের ঘটনা।

ঘটনার দিকে ঘুরে তাকাবার সময় নষ্ট না করে আহমদ মুসা নি:শব্দে বোঁটা থেকে ঝরে পড়া ফলের মত নিজেকে মাটির উপর ঠেলে দিয়েছিল।

মুহূর্তের ব্যবধানে বেঁচে গেল আহমদ মুসা। অবিশ্বাস্য তীক্ষ্ণ ধারের সুইচ বুমেরাংটি আহমদ মুসার মাথার সামনের চুলের কিয়দংশ ছেঁটে নিয়ে চলে গেল। বসে পড়তে এক মুহূর্ত দেরি হলে বুমেরাং নাইফটি দেহ থেকে মাথাকে আলাদা করে ফেলত।

আহমদ মুসা বসে পড়েই গুলি করল বুমেরাং নিক্ষেপকারীর মাথা লক্ষে। বুমেরাং নিক্ষেপকারী লোকটি তখন মাথা ঘুরিয়ে নিচ্ছিল। সত্যিই আহমদ মুসার গুলি লোকটির কপাল দিয়ে ঢুকে তার মাথা উড়িয়ে দিল।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল।

মোবাইলে কথা বলছিল ব্রুনা।

মোবাইল সে মুখের কাছ থেকে সরিয়ে বলল, 'স্যার, আমি পুলিশকে জানিয়েছি। ওরা আসছে। কিন্তু স্যার, আপনার গুলি, আপনার রিভলবার...। কোন বিপদ হবে না তো? অস্ট্রিয়ার অস্ত্র আইন খুবই কঠোর।'

আহমদ মুসা ব্রুনার উদ্বেগ বুঝল। বলল, 'না ব্রুনা, ভয় নেই। আমার এ রিভলবারের ইউরোপীয় লাইসেন্স রয়েছে।'

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই পুলিশের দু'টি গাড়ি এসে পৌঁছে গেল।

গালে প্রচণ্ড এক থাপ্পড় খেল ক্লারা লিসবেথ।

লিসবেথের পরনে নার্সের পোষাক। কিন্তু গায়ে ডাক্তারের এ্যাপ্রন। এ্যাপ্রনের সামনের বড় পকেট দু'টো ঝুলে আছে। সে দুই পকেটের একটিতে পাওয়া যাবে একটা রিভলবার ও ভয়ংকর একটা সুইচ নাইফ।

ক্লারা লিসবেথকে যে থাপ্পড় দিয়েছে সে গৌরীর মা কারিনা কারলিন।

বিধ্বস্ত তার চেহারা । উস্কু-খুসকু তার চুল। অবিন্যস্ত পোষাক। দু'চোখে তার উদভ্রান্ত দৃষ্টি।

সুন্দর আঙ্গিকের একটা বেডে সে বসে।

বড় ঘর, কিন্তু একেবারেই নিরাভরণ। দেখতে মনে হয় কারাগারের মত। ঘরের ভিতরেই টয়লেট। পড়ার একটা ছোট্ট টেবিল ও একটি চেয়ার। তাতে বই-পত্র কিছু নেই। আছে একটা ট্রেতে খাবার সাজানো।

ক্লারা লিসবেথের গালে এক থাপ্পড় কষিয়েই বলল, 'বলেছি তো আমি তোদের খাবার খাবো না! মরে যাবো।'

মুহূর্ত থামল। একটা দম দিযে আবার বলে উঠল, 'আমার হাতঘড়ি কোথায়? দেয়ালে ক্যালেন্ডার নেই কেন?'

'আমাকে মেরে না ফেলে মরার মত ফেলে রেখে নির্যাতন চালানো হচ্ছে কেন?'

বলেই কারিনা কারলিন বেড-সাইড থেকে একটা গ্লাস তুলে নিয়ে চোখের পলকে ছুঁড়ে মারল ক্লারা লিসবেথের দিকে।

ক্লারা লিসবেথ সাবধান হওয়ার সময় পায়নি। গ্লাসটা গিয়ে আঘাত করল তার কপালের বাম পাশটায়। জোরের সাথে ছোঁড়া গ্লাসের ভারি গোড়া কপালে লেগে একটা খাদ সৃষ্টি করে উঠিয়ে নিয়ে গেল একখণ্ড চামড়া।

ঝর ঝর করে রক্ত নেমে এসে মুখের উপর দিয়ে গড়াল।

ক্রোধে মুখও লাল হয়ে উঠল। এক টান দিয়ে এ্যাপ্রনের পকেট থেকে রিভলবার বের করে কারিনা কারলিনের কপালে ঠেকিয়ে বলল, 'ম্যাডাম, ইচ্ছা করলেই মাথাটা এখন এফোঁড় ওফোঁড় করে দিতে পারি।'

'ট্রিগারটা চাপ, আমি তো সেটাই চাই।' বলল কারিনা কারলিন।

আর কোন কথা না বলে ক্লারা লিসবেথ রিভলবার পকেটে ফেলে ছুটে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

বাড়ির ভিন্ন একটি অংশের লিফট ধরে উঠে গেল চারতলায়। চারতলার একটা দরজার সামনে দাঁড়াতেই দরজা ফুঁড়ে বেরিয়ে আসা একটা কন্ঠ কথা বলে উঠল, 'ক্লারা, তুমি আহত আমি সেটা জানি। কি বলতে এসেছ, বল।'

‘এক্সিলেন্সি, ম্যাডাম নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছেন। সংজ্ঞায় আসার পরেই সে আনরুলি হয়ে উঠছেন। যে কোন সময় যে কোন কাণ্ড ঘটিয়ে বসতে পারেন।’ ক্লারা লিসবেথ বলল।

‘সব জানি আমি। তুমি যাও। আমি দেখছি।’ বলল দরজা ভেদ করে আসা সেই কণ্ঠ।

দরজায় গোপন মাইক্রোফোন আছে। সে মাইক্রোফোন থেকেই কথাগুলো আসছে।

ক্লারা লিসবেথ ফিরে গেল বাড়ির আগের অংশে তার কক্ষে।

খাটের পাশের দেয়ালটা ফুঁড়ে কালো ইউনিফরমে ঢাকা কালো মুখোশ পরা অনেক বার দেখা পরিচিত কালো মূর্তি সামনে এসে দাঁড়াতেই কারিনা কারলিন চিৎকার করে বলল, ‘শয়তানরা, তোমরা আমাকে আর কত নির্যাতন করবে? আমাকে মেরে ফেল। না হলে যাকে পাব তাকে আস্ত রাখবো না।’

যান্ত্রিক ধরনের হাসি ভেসে এল কালো মূর্তির দিক থেকে। কথা ভেসে এল অনেকটা যান্ত্রিক স্বরে। বলল, ‘হাজার বার শয়তান বল, তাতে কোন ক্ষতি নেই। আমরা যা চাই, তা সম্পূর্ণ পাওয়ার পথে। যতই চাও তুমি মরবে না। তোমাকে আরও বাঁচতে হবে।’

‘কেন বাঁচতে হবে?’ বলল কারিনা কারলিন তীব্র কণ্ঠে।

‘কারণ তোমার মাল্টি বিলিয়ন ডলারের এস্টেট আমাদের হস্তগত হতে আরও কিছু সময় বাকি আছে। তোমার ডুপ্লিকেট যাকে আমরা বসিয়েছি তার সব কিছু ঠিক আছে, কিন্তু তার হস্তাক্ষর ও ফিংগার প্রিন্ট তোমার রেকর্ডেড হস্তাক্ষর ও ফিংগার প্রিন্টের সাথে মিলছে না। এগুলো ঠিক করতে সময় লাগছে। নিউ আরটিফিসিয়াল লেদার টেকনলজিতে তার ফিংগারের প্রিন্ট চেঞ্জ করা হচ্ছে। আর তোমার দুই মেয়ে আনালিসা অ্যালিনা, ব্রুনা ব্রুনহিল্ড ও আলদুনি সেনফ্রিডকে আমরা খুঁজে পাচ্ছি না। তোমাকে মারার আগে তোমার দুই মেয়ে ও স্বামীকে আমরা হত্যা করব। তারা তোমার ডুপ্লিকেটকে পুরোপুরিই সন্দেহ করেছে। আমাদের হাত ফসকে তারা আত্মগোপন করেছে। তবে তাদের আমরা ধরবই। অতএব, চিন্তা করো না, তোমার মৃত্যুর দিন খুব দূরে নয়।’ কালো মূর্তিটি বলল।

পাগলের মত হো হো করে হেসে উঠল কারিনা কারলিন। বলল, 'তোমাদের কোন উদ্দেশ্যই সফল হবে না শয়তান। আমার এস্টেটটা আমার পূর্বপুরুষের অনেক পূণ্যের অর্জন। এটা কোন শয়তানের হাতে পড়তে পারে না। ঈশ্বর এই সম্পদ রক্ষা করবেন। তোমরা আমাকে আটক করেছ আমার স্বামী-সন্তানদেরও শেষ করতে পারবে, তা ভেব না শয়তান। ঈশ্বর আছেন।'

হো হো করে আগের মতই হেসে উঠল সেই কালো মূর্তি। বলল, 'এতক্ষণে তোমার ছোট মেয়ে আমাদের হাতে এসে গেছে। একজনকে পাওয়া গেছে, অন্য দু'জনকে শীঘ্রই পাওয়া যাবে। একজন কিশোরীর মুখ খুলাতে খুব বেশি সময় লাগবে না, এটা ম্যাডাম তুমিও জানো।'

'আমার এখন যেমন কিছু করার শক্তি নেই, সুযোগ নেই, তেমনি তোমার এসব কথাকে আমি ভয়ও করছি না। আমার ভরসা এখন একমাত্র ঈশ্বর। আমার স্বামী-সন্তানদের তাঁর হাতেই ছেড়ে দিয়েছি।'

'কিছু করার যোগ্যতা যাদের থাকে না, তারাই এমন করে ধর্মের ভেক ধরে।' সেই কালো মূর্তি বলল।

'যারা শয়তান তারা এমন কথা বলতেই পারে। স্যাক্সনরা ধর্মের ভেক ধরে না। ধার্মিক স্যাক্সনরা বিভিন্ন রকম অধর্মের ভেকধারীদের মুখোশ খুলে দেয়, এ ইতিহাস একটু খুঁজলেই পাবে শয়তান।' বলল কারিনা কারলিন।

কালো মূর্তির মুখ নড়ে উঠেছিল। কিন্তু তার কথা শুরুর আগেই মোবাইলের রিং বাজার শব্দ বেরুলো তার কালো ইউনিফরমের ভিতর থেকে। মুখ তার বন্ধ হয়ে গেল।

ধীরে ধীরে হাতটি তার পকেট থেকে মোবাইলে তুলে নিল।

'হ্যাঁ, বল হেংগিস্ট, ওদের খবর কি?' বলল কালো মূর্তি।

'স্যার, খবর ভালো নয়। ওরা ব্রুনা ব্রুনহিল্ডকে হাতে পেয়েও রাখতে পারেনি। কেউ তাদের হাত থেকে কেড়ে নিয়েছে। আমাদের চারজন লোক আহত, এর মধ্যে তিনজন গুলি বিদ্ধ। আর...।'

ওপারের কথা শুনতে শুনতে হঠাৎ ধমক দিয়ে বলে উঠল, ‘থাম, আমি তোমার কাছ থেকে ঘটনার রিপোর্ট চাইনি। বল, ব্রুনাকে কারা কেড়ে নিয়েছে? পুলিশ তো অবশ্যই নয়!’

‘না, পুলিশ নয়। একজন অপরিচিত লোক।’ ওপার থেকে বলল।

‘তোমরা গাঁজাখুরি গল্প সাজাচ্ছ? একজন অপরিচিত রাস্তার লোক দশ বারোজন সশস্ত্র লোকের কাছ থেকে ব্রুনাকে কেড়ে নিয়েছে? আসল ঘটনা কি বল।’ বলল কালো মূর্তি তীব্র ক্ষোভের সাথে।

‘স্যার, ঘটনাটা ঠিক স্যার। সালজবার্গের আমাদের আরও দু’টি সূত্র থেকেও আমাকে এই ঘটনাই জানানো হয়েছে।’ বলল হিংগিস্ট ওপার থেকে।

‘আমাদের ওরা কোথায়?’ বলল কালো মূর্তি।

‘ওরা নির্দেশের অপেক্ষা করছে।’ হিংগিস্ট বলল ওপার থেকে।

‘ওদের জন্যে আমার কি নির্দেশ জানো না তুমি? ওরা এখন শত্রুর সূত্র, শত্রুরা ওদের ফলো করবে। লায়েবিলিটি ওরা এখন।’ কালো মূর্তি বলল।

‘বুঝেছি স্যার, আগামী কালের সূর্যোদয় ওরা দেখতে পাবে না।’ বলল ওপার থেকে হিংগিস্ট।

এবার হো হো করে হেসে উঠেছে কারিনা কারলিন। বলল, ‘বললাম না শয়তান, ঈশ্বর আছেন। ঈশ্বর আমার স্বামী-সন্তানদের রক্ষা করবেন। দেখলে ব্রুনাকে হাতে আনার তোমাদের ষড়যন্ত্র ঈশ্বর সফল হেত দিলেন না।’

কালো মূর্তিটি ক্রোধের সাথে মাটিতে সজোরে একটা লাথি ঠুকে বলল, ‘চুপ ম্যাডাম! আমার লোকদের ভুলে একবার ছাড়া পেয়েছে তোমার মেয়ে। কিন্তু আমাদের জালে সে ধরা পড়বেই। নিশ্চিত থাক, তোমার সামনেই ওকে আমরা টুকরো টুকরো করব অথবা তার লাশ তোমার কাছে আসবে।’

‘আমাকে ভয় দেখিও না। মৃত্যু ভয় না থাকলে তার আর কোন কিছুর ভয় থাকে না। স্বামী-সন্তানদের আগেই আমি ঈশ্বরের হাতে ছেড়ে দিয়েছি। তাদের কথা আমি ভাবিও না।’ বলল কারিনা কারলিন।

কারিনা কারলিনের কথা শেষ হতেই আবার মোবাইল বেজে উঠল সেই কালো মূর্তির।

মোবাইল ধরেই কালো মূর্তি বলল, ‘বল হিংগিস্ট, জরুরি কিছু?’

‘স্যার, যে লোকটি ব্রুনাকে কেড়ে নিয়েছে, তার সম্পর্কে কিছু জানা গেছে।

সে ইউরোপীয় নয়, এশিয়ার হতে পারে। আরও জানা গেছে সে আজ সকালে ব্রুনার সাথে সাক্ষাত করতে তার ফ্ল্যাটে গিয়েছিল। আজকের ঘটনার পর ব্রুনা ফ্ল্যাটে যায়নি। তাদের খোজা হচ্ছে।’ বলল হিংগিস্ট ওপার থেকে।

‘অবিশ্বাস্য! একজন এশিয়ান প্রায় ডজনের মত আমাদের লোকের কাছ থেকে ব্রুনাকে কেড়ে নিল। বলে দাও ওদের, যে কোন মূল্যে তাকে ও ব্রুনাকে আমি চাই। আমার কেন জানি মনে হচ্ছে ওরা জার্মানিতে আসবে। অস্ট্রিয়া থেকে যত রাস্তা জার্মানিতে প্রবেশ করেছে সবক’টির উপর চোখ রাখতে বল। আর ইমিগ্রেশন পোস্টগুলোতে আমরা যে বন্দোবস্ত করেছি, তাকে জোরদার করে তোল।’ বলল কালো মূর্তিটি।

কালো মূর্তির কথা সমস্ত মনোযোগ দিয়ে শুনছিল কারিনা কারলিন। সে থামতেই বলে উঠল, ‘শোন শয়তানরা, তোমাদের এক ডজন লোক একজন এশিয়ানের সাথে পারেনি, এটাই ঈশ্বরের মার। মনে রেখ ঈশ্বরের মার তোমাদের উপর শুরু হয়েছে।’

কালো মূর্তির ডান হাতটা পকেটের মধ্যে ছিল। রিভলবার সমেত বের হয়ে এল তার হাত। তার রিভলবার উঠল কারিনা কারলিনের মাথা লক্ষে। কিন্তু মুহূর্তেই আবার রিভলবারটা নামিয়ে নিল সে। বলল, ‘তোমার জীবনের আরও কয়দিন বাকি। মারব সেদিন রিভলবার দিয়ে নয়। মারব মৃত্যু যন্ত্রণা কি তা যাতে হাড়ে হাড়ে বুঝতে পার, সেভাবে। মনে রেখ, তোমার মেয়ে দু’টি নিয়ে আসব তোমার কাছে। তাদের নরম দেহের উপর শকুন লেলিয়ে দিয়ে ভোজের মহোৎসব করব। তখন বড় বড় কথা তোমার কোথায় যায় দেখব। এই যন্ত্রণার পর তোমার আসল মৃত্যু যন্ত্রণা শুরু হবে। অপেক্ষা কর।’

‘শয়তানরা শোন, কথাগুলো বলছ নিজেকে ঈশ্বর সাজিয়ে। ঈশ্বরই এর জবাব দেবেন। অপেক্ষা কর।’ বলল কঠোর কণ্ঠে কারিনা কারলিন।

'ম্যাডাম! তুমি সব হারিয়েছ, দেহ থেকে শুরু করে সম্পদ, স্বামী, সন্তান সব তোমার গেছে, তবে দম্ভ তোমার যায়নি।' বলল কালো মূর্তি।

'প্রাণ থাকা পর্যন্ত এ দম্ভ আমার যাবে না। এ দম্ভ বিশ্বাসের প্রতিধ্বনি। আমার সব তোমরা কেড়ে নিয়েছ, কিন্তু বিশ্বাস কেড়ে নিতে পারনি শয়তানরা।' সেই কঠোর কণ্ঠে বলল কারিনা কারলিন।

'হ্যাঁ, রাস্তার কুকুরের কিছুই থাকে না, কিন্তু তাদের ঘেউ ঘেউয়ের অভ্যাস যায় না!' বলে কালো মূর্তিটি তার বুকের কালো একটা বাটনে চাপ দিল। সংগে সংগে দেয়ালে একটা দরজা খুলে গেল। সেই দরজায় এক লাফে ঢুকে গেল কালো মূর্তিটি।

সারা দিন ধরে আহমদ মুসা গোটা সালজবার্গ ঘুরে বেড়িয়েছে। সাথে ছিল ব্রুনা ব্রুনহিল্ড।

জার্মানির প্রায় মাথার উপরে নয়নাভিরাম আল্পস-এর একটা সুন্দর খণ্ড অস্ট্রিয়ার এই ছোট্ট সালজবার্গ শহরটি মুগ্ধ করেছে আহমদ মুসাকে।

ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে আহমদ মুসা বেভিয়ান আল্পস-এর সুন্দর পাহাড়শৃঙ্গ, উপত্যকা, অপরূপ দৃশ্যের কিংস লেক রিভার, হিটলারের অবকাশ কেন্দ্র 'ঈগল নেসট', অস্ট্রিয়ার ওয়ান্ডার ল্যান্ড সালজবার্গের গ্রামীণ উপকন্ঠ, সালজবার্গের ঐতিহাসিক বারুক টাওয়ার, বিশপ রুপার্ট ও বেভিরিয়ান ডিউকদের শাসনকেন্দ্র ঐতিহাসিক গীর্জাগুলো দেখেছে। সবশেষে ঐতিহাসিক বারুক টাওয়ার থেকে বেরিয়ে আসার সময় ব্রুনা বলল, 'আপনাকে একজন সমঝদার ট্যুরিস্ট মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে, আপনি সালজবার্গ দেখার জন্যেই এখানে এসেছেন। কেমন লাগছে স্যার, সালজবার্গকে?'

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'সালজবার্গের যেটুকু আল্লাহর তৈরি, 'সেটুকু খুবই সুন্দর। কিন্তু যে অংশটা 'ম্যান মেড' মানে মানুষের তৈরি, সেটুকু অনেকটাই একঘেয়ে।'

'যেমন?' কিছুটা বিস্ময়ের সাথে বলল ব্রুনা।

'সালজবার্গে কনসার্ট হল ও গীর্জার ছড়াছড়ি দেখছি। এই যে বারুক টাওয়ার থেকে বেরুলাম, সেটাও নাচ-গান জাতীয় শিল্পের জন্যে তৈরি। মনে হচ্ছে এদিকের মানুষের মন আছে, মাথা নেই। আবার দেখ, বড় বড় স্থাপনাগুলো গীর্জা। সেগুলোর আকৃতি যাই হোক, প্রকৃতিটা পোড়ো বাড়ির মত মানে মানুষের আত্মা আছে কিন্তু মানুষের প্রাণস্পন্দন এখানে নেই।' আহমদ মুসা বলল।

‘গীর্জাগুলো পুরানো, প্রাণহীন এটা বুঝলাম। কারণ খুব কম মানুষই গীর্জায় যায়। নতুন গীর্জাও তৈরি হচ্ছে না এ কারণেই। কিন্তু এখনকার মানুষের মাথা নেই, একথা বলছেন কেন?’ বলল ব্রুনা। তার মুখে হাসি।

‘নাচ-গান বা এ ধরনের কমর্কাণ্ড যাদের আনন্দের একমাত্র বা প্রধান উৎস হয়ে দাঁড়ায়, তাদের মাথা থাকে না। ধীরে ধীরে মহৎ কাজ, মহৎ চিন্তা ও মহৎ সৃষ্টির ক্ষমতা তাদের লোপ পায়। গ্রীক সভ্যতার শেষ দিকে এটাই ঘটেছিল এবং তার ধ্বংসও ত্বরান্বিত হয়েছিল।’ আহমদ মুসা বলল।

গম্ভীর হয়ে উঠল ব্রুনার মুখ। বলল, ‘অনেক ভারি কথা বলেছেন স্যার। আমি এত কিছু জানি না। তবে নাচ-গান শিল্প-সংস্কৃতির অংগ। এটা ক্ষতিকর কেন হবে?’

‘ওষুধ মাত্রা ও সীমার মধ্যে না থাকলে বিষ হয়ে দাঁড়ায়। একইভাবে উপাদেয় খাদ্যও ভয়ানক ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়াতে পারে।’ বলল গম্ভীর কন্ঠে আহমদ মুসা।

আনন্দ-বিস্ময় ব্রুনার চোখে-মুখে! বলল ‘স্যার, অ্যালিনা আপার কথা শুনে মনে হয়েছিল, আপনি একজন বড় গোয়েন্দা বা অস্ত্রধারী অ্যাক্টিভিস্ট। আজ নিজ চোখে যা দেখলাম তাতে সেই বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়েছিল। কিন্তু এখন দেখছি, আপনি একজন সমাজ সংস্কারক বা দার্শনিকের ভাষায় কথা বলছেন!’

‘একজন সৈনিক আদর্শ চর্চা, দর্শন চর্চা করতে পারে না?’ আহমদ মুসা বলল।

‘পারে হয়তো, জানি না আমি। আপনার মধ্যেই প্রথম দেখলাম তাই বলছিলাম।’ বলল ব্রুনা।

মুহূর্তের জন্যে থেমেছিল ব্রুনা। তারপরেই গাড়ির দরজা খুলে আহমদ মুসাকে বসার জন্যে স্বাগত জানিয়ে বলল, ‘স্যার, শহরের তেমন আর কিছু দেখার বাকি নেই। আপনার উৎসাহে স্যার শহরের অনেক কিছু আমারও দেখা হয়ে গেল। ধন্যবাদ, এমন উৎসাহ স্যার, জাত-ট্যুরিস্টদেরও থাকে না। এখন আমরা কোথায় যাচ্ছি স্যার?’

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'আমি সারা দিন ধরে শহর ঘুরলাম শহর দেখার জন্যে নয় ক্রুনা।'

'তাহলে?' চোখে-মুখে বিস্ময় ক্রুনার।

'দুই কারণে আমি সারা দিন শহর ঘুরলাম। তার একটি হলো, আমি দেখতে চেয়েছিলাম শত্রুপক্ষের কেউ আমাদের অনুসরণ করে কিনা। আর দ্বিতীয় কারণ...।'

আহমদ মুসার কথার মধ্যখানে ক্রুনা বলে উঠল, 'শত্রুরা আমাদের পিছে পিছে আছে?' উদ্বেগ ফুটে উঠেছে ক্রুনার মুখে।

'পিছু তো নেবার কথা। কিন্তু সারা দিনেও ওদের দেখা পাইনি। তার অর্থ হলো, আমরা ওদের নজরে নেই।' বলল আহমদ মুসা।

স্বস্তির নি:শ্বাস ফেলে ক্রুনা বলল, 'ভালো খবর স্যার।'

'এই ভালো সব ভালো নাও হতে পারে।' আহমদ মুসা বলল।

কথা শেষ করেই আবার বলে উঠল, 'তাহলে এবার চল।'

'না স্যার, দ্বিতীয় কারণটা তো জানাই হলো না। বলুন স্যার, দ্বিতীয় কারণটা কি?' ক্রুনা বলল।

'হ্যাঁ, সেটা হলো সময় কিল করা।' বলল আহমদ মুসা।

'কেন? সময় কিল করা কেন?' জিজ্ঞাসা ক্রুনার।

'তোমার আব্বাকে এখানে আসার সময় দেবার জন্য'। বলল আহমদ মুসা।

আমার আব্বা এখানে আসবেন? কেন? তিনি তো বলেছেন আমরা ক্রুমসারবার্গে পৌঁছার পর তাঁকে জানালে তিনি সেখানে আসবেন।' ক্রুনা বলল।

'আমি তাঁকে সালজবার্গে আসতে বলেছি।' বলল আহমদ মুসা।

'আপনি বাবাকে সালজবার্গে আসতে বলেছেন? কেন স্যার?' ক্রুনা বলল। তার চোখে-মুখে বিস্ময়।

'আমাদের একজন তৃতীয় সাথী দরকার।' বলল আহমদ মুসা।

'তা না হলে আমাদের দু'জনের জন্যে এক সাথে চলা সম্ভব নয়।' আহমদ মুসা বলল।

চোখে-মুখে বিস্ময় ফুটে উঠল ব্রুনার! বলল, 'কেন দু'জন এক সাথে চলা সম্ভব নয়?'

একটা গাম্ভীর্য নেমে এল আহমদ মুসার মুখে। বলল, 'তুমি নিশ্চয় জান না ব্রুনা, আমাদের ধর্ম ইসলামে পরস্পরের মধ্যে বিবাহ বৈধ এমন ছেলেমেয়েদের অবাধ মেলামেশা, নির্জন কক্ষে থাকা বা সাক্ষাত ইত্যাদি ধরনের কাজ নিষিদ্ধ।'

'হ্যাঁ, তাতে আমরা দু'জন এক সঙ্গে চলার পথে অসুবিধা কোথায়?' জিজ্ঞাসা ব্রুনার।

'অসুবিধার বিষয়টা বলতে গেলে অনেক কথা বলতে হয়। এক কথায় উত্তর হলো, আমাদের ধর্মের যে জীবনাচরণ তাতে এই এক সংগে চলার কোন সুযোগ নেই।' বলল আহমদ মুসা।

'কেন?' ব্রুনা বলল বিস্ময়ের সাথে!

'যাদের সাথে অবাধে মেলামেশা করা যায় এমন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় তুমি আমার নও।' বলল আহমদ মুসা।

'তাতে কি? অনাত্মীয়ের সাথে কি পথ চলে না মানুষ?' ব্রুনা বলল।

'চলে। আমারও চলতে আপত্তি নেই। কিন্তু সাথে তোমার পিতা ধরনের কাউকে থাকতে হবে।' বলল আহমদ মুসা।

'কিন্তু কেন, এই কথা আমি জানতে চাচ্ছি।' ব্রুনা বলল।

'দেখ ব্রুনা, বিষয়টি নর-নারীর অবৈধ সম্পর্ক ও অপরাধ বিস্তারের সাথে জড়িত। নর-নারীর বিবাহবহির্ভূত অবৈধ সম্পর্ক আমার ধর্ম ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে। কারণ নর-নারীর অবাধ মেলামেশা থেকে এই অবৈধ সম্পর্কের সৃষ্টি হয়। আমরা এক সাথে চলতে গেলে যে অবাধ মেলামেশা হবে, তা আমাদের ধর্মে গ্রহণযোগ্য নয়।' বলল আহমদ মুসা।

ব্রুনার মুখ লাল হয়ে উঠল। কিছুটা বিব্রত ভাবও ফুটে উঠল তার চোখে-মুখে। বলল, 'স্যার, আমাদের সম্পর্কেও কি এমন ভাবা যায়?'

'এটা তোমার আমার কথা নয়। মানব প্রবণতাকে সামনে রেখে এটা মানুষের জন্যে তৈরি নৈতিক বিধান। এর অন্যথা হলে নারী-পুরুষের সম্পর্ক

অবৈধ, এটা অপরাধের পর্যায়ে যে কোন সময় পৌঁছে যেতে পারে।' বলল আহমদ মুসা।

'এটা একটা আশংকার ব্যাপার।' ব্রুনা বলল।

'এটা আশংকার ব্যাপার নয় ব্রুনা। যা সমাজে ঘটে চলেছে তাকে আশংকা বলতে পার কেমন করে? বেশি দূরে যাওয়ার দরকার নেই। তুমি যে এলাকায় বাস কর সে এলাকা, তোমার স্কুল, তোমার কলেজ, তোমার বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে একবার নজর দাও। দেখবে, ছেলেমেয়ে, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা কত ধরনের ব্যক্তিগত সামাজিক সমস্যা, কত দু:খজনক ঘটনা ও সংঘাতের সৃষ্টি করেছে।' বলল আহমদ মুসা।

সংগে সংগেই উত্তর দিল না ব্রুনা। ভাবল কিছুক্ষণ সে। বলল, 'আমি বুঝতে পেরেছি স্যার। আপনি ছেলেমেয়েদের বিশেষ দিকের প্রতি ইংগিত করেছেন। এটা ঠিক স্যার, এই সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটা সাংঘাতিক বিশৃঙ্খলা সমাজে রয়েছে।'

'তুমি কি মনে কর, এই বিশৃঙ্খলা কি সবাই চায়?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

ব্রুনা একটু ভেবে বলল, 'স্যার, বিষয়টা কারও চাওয়া বা না চাওয়ার উপর নেই। পিতা-মাতা চাইলেও, প্রশাসন চাইলেও কারও কিছু করার নেই। বিষয়টা ব্যক্তি স্বাধীনতার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। কে কার সাথে কতটুকু সম্পর্ক করবে, তা এখন ব্যক্তির একক অধিকার।'

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'বিশৃঙ্খল ও অস্বাভাবিক সম্পর্কের সবটা কি ব্যক্তির ইচ্ছায় ঘটছে?'

মুহূর্তের জন্যে চুপ থেকে বলল, 'ইচ্ছা-অনিচ্ছা দু'ভাবেই ঘটছে।'

'জবরদস্তিমূলকভাবে ঘটছে না?' আহমদ মুসা বলল।

'তাও ঘটছে।' বলল ব্রুনা।

'আচ্ছা বলত, ইচ্ছায় যা ঘটছে তার বড় একটা অংশ কি অবস্থাগত চাপে ঘটছে না?' আহমদ মুসা বলল।

সংগে সংগেই উত্তর দিল না রুনা। ভাবল। বলল, ‘ঠিক স্যার, অবস্থাগত চাপেই এটা বেশি ঘটছে। পরিবেশ, অবস্থা ছেলেমেয়েদের এমন অবস্থানে নিয়ে যায় যখন ইচ্ছা সৃষ্টি হয়ে যায়।’

‘এই ইচ্ছা স্বেচ্ছাগত নয়। অবস্থা, অস্বাভাবিক পরিবেশ, অন্যায় পথে সৃষ্টি করছে এই ইচ্ছা। যা ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ কাঠামোকে ধ্বংস করছে।’ বলল আহমদ মুসা।

রুনা কোন জবাব দিল না। তাকিয়ে রইল আহমদ মুসার দিকে। তার ভিতরে একটা প্রচণ্ড তোলপাড়। সে কোন দিন ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজকে এই দৃষ্টিতে দেখেনি। সমাজ চিত্রের একটা নতুন দিগন্ত তার সামনে খুলে গেল। ছেলেমেয়েদের অবাধ-মেশাই অবাঞ্ছিত অধিকাংশ ঘটনার জন্যে দায়ী, তাতো সে অস্বীকার করতে পারছে না। সে নিজের কথা ভাবল। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে বারবার কি এমন বিপদে পড়েনি? আজ যেন ভয় হচ্ছে পেছনের সে কথাগুলো ভাবতে। কিন্তু পরিবারও কি ধ্বংস হচ্ছে এ কারণে! প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজনসহ চল্লিশ-পঞ্চাশটি পরিবারের সাথে সে ঘনিষ্ঠ। এর মধ্যে তার ও আরেকটি পরিবার ছাড়া বিশ পঁচিশ বছর বিবাহ টিকেছে এমন দম্পতি নেই। অধিকাংশ বিয়েই চার-পাঁচ বছরের মধ্যে ভেঙে যাচ্ছে। এক-চতুর্থাংশেরও বেশি পরিবার সিংগল, হয় মা ছাড়া না হয় পিতা ছাড়া। বিয়ে না করার হারও সাংঘাতিকভাবে বাড়ছে। তার ঘনিষ্ঠ চল্লিশ-পঞ্চাশটি পরিবারের অর্ধেকের কোন বাচ্চা নেই। তাদের অনেকেই অনাথ শিশুর প্রতিষ্ঠান থেকে শিশু দত্তক নিয়েছে। সম্ভবত দশ বারটি পরিবারে ১টি করে শিশু আছে। মাত্র সাত আটটি পরিবারের আছে একাধিক সন্তান। এই শিশুগুলো আবার খুব অল্প সময়ই পরিবারের সাথে থাকে। সারা দিন চাইল্ডকেয়ার সেন্টারে কাটিয়ে তারা বাড়িতে আসে রাতে ঘুমাবার জন্যে। মনে পড়ে তার, তার স্কুলে প্রার্থনা দিবসের অনুষ্ঠানে আসা একজন ফাদার বলেছিলো, ‘খৃস্টীয় জ্ঞান ও শিক্ষার অভাবে খৃস্টীয় সমাজের পরিবারগুলো আজ ধ্বংসের মুখে। অনাচার আজ আচারকে গ্রাস করে ফেলেছে।’ এই কথাগুলোর অর্থ সেদিন বুঝেনি সে। আজ তার অর্থ তার কাছে পরিস্কার হয়ে গেল।

পারিবারিক কাঠামো ধ্বংসের বিষয়ে ফাদারের কথাটা ঠিক। কিন্তু অবাধ মেলামেশাই কি এর কারণ?

মুখ তুলল ব্রুনা। বলল, ‘স্যার, ছেলেমেয়ে, নারী-পুরুষের মেলামেশাই কি ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের এত বড় বিপর্যয় ঘটাচ্ছে?’

‘না ব্রুনা, এই সমাজ-পরিবেশের সৃষ্টি করেছে যে ধর্মনিরপেক্ষ, নীতি-বিমুখ জীবনদৃষ্টি, তাই এ অবাধ মেলামেশা যা ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের বিপর্যয়ের জন্যে দায়ী।’

‘তাহলে তো স্যার পশ্চিমা সভ্যতা-সমাজ এজন্য দায়ী হয়ে যায়!’ ব্রুনা বলল।

‘একটা বা কিছু কারণের জন্যে একটা সভ্যতা-সমাজকে দায়ী করা যায় না। একটা সভ্যতা অনেক বড়। তাতে অনেক কিছু খারাপ, অনেক কিছু ভালো থাকে। আবার অনেক খারাপ থাকলে তার মধ্যে কিছু ভালোও থাকে। পশ্চিমী জীবন ও সভ্যতার মধ্যে ভালোটাই বেশি।’ বলল আহমদ মুসা।

‘কিন্তু স্যার, আমাদের ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের এ্ই অবস্থার জন্যে আমাদের সভ্যতাই তো দায়ী, আমি এখন যা বুঝেছি।’ ব্রুনা বলল।

‘এটা সভ্যতার একটা দিক মাত্র। দিকটা ফিলোসফিক্যাল বা দর্শনগত। এদিকটা বাদ দিয়ে পশ্চিমী সভ্যতা মানুষের ব্যবহারিক জীবনের জন্যে হাজারো যন্ত্র ও ব্যবস্থার সৃষ্টি করেছে। কোন কথাই এর প্রশংসার জন্যে যথেষ্ট নয়।’ বলল আহমদ মুসা।

‘সভ্যতার ফিলোসফিক্যাল দিকটা কি? সেখানে ক্রটিটা কি স্যার?’ ব্রুনা বলল।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘অনেক বড় প্রশ্ন। এখন আলোচনার সময় নয় এটা ব্রুনা। তবে এটুকু বলা যায়, তোমাদের সভ্যতা মানুষকে দেহসর্বস্ব মনে করেছে। তারা কাজ করবে, খাবে, আনন্দ-ফুর্তি করবে এবং তারপর একদিন জীবনের ইতি ঘটে যাবে। মানুষের বিচার-বুদ্ধি আছে এবং তার একজন স্রষ্টা আছেন, মানব-জীবন বিষয়ে স্রষ্টার একটা উদ্দেশ্য আছে, এসব অস্বীকার করে তোমাদের সভ্যতা। মানুষের জীবনোত্তর কোন ভবিষ্যত যদি না থাকে, বাঁচার

জন্যে খাওয়া আর বাঁচা যদি হয় যথেচ্ছ জীবন-উপভোগের জন্যে, তাহলে মানুষ সব ক্ষেত্রেই স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠে। রাষ্ট্রীয় আইন চেষ্টা করে একে নিয়ন্ত্রিত করতে। কিন্তু মানুষের তৈরি, মানুষের দ্বারা বাস্তবায়িত আইন মানুষের জীবনের সবক্ষেত্রে পৌঁছতে পারে না। শুধু ভয় দেখিয়ে চাপ দিয়ে মানুষের মন নিয়ন্ত্রণ হয় না। তোমাদের সভ্যতা তা পারেনি ব্যবহারিক জীবনের ক্ষেত্রে অনেক সাফল্য সত্ত্বেও তোমাদের সভ্যতা এখানে এসে ব্যর্থ।'

'স্যার, আপনি মরালিটি মানে নৈতিকতার কথা বলছেন যার কারণে মানুষ স্বতস্ফুর্তভাবে অপরাধ থেকে দূরে থাকে। আমার একটা বিস্ময়, পশ্চিমী সভ্যতা মানুষের মধ্যে এই নৈতিকতা সৃষ্টি করতে পারলো না কেন!' ব্রুনা বলল।

'কারণ তোমাদের সভ্যতা ধর্মনিরপেক্ষ। নৈতিকতা আসে সার্বজনীন নীতিবোধ থেকে। সার্বজনীন নীতিবোধ আসে জগতসমূহের স্রষ্টার কাছ থেকে।' বলল আহমদ মুসা।

'কেন ধর্ম, স্রষ্টা ছাড়া এই নীতিবোধ মানুষ সৃষ্টি করতে পারে না?' ব্রুনা বলল।

'পারে না। তোমাদের সভ্যতা তার প্রমাণ।' আহমদ মুসা বলল।

'কেন পারে না, সেটাই আমার প্রশ্ন।' ব্রুনা বলল।

'করতে পারে না নয় ব্রুনা, করতে পারে। কিন্তু সেটা মানব রচিত আইন হয়, স্রষ্টার দেয় নৈতিক আইন হয় না। মানুষের আইনের বাস্তবায়ন হয় মানুষের পুলিশ দ্বারা, কিন্তু স্রষ্টার আইনের বাস্তবায়ন করতে পুলিশের দরকার হয় না। একটা উদাহরণ দিচ্ছি ব্রুনা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মদের ভয়াবহ বিস্তার রোধ করার জন্য মদ নিষিদ্ধ করে আইন তৈরি হয়। এই আইন তৈরির পর মদ তৈরির গোপন কারখানা সাংঘাতিকভাবে বেড়ে যায় এবং মদের বিস্তারও বেড়ে যায়। আইন ও পুলিশ তা রোধ করতে পারেনি। মার্কিন সরকার শেষে মদ নিষিদ্ধের আইন বাতিল করতে বাধ্য হয়। এর পাশাপাশি দেখ, স্রষ্টার বিধান হিসাবে মুসলমানদের মধ্যে মদ নিষিদ্ধ। মুসলিম সমাজ দেখ সাধারণভাবে মদমুক্ত। ব্যতিক্রম হিসাবে মুসলিম সমাজে যারা মদ খায়, তারা অনেকটা গোপনে খায় এবং একে অপরাধ বলে মনে করে। দেখা যায় মদ্যপরাও এই কারণে মদ এক সময় ছেড়ে দেয়।

স্রষ্টার এই বিধান বাস্তবায়নে কোন সময় পুলিশের দরকার হয়নি, এখনও হয় না এবং জেনে রেখ কখনই হবে না। স্রষ্টার দেয়া বিধানের এটাই শক্তি।' আহমদ মুসা বলল।

'কিন্তু স্যার, খৃস্টান সমাজে তো এমন হয় না! খৃস্ট দর্শনেও তো ধর্ম, ঈশ্বরকে মানা হয়!' বলল ব্রুনা।

'কিন্তু এখন খৃস্টান সমাজে ধর্ম ও ঈশ্বর তো শুধু গীর্জায়! গীর্জার বাইরে তোমরা সবাই ধর্মনিরপেক্ষ।' বলল আহমদ মুসা।

'বুঝলাম স্যার। কিন্তু আমাদের ধর্ম থেকে আপনার ধর্মের পার্থক্য কোথায়? আমি আমার আনালিসা আপার কথায় বুঝেছি তিনি আপনার ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। আপনাদের ধর্মে কি আছে, আমাদের ধর্মে তা নেই কেন? গীর্জার বাইরে আমরা ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে গেলাম কি করে?' বলল ব্রুনা।

'এক কথায় এর উত্তর নেই ব্রুনা। সংক্ষেপে এটুকু জেনে রাখ, ঈশ্বর বা আল্লাহ তোমাদের ধর্মেও আছেন, আমাদের ধর্মেও আছেন, কিন্তু তোমাদের ধর্মগ্রন্থে জীবন ব্যবস্থা নেই, আমাদের ধর্মগ্রন্থ গোটাটাই মানুষের জীবন ব্যবস্থা। আমাদের ধর্মগ্রন্থের প্রথম বাক্যটাই হলো, 'এই গ্রন্থ, যাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই, যারা স্রষ্টা বা আল্লাহকে ভয় করে এটা তাদের পথনির্দেশিকা।' তোমাদের ও আমাদের ধর্মের মধ্যে এটাই পার্থক্য।'

'তাহলে তো আমাদের ধর্মে ঈশ্বর ছাড়া আর কিছুই নেই, কিন্তু কেন...।'

কথা শেষ করতে পারলো না ব্রুনা।

একটা গাড়ি এসে আহমদ মুসাদের গাড়ির পাশে দাঁড়াল।

ব্রুনা কথা শেষ না করেই সেদিকে তাকাল।

গাড়ি থেকে নামল সুবেশধারী একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক।

ভদ্রলোককে দেখেই ব্রুনা উচ্ছ্বসিত কন্ঠে বলে উঠল, 'বাবা তুমি? এখানে?'

বলে ছুটে গিয়ে ব্রুনা তার পিতার কাঁধ আঁকড়ে ধরে পাশে দাঁড়াল।

প্রৌঢ় ভদ্রলোক ব্রুনার পিতা আলদুনি সেনফ্রিড।

আলদুনি সেনফ্রিড 'ভালো আছ মা' বলে মেয়ে ব্রুনার পিঠ চাপড়ে আহমদ মুসার দিকে এগোলো।

আহমদ মুসাও এগিয়ে আসছিল।

আহমদ মুসা ও আলদুনি সেনফ্রিড হ্যান্ডশেক করল। হ্যান্ডশেক করেই আলদুনি সেনফ্রিড বলে উঠল, 'ওয়েলকাম মি. আহমদ, প্রথমে আমার কৃতজ্ঞতা আপনাকে জানাতে চাই, আমি ব্রুনার কাছে সব শুনেছি। মনে হচ্ছে, খোদ ঈশ্বর আপনাকে পাঠিয়েছেন।'

'ধন্যবাদ আপনাকে। আমরা আপনারই অপেক্ষা করছিলাম। ঠিক সময়ে এসেছেন আপনি।' বলল আহমদ মুসা।

ব্রুনা ছুটে এসে তার পিতা ও আহমদ মুসার সামনে দাঁড়াল। বলল, 'বাবা, এই সময় তোমার এখানে আসার কথা ছিল?'

বলেই ঘুরে দাঁড়াল আহমদ মুসার দিকে। বলল, 'স্যার, আমাকে তো কিছু বলেননি?'

'একটু সারপ্রাইজ দেয়া আর কি!' একটু হেসে আহমদ মুসা বলল।

'কিন্তু পথে সাক্ষাতের ব্যবস্থা কেন? বাসায় করা যেত না?' ব্রুনা বলল।

'তোমার বাসার উপর যে শত্রুর চোখ থাকবে, সেটা খুবই স্বাভাবিক।' বলল আহমদ মুসা।

ব্রুনা মুহূর্ত কাল আহমদ মুসার দিকে স্থির দৃষ্টি রেখে বলল, 'ধন্যবাদ স্যার, সত্যিই আপনি বিস্ময়। আপনি কিছুক্ষণ আগে ছিলেন সমাজ-দর্শন নিয়ে একজন ভাবুক মানুষ। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে আপনি একজন প্রফেশনাল গোয়েন্দা!'

একটু থামল। থেমেই তার পিতার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আব্বা, তুমি তো চিনেছই ইনি আহমদ মুসা। তুমি বলেছ, এঁকে ঈশ্বর পাঠিয়েছেন। কিন্তু সিলেকশন আমার বোনের। আব্বা, আমি আমার বোনের জন্যে গর্বিত যে, সে বিস্ময়কর এক মানুষকে সিলেক্ট করেছেন এবং রাজী করিয়েছেন আমাদের সাহায্য করার জন্যে। কিন্তু আমি...।'

আহমদ মুসা ব্রুনাকে থামিয়ে দিয়ে একটু শক্ত কন্ঠে বলে উঠল, 'ব্রুনা, এ ধরনের প্রশংসা ভালো জিনিস নয়। যেটুকু যার যোগ্যতা, সেটুকু তার আল্লাহর দেয়া। প্রশংসা করলে আল্লাহরই করা উচিত। যাক, আসল কথায়...।'

'স্যরি স্যার। আমি...।' আহমদ মুসার কথার মাঝখানেই কথা বলা শুরু করেছিল ব্রুনা।

'প্লিজ ব্রুনা, আমি কথা বলতে শুরু করেছি।' ব্রুনাকে থামিয়ে দিয়ে বলল আহমদ মুসা। আহমদ মুসার মুখে স্বচ্ছ হাসি।

আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে সম্মতি সূচক মাথা নাড়ল ব্রুনা। তার চোখে-মুখে কিছুটা বিব্রত ভাব।

'জনাব সেনফ্রিড, আপনাকে আমি বলেছি আজই আমরা ব্রুমসারবার্গ যাত্রা করব। যাবার পথ সম্পর্কে আপনার চিন্তা বলুন।'

'কিন্তু আহমদ মুসা ব্রুমসারবার্গে যাওয়া কি আমাদের জন্যে ঠিক হবে? ওটা তো এখন শত্রুর গুহা!' বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

'যেখানে কাহিনীর শুরু সেখানে গিয়েই কাহিনীর জট খুলতে হয় মি. সেনফ্রিড।' আহমদ মুসা বলল।

'কাহিনীর জটটা কি মি. আহমদ মুসা?' বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

'কারিনা কারলিন আপনার স্ত্রী, কেন কারিনা কারলিনের মত নয়? যদি উনি কারিনা কারলিন না হন, তাহলে তিনি কে? আসল কারিনা কারলিন মানে আপনার আসল স্ত্রী তাহলে কোথায়? হুবহু একই চেহারার! বয়সের কিছুটা পার্থক্য ছাড়া, দুই কারিনা কারলিনের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, এর রহস্যটা কি? ইত্যাদি।' আহমদ মুসা বলল।

'এসব কথা ব্রুনা ইতিমধ্যেই আপনাকে বলেছে?' বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

'না মি. সেনফ্রিড, গৌরী মানে আপনার মেয়ে আনালিসা অ্যালিনার ডাইরি থেকে আমি জেনেছি।' আহমদ মুসা বলল।

'ডাইরি থেকে? সে কিছু বলেনি?' জিজ্ঞাসা আলদুনি সেনফ্রিডের।

‘তার সাথে এ ধরনের কথা হওয়ার মত সম্পর্ক তার মৃত্যু পর্যন্ত হয়নি।’ আহমদ মুসা বলল।

আলদুনি সেনফ্রিডের চোখে-মুখে বিস্ময় নামল! বলল, ‘তাহলে অ্যালিনা আপনাকে দায়িত্ব দিল কখন? কি দায়িত্ব তাহলে আপনি নিলেন?’

‘দায়িত্ব সে দেয়নি। দায়িত্ব তার কাছ থেকে আমি নেইনি।’ আহমদ মুসা বলল।

চোখ দু’টি ছানাবড়া হয়ে গেল আলদুনি সেনফ্রিডের। বলল, ‘ব্রুনা তো এটাই বলল! আমিও তাই বুঝেছি। আর দায়িত্ব না দিলে, দায়িত্ব না পেলে আপনি এলেন কেন এখানে?’

‘মুমূর্ষ গৌরী মানে আনালিসা অ্যালিনা তার জ্যাকেটের পকেটে তার ডাইরির কথা আমাকে বলে সে ডাইরিটা আমাকে পড়তে অনুরোধ করেছিল। তার ডাইরি পড়েই এই দায়িত্ব আমি গ্রহণ করেছি।’ আহমদ মুসা বলল।

‘মানে আপনি নিজের থেকেই এই দায়িত্ব নিয়েছেন!’ বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

‘হ্যাঁ, আমি নিজের থেকেই নিয়েছি। তবে গৌরী আশা করেছিলেন, দায়িত্ব আমি নিই। তা না হলে ডাইরির শেষ কথাগুলো আমাকে উদ্দেশ্য করে লিখলেন কেন? আরেকটি বিষয়, আমি গৌরীর কাছে ঋণী। উনি আমার শত্রুপক্ষের একজন শীর্ষ ব্যক্তি হয়েও আমার কঠিন দু:সময়ে অযাচিতভাবে তিনি আমাকে সাহায্য করেছেন এবং সর্বশেষে নিজের জীবন দিয়ে আমাকে বাঁচিয়েছেন।’

আলদুনি সেনফ্রিডের চোখে-মুখে বিস্ময়! বলল, ‘কেন তা করেছে অ্যালিনা?’

‘হয়তো নীতিগত কারণে। আমার অবস্থানকে সে ঠিক মনে করেছে। এ নিয়ে কোন কথা বলার সুযোগ তার সাথে কখনও হয়নি।’ বলল আহমদ মুসা।

কথা শেষ করে মুহূর্ত থেমেই আবার বলে উঠল আহমদ মুসা, ‘যাক, এসব মি. সেনফ্রিড, জরুরি কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যাক।’

আবার একটু থামল আহমদ মুসা। বলল পরক্ষণেই, 'আসুন, আমরা গাড়িতে বসে কথা বলি।'

আলদুনি সেনফ্রিড তার ভাড়া করা গাড়ি ছেড়ে দিয়েছিল।

আহমদ মুসা এসে গাড়ির ড্রাইভিং সিটে বসল। আলদুনি সেনফ্রিড ও ব্রুনাকে বসতে বলল পেছনের সিটে।

আহমদ মুসা সামনের দুই সিটের ফাঁকে আলদুনি সেনফ্রিডদের দিকে ফিরে বসেছে। সেই কথা শুরু করল। বলল, 'আমরা এখনি ব্রুমসারবার্গে যাত্রা করব। যাওয়ার রুট ও সমস্যা সম্পর্কে আপনি কিছু বলুন।'

সালজবার্গ থেকে ব্রুমসারবার্গে যাওয়ার কয়েকটা রুটের বিবরণ দিয়ে আলদুনি সেনফ্রিড বলল, 'যাওয়ার পথে এমনিতেই কোন সমস্যা দেখি না। আপনি কোন ধরনের সমস্যার কথা বলছেন?'

'ইমিগ্রেশন চেক-পয়েন্টে কোন সমস্যার আশংকা আছে কিনা?' আহমদ মুসা বলল।

'ওখানে ন্যাশনাল আইডি দেখানোই যথেষ্ট। আর কোন সমস্যা ওখানে নেই। আপনি কি অন্য কোন সমস্যার কথা বলছেন?' বলল সেনফ্রিড।

আহমদ মুসা কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেও কিছু না বলে চুপ করে গেল। বলল, 'চলুন, এবার আমরা যাত্রা করতে পারি।'

'মি. আহমদ মুসা গাড়িটা কার? ব্রুনার তো নয় নিশ্চয়!' বলল আলদুনি সেনিফ্রিড।

'গাড়িটা আমার। কিনেছি। একটা রেন্ট-এ-কার কোম্পানিতে রেজিস্টার্ড। আর আমার পরিচয় আমি এ গাড়ির কমার্শিয়াল ড্রাইভার। আপনারা আমার যাত্রী। ওকে?' আহমদ মুসা বলল।

আলদুনি সেনফ্রিড ও ব্রুনার মুখ বিস্ময়ে হা হয়ে গেছে! আহমদ মুসার মত এত বড় মানুষ, তাদের পরিবারের আজকের আশা-ভরসারস্থল আহমদ মুসা তাদের ট্যাক্সি ড্রাইভার হয়ে গেল। আর এসব সে করল কখন, ভেবেই পেল না তারা।

স্তম্ভিত সেনফ্রিড ও ব্রুনা কিছুক্ষণ কথাই বলতে পারলো না। নিরবতা ভেঙে কথা বলল সেনফ্রিড, 'সত্যি অবাক হওয়ার মত কথা আপনি বললেন। কিন্তু কমার্শিয়াল ড্রাইভারের জন্যে কমার্শিয়াল লাইসেন্স দরকার। আপনি লাইসেন্স পাবেন কোথায়?'

'আমি অস্ট্রিয়াতে এসেই কমার্শিয়াল ইউরো ড্রাইভিং লাইসেন্স করে নিয়েছি।' আহমদ মুসা বলল।

'তার মানে সবই আপনার আগাম পরিকল্পনার ফল!' চোখ কপালে উঠেছে আলদুনি সেনফ্রিডের।

ব্রুনার মুখে এবার বিস্ময় নয় আনন্দে উজ্জ্বল! তার মনে অনেক কথার আকুলি-বিকুলি, তার অ্যালিনা আপা অনেক বড় দিলের ছিল। অনেক বড় না হলে এত বড় মানুষকে কাছে টানলেন কি করে! ব্রুনার সৌভাগ্য এমন মানুষকে সে কাছে পেয়েছে।

আলদুনি সেনফ্রিড বিস্ময়জড়িত কন্ঠেই বলল, 'কিন্তু আহমদ মুসা আপনার পাসপোর্টে পেশা হিসাবে কি লেখা আছে?'

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'আমার পেশা আমার পাসপোর্টে লিখে নিয়েছি শখের গোয়েন্দাগিরি। গোয়েন্দারা তার প্রয়োজনে যে কোন ছদ্মবেশ নিতে পারে।' আহমদ মুসা বলল।

'গোয়ান্দারা নিজের দেশে ও বাইরেও পরিচয় গোপন করে কাজ করে। কিন্তু আপনি পাসপোর্টে যে পরিচয় লিখেছেন, সরকার অসুবিধা করবে না?' বলল ব্রুনা। তার চোখে-মুখে কিছুটা উদ্বেগ।

'সে অসুবিধা যাতে না হয়, এ জন্যে আমি ইউরো ভিসা নেয়ার সময় এ ব্যাপারে বিশেষ অনুমতি নিয়ে এসেছি।' আহমদ মুসা বলল।

'সত্যিই এক বিস্ময় আপনি! অদ্ভুত দূরদর্শিতা আপনার! ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, আপনাকে আমরা আমাদের পাশে পেয়েছি। সত্যি, যাদের কেউ থাকে না, ঈশ্বর তাদের এভাবেই সহায় হন। কৃতজ্ঞ আমরা আপনার কাছে।' বলল আলদুনি সেনফ্রিড। তার কন্ঠ ভারি।

‘আপনি গৌরী ও ব্রুনার পিতা। আমারও পিতৃস্থানীয়। আমাকে দয়া করে ‘তুমি’ বলবেন।’

‘ধন্যবাদ আহমদ মুসা। বিনয়ের দিক দিয়েও তুমি মনে হয় সবার সামনে থাকার মত। আসলে যে মানুষকে সম্মান দেয়, সে সকলের সম্মান পায়। বুঝতে পারছি পৃথিবীতে তোমার এত সম্মান কেন? জানি, আমি এখানে আসার আগে তোমার সম্পর্কে জানার চেষ্টা করেছি। ইন্টারনেট সার্চ করে তোমার সম্পর্কে তথ্যের ভাণ্ডার পেয়েছি। তারপর থেকেই মনে একটা ভয়েরও সৃষ্টি হয়েছে, আমাদের সমস্যার সমাধানের জন্যে ঈশ্বর যখন তোমার মত একজন বিশ্বব্যক্তিত্বকে বাছাই করেছেন, আমাদের সমস্যাও তাহলে নিশ্চয় বিশ্বমাপের মত জটিল কিছু হবে! এরপর থেকেই আমার উদ্বেগ-উৎকন্ঠা বেড়ে গেছে। এরপর আবার আমরা ব্রুমসারবার্গ যাচ্ছি। কিন্তু ওখানে গেলেই তো আমরা ওদের চোখে পড়ে যাব, ধরা পড়ে যাব!’ বলল সেনফ্রিড।

‘ঘটনার গোড়ায় পৌঁছার জন্যে ঘটনাস্থলে যেতে হবে জনাব। আমরা অবশ্যই সাবধান থাকবো। ব্রুমসারবার্গ দুর্গ এলাকাতেই আমরা বাসা ভাড়া নেব।’ আহমদ মুসা বলল।

‘কিন্তু ওখানে তো সবাই আমাদের চেনে?’ বলল সেনফ্রিড।

‘চেনা জায়গা ও লোকে চেনে বলেই আমাদের সাবধানতাটা ভালো হবে। চিন্তা নেই।’

বলেই ঘড়ির দিকে তাকাল আহমদ মুসা। বলল, ‘আর দেরি নয়, যাত্রা শুরু করি এবার।’

চলতে শুরু করল গাড়ি।

গাড়ির লক্ষ সালজবার্গ-মিউনিখ হাইওয়ের বর্ডার চেকপোস্ট।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের নাগরিক ও বিদেশী পর্যটকদের চেকপোস্টে সামান্য কিছু ফর্মালিটি সারতে হয়।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের নাগরিকদের আইডি দেখা হয় এবং বিদেশীদের দেখা হয় ইউরো ভিসা আছে কি না।

পুলিশের রুটিন ডিউটিও থাকে চেকপোস্টে।

শুরু থেকেই আহমদ মুসার মনে একটা স্থির বিশ্বাস ছিল যে, শত্রুরা চেকপোস্টে চোখ রাখবে। নিশ্চয় জার্মানি যাওয়ার সব চেকপোস্টেই ওরা চোখ রাখার ব্যবস্থা করেছে।

দেখা যাক তারা কোন পথে হাঁটে। চেকপোস্টে তাদের কোন উপস্থিতি টের পাওয়া যেতে পারে। চলছে গাড়ি।

অস্ট্রিয়ার বর্ডার ক্রস করে সালজবার্গ-মিউনিখ হাইওয়ে ধরে এগিয়ে চলেছে আহমদ মুসার গাড়ি।

চেকপোস্টে কিছুই ঘটেনি।

কেউ তাদের উপর চোখ রেখেছে, কেউ তাদের দেখছে, এমনটাও মনে হয়নি।

কিন্তু আহমদ মুসার মনে অস্বস্তি। এমনটা হবার কথা নয়। শত্রুরা তাদের পিছু ছাড়বে তা হতেই পারে না। তাহলে গোটা দিন শহরেও তাদের কেউ ফলো করলো না, আবার চেকপোস্টেও তারা পাহারায় নেই কেন? ওরা আট-দশজন গ্রেপ্তার হবার পর ওদের লোক কি সালজবার্গে আর নেই? হতেও পারে। তবে এটা স্বাভাবিক নয়।

গাড়ি চলছিল সীমান্ত পার হয়ে সোজা পশ্চিম দিকে।

সামনে বড় শহর মিউনিখ।

'আমরা কি মিউনিখ, স্টুটগার্ট, হাইডলবার্গ হয়ে রাইনের দিকে যাচ্ছি?' জিজ্ঞাসা করল আলদুনি সেনফ্রিড।

'হ্যাঁ, এ রাস্তা হয়েও যাওয়া যায়। ওদিকে আমার একটা পরিচিত শহর আছে। কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবও ওখানে আছে। তাই তো প্রায় ভুলেই ছিলাম ওদের কথা!' আহমদ মুসা বলল।

'কোন শহর?' জিজ্ঞাসা করল ব্রুনা।

'স্ট্রাসবার্গ।' আহমদ মুসা বলল।

'স্ট্রাসবার্গ? কবে এসেছিলেন ওখানে? বেড়াতে এসেছিলেন?'

'দু'তিন বছর আগে এসেছিলাম। বেশ বেড়ানো হয়েছিল। তবে আসাটা বেড়ানোর জন্যে ছিল না।' বলল আহমদ মুসা।

‘তোমার আসাটা বেড়ানোর জন্যে হতেই পারে না। কি জন্যে এসেছিলে?’ সেনফ্রিড বলল।

‘টুইন টাওয়ারের ধ্বংস বিষয়ে একটা খোঁজে।’ আহমদ মুসা বলল।

ব্রুনা ও সেনফ্রিড দু’জনেই বিস্ময়ের দৃষ্টি তুলল আহমদ মুসার দিকে। ব্রুনাই আগে কথা বলল, ‘ও গড, ঠিকই তো! টুইন টাওয়ার রহস্যের চাঞ্চল্যকর তথ্য উদঘাটনের সাথে আহমদ মুসার নাম পড়েছি! সেই কাহিনীর তো স্ট্রাসবার্গেই শুরু! ভুলেই গিয়েছিলাম এ কাহিনী। আমার মনে হয় স্যার, এই এক ঘটনাই আপনাকে অমর করে রাখবে।’ থামল ব্রুনা।

তার চোখে মুখে উপচে পড়া বিস্ময় ও আনন্দের ঝলক! আনন্দের আলোতে তার রক্তিম ঠোঁট আরও রক্তিম এবং নীল চোখ দু’টি আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

ব্রুনা থামলেই তার পিতা আলদুনি সেনফ্রিড বলল, ‘আমিও ইন্টারনেটে টুইন টাওয়ারের কাহিনী পড়েছি। টুইন টাওয়ারের ধ্বংস যেমন বিস্ময়কর, তোমার কাহিনীও তেমনি অবাক ও বিস্ময়ের। ধন্যবাদ আহমদ মুসা তোমাকে।’

‘স্বপ্নও বোধ হয় এত সুন্দর হয় না, সারা জীবন চাইলেও বাস্তবে পাওয়াটা এতটা অকল্পনীয় হয় না। সত্যিই আমরা ভাগ্যবান বাবা।’ বলল ব্রুনা। আবেগজড়িত তার ভারি কন্ঠ।

এসব কোন কথাই আহমদ মুসার কানে প্রবেশ করেনি। তার সমস্ত মনোযোগ সামনের রাস্তা ও গাড়ির রিয়ারভিউয়ের দিকে। সে মিউনিখ ছাড়ার পর থেকেই লক্ষ করছে একটা সেভেনসিটার মার্ক পাজেরো তার পেছনে পেছনে আসছে। এটা দেখতে পাওয়ার পর থেকে লক্ষ করছে গাড়িটার গতির কোন পরিবর্তন নেই।

আহমদ মুসা রিমোর্ট ভিউ মাইক্রো গগলস (RVMG) পরে নিয়েছিল। সে পরিস্কার দেখছে গাড়িতে ছয়জন আরোহী। গাড়ির গতি ও আরোহীদের চেহারা দেখে সন্দেহ হয়েছিল আহমদ মুসার। সন্দেহ সত্য হলে ওদের মতলব কি? ওরা অত দূর থেকে ফলো করছে, কেন? ওদের টার্গেট কি তাহলে এটা দেখা

যে, আমরা কোথায় যাচ্ছি, কোথায় উঠছি তা চিহ্নিত করা এবং হতে পারে তা পাহারায় রাখা। তার মানে আমাদের গন্তব্য পর্যন্ত ওরা আমাদের অনুসরণ করবে।

মনে মনে হাসল আহমদ মুসা। ভাবল, সামনে স্টুটগার্ট শহর বাইপাস নয়, শহরের ভিতর দিয়ে পার হতে হবে। এই শহরের মধ্যেই ওদের ধাঁধায় ফেলে পেছনে থেকে ওদের সরাতে হবে।

পেছনে সেনফ্রিডের লক্ষ করে বলল, 'মি. সেনফ্রিড মনে হচ্ছে, আমাদের পেছনে ওরা লেগেছে। অনেকক্ষণ ধরে একটা গাড়ি আমাদের ফলো করছে।'

'ওরা কি আমাদের সেই শত্রুরাই হবে?'

বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

উদ্বেগে ছেয়ে গেছে সেনফ্রিড ও ব্রুনার মুখ।

'আমি সে আশংকাই করছি।' বলল আহমদ মুসা।

'ওরা কি করতে চায়? আমাদের এখন কি করনীয়? কি ভাবছেন আপনি স্যার?' বলল ব্রুনা। ভীতি নেমে এসেছে তার চোখে-মুখে।

'জানি না ওদের পরিকল্পনা কি ধরনের। আমি ভাবছি, স্টুটগার্ট শহর অতিক্রমের সময় ওদের বোকা বানিয়ে ভিন্ন রাস্তা ধরে চলে যেতে পারব।' আহমদ মুসা বলল।

স্টুটগার্ট শহর সামনেই।

সামনে ছোট কয়েকটা পাহাড়। পরস্পর বিচ্ছিন্ন, একটু দূরে দূরে। এই পাহাড়গুলোর মাঝেই চার রাস্তার একটা গ্রন্থি আছে। এখান থেকে ডান দিকে একটা রাস্তা সোজা উত্তরে ব্যাভেরিয়ার উজবার্গের দিকে চলে গেছে। বাঁ দিকের রাস্তাটা দক্ষিণ দিকে কনস্ট্যান্স সীমান্ত শহর হয়ে সুইজারল্যান্ডে চলে গেছে। আর একটা সোজা রাস্তা পশ্চিমে এগিয়েছে। এ রাস্তা ধরে এগোলে সামনেই স্টুটগার্ট।

আহমদ মুসার দৃষ্টি সামনের পাহাড়গুলোর দিকেই নিবদ্ধ ছিল। দৃষ্টি ফিরিয়ে এনে গাড়ির রিয়ার ভিউয়ের উপর চোখ ফেলেই চমকে উঠল আহমদ মুসা। দেখল পেছনের সেই গাড়িটা দ্রুত এগিয়ে আসছে প্রায় ডবল স্পীডে।

হঠাৎ স্পীড ওরা বাড়াল কেন?

আহমদ মুসাও তার গাড়ির স্পীড বাড়িয়ে দিল।

পাহাড় এলাকায় প্রবেশ করেছে গাড়ি। কখনও পাহাড়ের পাশ দিয়ে, কখনও পাহাড়ের দূর দিয়ে এগোচ্ছে।

ছোট একটা পাহাড়ের সারির গিরিপথ দিয়ে আড়াআড়ি পার হয়ে পাহাড়ের গোড়ায় পৌঁছতেই রাস্তার চৌমাথা নজরে এল।

চৌমাথার তিন পাশের রাস্তাও নজরে এল আহমদ মুসার। চমকে উঠল আহমদ মুসা। তিন রাস্তাতেই তিনটা মাইক্রো চৌমাথার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। চৌমাথা থেকে মাইক্রোগুলোর দূরত্ব একশ গজের বেশি হবে না।

আহমদ মুসার বুঝতে বাকি রইল না, কেন পেছনের গাড়িটা এত দ্রুত এগিয়ে আসছে। পেছনের গাড়িটা সংকীর্ণ গিরিপথটা আটকে রাখার জন্যে এগিয়ে আসছে। এই চৌমাথায় ফাঁদে ফেলার সফল পরিকল্পনা তারা করেছে।

'ব্রুনা, মি. সেনফ্রিড, আমাদের ওরা ফাঁদে ফেলেছে। দেখুন তিনটা মাইক্রো তিন রাস্তায় আমাদের পথ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে। আর পেছনে ফেরার পথ বন্ধ করে পেছন থেকে আরেকটা গাড়ি এগিয়ে আসছে।' বলল আহমদ মুসা।

সেনফ্রিড ও ব্রুনা আগেই লক্ষ করেছিল দাঁড়ানো তিন মাইক্রোকে। চোখে-মুখে অন্ধকার নেমে এল ব্রুনা ও সেনফ্রিডের। উদ্বেগ-আতংকে বিস্ফোরিত হয়ে উঠেছে তাদের চোখ। শুকনো ঠোঁট তাদের কাঁপতে শুরু করেছে। কথা বলার শক্তি যেন তারা হারিয়ে ফেলেছে। ওদের হাতে পড়ার অর্থ কি তারা জানে। সেনফ্রিড মৃত্যুকে ভয় করে না। তার চিন্তা ব্রুনাকে নিয়ে। আর ব্রুনার মনের মধ্যে তোলপাড়, এদের হাতে পড়ার চেয়ে মৃত্যু ভালো।

আহমদ মুসা কথা শেষ করেই ব্যাগ থেকে লেজারগান বের করে পাশে রাখল। রিভলবার আগেই বের করে রেখেছিল।

আহমদ মুসা গাড়ির স্পীড কোন পরিবর্তন আনেনি। সে বোঝাতে চায় মাইক্রোগুলোকে সে সন্দেহ করেনি।

আহমদ মুসা শক্ত হাতে ধরেছে স্টিয়ারিং হুইল। পেছনে না তাকিয়েও বলল আহমদ মুসা, 'মি. সেনফ্রিড, ব্রুনা, সিটে শুয়ে পড়ুন।' আহমদ মুসার কন্ঠ শক্ত, তাতে নির্দেশের সুর।

আহমদ মুসা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে মাইক্রোগুলো তাকে বুঝে ওঠার আগেই তাকে ওদের ফাঁদকে ভাঙতে হবে।

আহমদ মুসা তার গাড়ির ডানে ও বামে ঘোরার দুই ইন্ডিকেটরই জ্বালিয়ে দিয়েছে, যাতে ডান-বাম দুই দিকের মাইক্রোই এক সাথে বুঝে যে, আহমদ মুসার গাড়ি তার দিকেই টার্ন নিচ্ছে। এর ফলে ওরা সামনে এগোবার চেষ্টা না করে আক্রমণের প্রস্তুতি নেবে।

এভাবে আহমদ মুসা চৌরাস্তা পর্যন্ত পৌঁছে গাড়ির স্পীড বাড়িয়ে দিয়ে ঝড়ের বেগে সামনে এগিয়ে চলল।

পশ্চিমের মাইক্রোটি চৌরাস্তার মোড় থেকে একশ গজের মত দূরে দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ির স্পীড বাড়িয়ে মোড় থেকে সামনে এগোবার সংগে সংগেই মাইক্রোগুলো আহমদ মুসার কৌশল ধরে ফেলে। ডান-বামের মাইক্রো দু'টো থেকে গুলি বর্ষণ শুরু হয়েছে আহমদ মুসার গাড়ির লক্ষ্যে এবং সেই সাথে আহমদ মুসার গাড়ির দিকে চলতেও শুরু করেছে। আর সামনের মাইক্রো স্থির দাঁড়িয়ে থেকেই গুলি বর্ষণ শুরু করেছে।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে আহমদ মুসার গাড়ির উইন্ড শীল্ড, জানালার কাচ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

এখানে রিভলবার দিয়ে আহমদ মুসার করার কিছু নেই। আর তার লেজারগান ৩০ গজের বেশি দূরে তেমন কার্যকরি নয়। স্টিয়ারিং ধরা ডান হাতে 'লেজারগান' রেখে দূরত্ব কমার অপেক্ষা করছে আহমদ মুসা।

বেপরোয়া গতিকে সবাই ভয় করে। আহমদ মুসার সামনের মাইক্রোর নাক বরাবর আহমদ মুসার গাড়ির পাগলের মত গতি দেখে মাইক্রোর সবাই তাড়াতাড়ি নেমে পড়ে এক পাশে নিরাপদে দাঁড়িয়ে একনাগাড়ে আহমদ মুসার গাড়ি লক্ষে গুলি করছিল।

মাইক্রোর আরোহীরা নেমেছিল রাস্তার দক্ষিণ পাশে মাইক্রোর আড়ালে। জায়গাটা রাস্তার দক্ষিণ প্রান্তেরও বাইরে।

আহমদ মুসা রাস্তা ও মাইক্রোর অবস্থানটা একবার দেখে নিয়ে মাথা স্টিয়ারিং হুইলের লেভেল থেকেও নিচে নামিয়ে ঝড়ের বেগে গাড়ি চালাচ্ছিল।

তার চোখ ডাইরেকশন ইন্ডিকেটরের দিকে। ইন্ডিকেটরের কাঁটারে সে অনড় রেখেছিল।

এই ইন্ডিকেটরই এখন তার জন্যে ফ্রন্ট ভিউ-এর কাজ করছে। আহমদ মুসার হিসাব, গাড়ির এই ডাইরেকশন ঠিক থাকলে তার গাড়ির সামনের গার্ডারের বাম প্রান্ত তীব্র গতিতে আঘাত করবে সামনের মাইক্রোর সামনের দিকের গার্ডারের বাম প্রান্তকে ঘন্টায় ১৫০ কিলোমিটার গতিতে। তার ফলে তার গাড়ি চাপা ধরনের একটা প্রবল ঝাঁকানি খেলেও আহত গার্ডার নিয়ে সামনে এগোবে। কিন্তু গোটা মাইক্রোটা এক পাক খেয়ে উল্টে গিয়ে পাশের লোকদের উপর পড়বে।

ঝড়ের বেগে গাড়ি চলছে। স্পিডোমিটারের কাঁটা ১৬০ কি. মি. অতিক্রম করে থর থর করে কাঁপছে।

আহমদ মুসার মনোযোগ ছিল সামনে থেকে ছুটে আসা গুলির ডাইরেকশনের দিকেও। গাড়িতে গুলির আঘাতের শব্দ শুনে নিরূপণ করছিল আহমদ মুসা শত্রুপক্ষের অবস্থানের পরিবর্তন।

আহমদ মুসা শুনছে, সামনের গুলি ক্রমশই গাড়ির বাম পাশের দিকে সরছে। প্রথমে গাড়ির সামনে, তারপর গাড়ির সামনের বাম কোন অঞ্চল, পরে গাড়ির বাম জানালার সামনের দিকে সরে এল গুলির আঘাত।

সামনের গুলির আঘাত জানালার পেছন দিকে সরে আসতেই আহমদ মুসা বুঝল চরম মুহূর্ত উপস্থিত।

আহমদ মুসা 'আল্লাহু খাইরুল হাফেজীন' বলে স্পিড বাড়িয়ে মাথা তুলে শক্ত হাতে স্টিয়ারিং হুইল চেপে ধরল।

আহমদ মুসার গাড়ির গার্ডারের বাম প্রান্ত প্রচণ্ড ছোবল মারল মাইক্রোর মাথার বাম পাশকে।

প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেল আহমদ মুসার গাড়ি। কিন্তু প্রচণ্ড ধাক্কায় মাইক্রো সরে যাওয়ায় ধাক্কার প্রবল 'পুশ'টা শতভাগ জেঁকে বসল মাইক্রোর উপর এবং তার ফলে খেলনার মত পাক খেয়ে উল্টে গেল গাড়ি।

আপনাতেই দু’চোখ বুজে গিয়েছিল। নিজের সব কাজ শেষ করে পরিণতির ভার সবটাই তুলে দিয়েছিল আল্লাহর হাতে।

আল্লাহ সাহায্য করেছেন। আহমদ মুসার গাড়ি থেমে যায়নি, বেঁকে যায়নি বা উল্টে যায়নি।

প্রচণ্ড ধাক্কায় আহমদ মুসা একবার সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে, তারপর পেছন দিকে ছিটকে সেঁটে গিয়েছিল সিটের সাথে। কিন্তু আহমদ মুসার দু’হাত কিন্তু গাড়ির স্টিয়ারিং হুইল ছাড়েনি, নড়াচড়া করতে দেয়নি স্টিয়ারিং হুইলকে।

তার দেহ স্থির হতেই আহমদ মুসা গিয়ার চেঞ্জ ও স্পিড কমিয়ে এনে গাড়িকে একিউট টার্ন করাল।

এবার আহমদ মুসার সামনে এল উল্টে যাওয়া মাইক্রো, তার লোকরা ও এদিকে ছুটে আসা অন্য দুই মাইক্রো।

উল্টে যাওয়া মাইক্রোর লোকেরা নিজেদের সামলে নিয়ে এদিকে ঘুরে দাঁড়াচ্ছিল। আহমদ মুসা নতুন করে ওদের গুলির মুখে পড়ার আগেই ওদের নিষ্ক্রিয় করে দিতে চাইল।

ডান হাতের লেজারগানটাকে আহমদ মুসা মাটির সমান্তরালে ওদের উপর দিকে ঘুরিয়ে নিল।

সংগে সংগেই ওদের ৬ জনের হাঁটুর নিচের অংশ খসে পড়ল। আর্তনাদ করে ওরা সবাই মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

ছুটে আসা দুই মাইক্রোও এসে পড়েছিল একটার পেছনে আরেকটা। ওরা উল্টে যাওয়া ও আহত লোকগুলোর বরাবর এসে রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়ল। সম্ভবত মাইক্রোর লোকরা তাদের ছয়জন সাথীর অবস্থা দেখতে পেয়েছে।

আহমদ মুসা তার লেজারগান সামনে এসে দাঁড়ানো দুই মাইক্রোর সামনেরটার দিকে ঘুরিয়ে নিল। লেজারগান থেকে সামনের মাইক্রোর মাথা লক্ষে একবার হরিজন্টালি, একবার ভার্টিকালি ফায়ার করল। মাইক্রোর মাথা চারটা আলাদা খণ্ডে ভাগ হয়ে গেল।

মাইক্রোর ড্রাইভিং সিট ও তার পাশের সিটের লোকের কি অবস্থা হলো জানা গেল না। পেছনের সিটের লোকরা চিৎকার করে গুলি করতে করতে নেমে পড়ল গাড়ি থেকে।

আহমদ মুসা গুলির জবাব না দিয়ে গাড়ি স্টার্ট দিয়ে ওদের দিকে চলতে শুরু করল। গুলি করতে করতেই ওরা ছুটে পালাল গাড়ির আড়ালে, গাড়ির পেছনে।

আহমদ মুসা এবার সামনের মাইক্রোটির পেছনের দক্ষিণ পাশের কোনার উপর থেকে নিচ পর্যন্ত খাড়াভাবে লেজারগানের ফায়ার করল।

খসে পড়ল গাড়ি থেকে কোনাটা।

মাইক্রোর পেছনে দাঁড়ানো আতংকিত লোকগুলো ছুটে গিয়ে পেছনের দ্বিতীয় মাইক্রোতে উঠল। ওরা ও দ্বিতীয় মাইক্রো আহমদ মুসার লেজারগানের রেঞ্জের মধ্যে রয়েছে। আহমদ মুসা ইচ্ছা করলে পালানোরত লোকগুলো ও পেছনের দ্বিতীয় মাইক্রোকে তার লেজারগানের শিকার বানাতে পারতো। কিন্তু আহমদ মুসা মানুষ মারতে চায় না। ওদের ভয় দেখিয়ে পালাতে বাধ্য করে নিজেদের নিরাপদ করতে চায়।

পালানো পেছনের লোকরা দ্বিতীয় মাইক্রোতে গিয়ে ওঠার সংগে সংগেই মাইক্রোটি দ্রুত পেছনে হটতে শুরু করল।

আহমদ মুসা সিটে সোজা হয়ে বসে পেছনে ব্রুনাদের দিকে চাইল। দেখল, তারা সিট আঁকড়ে সিটের উপর পড়ে আছে। ভাঙা কাচের অজস্র টুকরায় তাদের গা ভর্তি। গাড়ির গায়ে লেগে বা অন্য কোনভাবে সিটকে পড়া কিছু বুলেটও আহমদ মুসা গাড়ির ফ্লোরে এদিক-ওদিক পড়ে থাকতে দেখল। সিটে মুখ গুঁজে পড়ে আছে ওরা।

'ব্রুনা, মি. সেনফ্রিড, আপনারা ঠিক আছেন তো? এবার উঠুন। আমরা আপাতত নিরাপদ।' বলল আহমদ মুসা ওদের লক্ষ করে।

ব্রুনা, সেনফ্রিড উঠল।

তাদের গা থেকে ঝরে পড়ল কাচের টুকরাগুলো।

ভীত, বিপর্যস্ত তাদের চেহারা। তারা তাকাল চারদিকে। দেখল উল্টানো মাইক্রো, একটা গায়েব হওয়া আহতদেরও দেখতে পেল। দেখল মাথা কাটা মাইক্রো, একটা মাইক্রোর ব্যাক ড্রাইভ করে পালানোর দৃশ্যও দেখল।

তাদের চোখ ঘুরে এল আহমদ মুসার উপর।

আহমদ মুসার দৃষ্টি তখন পাজেরোর দিকে, যে গাড়িটা আহমদ মুসাদের পেছনে ছুটে আসছিল।

উপত্যকায় ঢুকেও গাড়িটা বেপরোয়া গতিতে ছুটে আসছিল একাধিক স্টেনগান থেকে গুলি বৃষ্টির একটা দেয়াল সৃষ্টি করে। কিন্তু তাদের গুলি বৃষ্টির একটা অংশকে আড়াল করছিল পেছনে অগ্রসরমান মাইক্রোটি, অন্য আরেক অংশকে ব্লক করছিল রাস্তার পাশে উল্টে থাকা মাইক্রো। এই দুই মাইক্রোর ফাঁক গলিয়ে কিছু গুলি আসছে আহমদ মুসার গাড়ির দিকে।

আহমদ মুসা ব্রুনা ও সেনফ্রিডকে মাথা নিচু করে সাবধান হতে নির্দেশ দিয়ে গাড়িটাকে উল্টে থাকা মাইক্রোর দিকে একটু সরিয়ে নিয়ে এল। তার গাড়ির পেছনটা মাইক্রোর আড়ালে চলে গেল। সামনেটা গুলির মুখে পড়লেও গোটা পাজেরো আহমদ মুসার নজরে এল।

ছুটে আসছে পাজেরো বেপরোয়া গতিতেই। তাদের সামনের মাইক্রো এবং তাদের কিছু সাথীর পরিণতি তারা জানতে পারেনি। পাজেরোটাকে বেপরোয়া গতিতে আসতে দেখে ব্যাক ড্রাইভ করা মাইক্রোটাও থেমে গিয়েছিল।

পাজেরোটার মতলব বুঝল আহমদ মুসা। আহমদ মুসার দাঁড়ানো গাড়িকে তারা সরাসরি এসে আঘাত করতে চায়। আহমদ মুসার জাপানি টায়োটার চেয়ে ওদের জার্মান মার্ক পাজেরো অনেক বেশি শক্ত। ও পাজেরোর সামনের কাঠামো ও গার্ডার টয়োটার চেয়ে কয়েক গুণ বেশি প্রেশার হজম করতে পারে।

ওদের পাজেরোটি পেছনের মাইক্রো অতিক্রম করে চলে এসেছে। গুলিও বেড়েছে। পাজেরোর দু'পাশের জানালা দিয়ে গুলি আসছে। আবার ভাঙা উইন্ডস্ক্রীনের পথেও গুলি আসছে। গুলি করার সহজ সুবিধার জন্যে উইন্ডস্ক্রীন ওরা ভেঙে ফেলেছে।

আহমদ মুসার গাড়ির দিকে গুলির তিনটা স্রোত আসছে। ডানে-বাঁয়ে সমান্তরালে দু'টি স্রোত এবং আরেকটি স্রোত আসছে গাড়ির জানালার বেজ বরাবর উপর দিয়ে। এ তিনের মাঝখানে নো-ম্যানস ল্যান্ডের মত একটা নো-বুলেট জোন তৈরি হয়েছে। আহমদ মুসা সুযোগ গ্রহণ করল।

আহমদ মুসা গাড়ির সিট থেকে মাথাটা একটু তুলে নো-বুলেট জোনের ঠিক মাঝামাঝি স্থান দেখে লেজারগান দিয়ে শর্ট রেঞ্জের ফায়ার করে একটা হোল সৃষ্টি করল। সে হোলে লেজারগানের ব্যারেল সেট করে লং রেঞ্জের পূর্ণাংগ ফায়ার করল। তিন সেকেন্ড লেংথের একটা ফায়ার।

আহমদ মুসা অনুমান করল লেসার ফায়ারটি পাজেরোর গার্ডারের মধ্যভাগ দিয়ে ঢুকে ইঞ্জিনের মধ্যভাগ বরাবর গোটা চেসিস উড়িয়ে দেবে। তারপর প্রচণ্ড গতির কারণে বড় ধরনের এ্যাকসিডেন্ট ঘটাবে গাড়িটা।

তাই হলো। মুহুর্তে গাড়িটা দুই ভাগে ভেঙে পড়ে প্রচণ্ড এক ওলট-পালট ঘটে গেল। গুলিও বন্ধ হয়ে গেল।

আহমদ মুসা উঠে বসল। দেখল গাড়িটার দৃশ্য। বুঝতে পারল না গাড়ির লোকগুলো কতটা আহত কিংবা বেঁচে আছে কিনা।

ব্রুনা ও তার পিতা সেনফ্রিডও উঠে বসেছে গাড়ির সিটে। তাদেরও চোখে পড়ল দু'ভাগ হয়ে যাওয়া উল্টে-পাল্টে পড়ে থাকা পাজেরোর দৃশ্য। তাদের চোখে-মুখে অপার বিস্ময়! তাদের মনে হচ্ছে, তারা যেন কোন স্বপ্নের দৃশ্য দেখছে! অথবা যেন ভয়াল-সংঘাতের কোন সিনেমার দৃশ্য। যার নায়ক তাদের সামনে বসে থাকা নিতান্ত এক ভদ্রলোক আহমদ মুসা। ইস্পাতের মত এক ঋজু শরীর ছাড়া সাধারণের চাইতে কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্য তার নেই। কিন্তু তবু কী অসাধারণ তিনি! কী অসাধারণ তার আত্মরক্ষা ও প্রতিপক্ষকে মোকাবিলার কৌশল! নিরাশার বিরান ভূমিতে আশার মহীরুহ তৈরি করতে পারেন তিনি।

তাদের দৃষ্টি ঘুরে এসে নিবদ্ধ হলো আহমদ মুসার উপর। আহমদ মুসাও তাকিয়েছে তাদের দিকে।

আহমদ মুসা তাদের দিকে তাকিয়েই বলে উঠেছে, 'চলুন, আমাদের নেমে পড়তে হবে। এ গাড়ি নিয়ে চলা যাবে না।'

শান্ত কন্ঠ আহমদ মুসার।

‘ধন্যবাদ মি. আহমদ মুসা।’ বলল সেনফ্রিড।

‘ধন্যবাদ কি জন্য?’ গাড়ি থেকে নামতে নামতে আহমদ মুসা বলল।

‘স্বপ্নের মত এক ঘটনা বাস্তবে নিয়ে আসার জন্যে।’ বলল সেনফ্রিড।

‘এজন্যে আমি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি, আপনারাও ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিন।’ আহমদ মুসা বলল।

‘যখন দেখলাম আমরা বেঁচে আছি, তখন ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়েছি। কিন্তু আপনার প্রাপ্য আপনার পাওয়া দরকার।’ বলল সেনফ্রিড।

‘আবার আমি আপনার কাছে ‘আপনি’ হয়ে গেলাম?’ আহমদ মুসা বলল।

‘চেষ্টা করেছি তুমি বলতে। কিন্তু আর পারছি না। আপনি বয়সে আমার ছেলের বয়সের হলেও সম্মান ও মর্যাদায় আপনি অনেক বড়। তুমি বলা মানায় না।’

কথা শেষ করেই সেনফ্রিড বলে উঠল, ‘মি. আহমদ মুসা, ওই মাইক্রো কিন্তু পালিয়ে গেল।’

আহমদ মুসাও তাকাল পলায়নপর মাইক্রোর দিকে। দেখল, মাইক্রোটি চৌমাথা পর্যন্ত গিয়ে উত্তরের রাস্তা ধরে ছুটছে।

‘যাক। পালাক ওরা।’ আহমদ মুসা বলল।

‘কেন পালাতে দিলেন?’ বলল ব্রুনা। ভয় ও বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে ওঠার পর এই প্রথম কথা বলল ব্রুনা।

‘ওরা আক্রমণ করতে আসেনি। অস্ত্র সংবরণ করে পালিয়েছে। এ কারণেই ওদের যেতে দিলাম। আমাদের টার্গেট এখন আত্মরক্ষা। আত্মরক্ষার বাইরে কাউকে আক্রমণ করা নয়।’

আহমদ মুসা বলল।

‘পলায়নটা ওদের কৌশল। ওরা তো আক্রমণে আসবেই। কথায় আছে স্যার, শত্রুর শেষ রাখতে নেই।’ বলল ব্রুনা।

'কিন্তু ব্রুনা, আমাদের ধর্ম ইসলাম শত্রুদেরকেও কতকগুলো অধিকার দিয়েছে সেই সপ্তম শতকে। সে অধিকারগুলোর একটি হলো, অস্ত্রত্যাগকারী, অস্ত্র সন্বরণকারী শত্রুকে আঘাত না করা।' আহমদ মুসা বলল।

'শত্রুকে অধিকার? আর কি অধিকার দিয়েছে?' বলল ব্রুনা। বিস্ময় তার চোখে-মুখে!

'সে অনেক কথা ব্রুনা। এতটুকু জেনে রাখো, বিচার ও সংগত কারণ ছাড়া শত্রু ও তার সম্পদের ক্ষতি করাকে ইসলাম অপরাধ হিসাবে গণ্য করে। শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সকল আহত ও অসুস্থের সমান চিকিৎসার নির্দেশ দেয় এবং যুদ্ধকালীন অবস্থাতেও শত্রুর ঋণ ও আমানতকে বাতিল বা বাজেয়াপ্ত করে না।' আহমদ মুসা বলল।

কথা শেষ করেই আহমদ মুসা পকেট থেকে সেল ফোন বের করে একটা টেলিফোন করল। সংযোগ পেয়েই বলল, 'স্যার, আমি তাহিতি থেকে আসা আহমদ...।'

'আর বলতে হবে না। গলা ঠিক চিনেছি। সব খবর ভালো নিশ্চয় নয়?' আহমদ মুসাকে শেষ করতে না দিয়ে ও প্রান্ত থেকে বলে উঠল।

'ঠিক স্যার। বড় একটা ঘটনা ঘটেছে। আমার গাড়ি তিন মাইক্রো ও একটা বড় পাজেরো টাইপ জীপ ঘেরাও করেছিল। এ নিয়ে ঘটনা ঘটেছে। কয়েকজন সাংঘাতিক আহত। আপনি...।'

'হ্যাঁ, আমি ওদের চিকিৎসা ও কাস্টডিতে নেয়ার ব্যবস্থা করছি। আপনি সুস্থ তো? আপনার সাথে কি ব্রুনার আছে?' এবারও আহমদ মুসাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে বলল ওপার থেকে।

'ধন্যবাদ স্যার। আমি সুস্থ। ব্রুনা ও তার পিতা আমার সাথে আছেন।' আহমদ মুসা বলল।

'ওয়েলকাম। ওদের অবশিষ্টরা কি পালিয়েছে?' ওপার থেকে বলল।

'একটা মাইক্রো নিয়ে অবশিষ্টরা পালিয়েছে।' আহমদ মুসা বলল।

'আপনি ভাগ্যবান মি. আহমদ। শত্রুর নাগাল আপনি পেয়ে গেছেন। আমি নিশ্চিত। আপনি সফল হবেন।' ওপার থেকে বলল।

‘ধন্যবাদ স্যার।’ আহমদ মুসা বলল।

‘গড ব্লেস ইউ। ওকে, বাই।’ বলে ওপার থেকে কল ক্লোজ করে দেয়া হলো।

আহমদ মুসা মোবাইলের কল অফ করতেই ব্রুনার পিতা সেনফ্রিড বলল, ‘কার সাথে কথা বললেন, মি. আহমদ মুসা?’

‘জার্মানির পুলিশ প্রধান বরডেন ব্লিস-এর সাথে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘আপনি তাঁকে চেনেন?’ জিজ্ঞাসা সেনফ্রিডের।

‘চিনি না, জানি। তিনিও আমাকে জানেন।’ আহমদ মুসা বলল।

‘কিভাবে? সবে তো আপনি জার্মানিতে প্রবেশ করলেন?’ বলল সেনফ্রিড। তার চোখে-মুখে বিস্ময়!

‘তাহিতির গভর্নর ফ্রান্সিস বুরবনের সাথে পারিবারিকভাবে সম্পর্কিত তিনি। ফ্রান্সিস বুরবনই আমার ব্যাপারে তাঁকে ব্রিফ করেছেন। আর আপনাদের ‘রাইন ল্যান্ড’ স্টেটের গোয়েন্দাপ্রধান ‘এডমন্ড এড্রিস’ আমাকে জানেন। আমি এখানে আসার আগে তাহিতির স্বরাষ্ট্র সচিব ও পুলিশপ্রধান মি. দ্যাগল আমার ব্যাপারে তাকে সব বলেছেন। আমি অস্ট্রিয়ায় এসে তাঁর সাথে কথা বলেছি।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ধন্যবাদ মি. আহমদ মুসা, আপনি জার্মানি আসার আগে অনেক কাজ সেরে এসেছেন। কিন্তু এই ঘটনার কথা আমরা পুলিশকে না জানালেও তো পারতাম।’ বলল সেনফ্রিড।

‘দেশের আইন-শৃঙ্খলার সাথে সংশ্লিষ্ট এটা একটা বড় ঘটনা। পুলিশ তার তদন্তে আমাদের সংশ্লিষ্টতা খুঁজে পাবেই। সুতরাং আমরা আগে না জানালে আমাদের কাজ অপরাধমূলক বিবেচিত হবে। নিজেদের তখন নির্দোষ প্রমাণ করতে হবে। আগেই বিষয়টা পুলিশ কর্তৃপক্ষকে জানানোর ফলে এই ঝামেলায় আমাদের পড়তে হবে না। আর আমি এখানে যে কাজ নিয়ে এসেছি সে সম্পর্কে পুলিশ কর্তৃপক্ষকে অবহিত রাখতে চাই। পুলিশপ্রধান বরডেন ব্লিস আমাকে বলেছেন, ‘পুলিশের কাজটাই আমি করছি। সুতরাং আমার কাজের গোপনীয়তা কিছু নেই।’ আহমদ মুসা বলল।

‘গড ব্লেস ইউ মি. আহমদ মুসা। আপনি আপনার কাজকে মানে আমাদের কাজকে অনেক সহজ করে দিয়েছেন। আমাদের পরিবার রাহুমুক্ত হবার আশা আরও প্রবল হলো। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন!’ বলল সেনফ্রিড, ব্রুনার পিতা।

‘পুলিশ আসার আগেই আমরা এখান থেকে চলে যেতে চাই। আসুন আমরা উল্টে যাওয়া মাইক্রোটাকে সোজা করে চালু করতে পারি কিনা দেখি।’

বলে আহমদ মুসা গিয়ে মাইক্রোটাকে ধরল।

সেনফ্রিড ও ব্রুনাও দ্রুত গিয়ে মাইক্রো ধরল।

মাইক্রোটি সোজা করে আহমদ মুসা ড্রাইভিং সিটে বসে পরীক্ষা করল সব ঠিক আছে।

স্টার্ট নিল মাইক্রোটি।

সেনফ্রিড ও ব্রুনা মাইক্রোতে উঠল।

চলতে শুরু করল মাইক্রোটি পশ্চিমের স্টুটগার্ট শহরের দিকে।

স্টুটগার্ট থেকে বেরিয়ে আহমদ মুসার সেই মাইক্রো সোজা উত্তরে নেকার নদীর তীর বরাবর হাইওয়ে ধরে হেলব্রোন শহরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। স্টুটগার্ট থেকে বেরুবার আগেই আহমদ মুসা জিজ্ঞাসা করেছিল, ‘আমরা কি হেলব্রোন, না কারিসু’র পথে যাব।’

উত্তর দিয়েছিল ব্রুনা। বলেছিল, ‘আমরা যদি কারিসু দিয়ে যাই, তাহলে কিছু পাহাড়ী এলাকা পেরিয়ে কারিসু পার হলেই আমরা রাইনের তীরে গিয়ে পৌঁছব। তারপর রাইন তীরের হাইওয়ে ধরে চোখ বন্ধ করে এগোলে আমরা ব্রুমসারবার্গে পৌঁছে যাব। আর যদি হেলব্রোন হয়ে যান স্যার, তাহলে খরস্রোতা, উচ্ছলা নেকার নদীর ছোঁয়া পাবেন, সেই সাথে পাবেন পর্বতভূমির পাদদেশের সবুজ, মনোহর ঘন বনাঞ্চল, তার ফাঁকে ফাঁকে দেখবেন জার্মানির শান্ত সুন্দর আদি গ্রামগুলো। আরো দেখবেন প্রাচীন জার্মানির একটা বিরান এলাকা। সেখানে

প্রাচীন ধ্বংসাবশেষও দেখতে পাবেন। অতীতের স্মৃতিবাহী কিছু পরিবার সেখানে এখনো আছে, যারা জার্মানির সৌন্দর্য ও গৌরব। এখন স্যার, আপনিই পথ বেছে নিন।'

'ব্রুনা, তোমার পথের বর্ণনাই বলে দিয়েছে কোন্ পথ আমি বেছে নেব। আমি হেলব্রোনের পথেই যাচ্ছি।' আহমদ মুসা বলেছিল।

গাড়ি কখনো সবুজ ঘন বনাঞ্চল, কখনো ছবির মত সুন্দর গ্রামের স্নিগ্ধ পরশ নিয়ে এগিয়ে চলছিল সামনে। ব্রুনার বর্ণনার চেয়ে হাজার গুণ সুন্দর এসব দৃশ্য।

প্রাচীন জার্মানির বিরান এলাকায় প্রবেশ করেছে আহমদ মুসার মাইক্রো। হাইওয়েটা ফিরে এসেছে নিকার নদীর তীর বরাবর।

অনেকক্ষণ ধরে আহমদ মুসার কান উৎকর্ণ হয়ে উঠেছিল। দূর থেকে একটা শব্দ ভেসে আসছে। শব্দ আরও স্পষ্ট হলে বুঝতে পারল, শব্দটি হেলিকপ্টারের। কিছুক্ষণ ধরে শব্দের ডাইরেকশন অনুসরণ করে নিশ্চিত বুঝল, হেলিকপ্টারটি তাদের দিকেই আসছে।

আরও কিছু সময় পার হয়ে গেল।

গাড়ি তখন চলছিল এক ফালি ফাঁকা এলাকার উপর দিয়ে।

আহমদ মুসা গাড়ি থেকে মাথা বের করে উঁকি দিয়ে দেখল, হেলিকপ্টার অনেকখানি নিচে নেমে এসেছে।

হেলিকপ্টারটি তাদের গাড়ির নাক বরাবর এগিয়ে আসছে। হেলিকপ্টারটি যেন তাদেরকেই টার্গেট করেছে।

হেলিকপ্টারের পরিচয় সম্পর্কে জানার জন্যে গভীরভাবে চাইতে গিয়ে নিচের দিকে উদ্যত মেশিনগানের নল দেখতে পেল। দূরবীনের চোখও নজরে পড়ল আহমদ মুসার।

চমকে উঠল আহমদ মুসা! তাহলে এটা একটা শত্রুপক্ষের হেলিকপ্টার? কিন্তু ওরা আহমদ মুসাদের সন্ধান পেল কি করে? উত্তরও সংগে সংগে পেয়ে গেল। আহমদ মুসারা তো ওদের মাইক্রো ব্যবহার করছে! এই মাইক্রোতে নিশ্চয়

মাইক্রোর অবস্থান ও মাইক্রোর কথাবার্তা রিলে করার গোয়েন্দা ট্রান্সমিটার রয়েছে।

বিষয়টা আহমদ মুসার কাছে পরিস্কার হওয়ার সাথে সাথে সে গাড়ির স্পীড আকস্মিকভাবে বাড়িয়ে দিল। তার লক্ষ সামনের এক ফালি খালি জায়গা পার হয়েই ঘন গাছপালার মধ্যে প্রবেশ করা। সামনেই রাস্তার দু'পাশে ঘন গাছের সারি, মাঝখান দিয়ে রাস্তা। সে রাস্তায় পৌঁছানোই আহমদ মুসার টার্গেট।

হেলিকপ্টারটিও সম্ভবত এটা বুঝতে পেরেছে। হেলিকপ্টারের দরজা দিয়ে দেখতে পাওয়া মেশিনগানের ব্যারেল নড়ে উঠল। নেমে এল এক পশলা গুলি।

আহমদ মুসার মধ্যে চাঞ্চল্য লক্ষ করেছিল ব্রুনা। গাড়ির স্পীড হঠাৎ সপ্তমে উঠায় উদ্বিগ্ন ব্রুনা প্রশ্ন করল, 'কিছু কি ঘটেছে স্যার?'

'হ্যাঁ, মাথার উপরে একটা হেলিকপ্টার আমাদের ফলো করছে। মনে হচ্ছে এটা ওদের নতুন আক্রমণ।' আহমদ মুসা বলল।

আহমদ মুসার কথা শেষ হতেই উপর থেকে ব্রাশ ফায়ারের শব্দ হলো। কয়েকটি গুলি মাইক্রোর পেছনে আঘাত করল।

দু'পাশের গাছ মোটামুটি আড়াল সৃষ্টির জন্য ওদের টার্গেট ষোল আনা লক্ষ ভেদ হয়নি।

আহমদ মুসা ব্রুনাদেরকে গাড়ির সিটের নিচে শুয়ে পড়তে বলে গাড়ির জিগজ্যাগ গতি আরও বাড়িয়ে দিল।

'মি. আহমদ মুসা, আমরা তো হেলিক্টারের সাথে পারবো না। ওরা সহজেই আমাদের টার্গেট করতে পারবে। উপর থেকে ওরা বোমাও ছুঁড়তে পারে।' বলল সেনফ্রিড। উদ্বেগে তার কন্ঠ কাঁপছে।

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'বিপদের সময় বেশি ভাবতে নেই। সব সময় বিপদের সাথে পরিত্রাণের একটা রাস্তা আল্লাহ রাখেন।'

গাড়ির তীব্র গতির সাথে আহমদ মুসা নদীর একটা খাড়া ও উন্মুক্ত ধরনের স্থান খুঁজছিল। এই সাথে আহমদ মুসা উপরের হেলিকপ্টারের গতি পথও মনিটর করছিল। প্রথমবার গুলি বর্ষণের পর তারা আর গুলিও করেনি। তারা

নিশ্চয় একটা উপযুক্ত স্থানের অপেক্ষা করছে যেখানে তারা সহজেই মাইক্রোটাকে গুঁড়িয়ে দিতে পারবে। তাছাড়া তাদের ভয়ও আছে গুলাগুলির ব্যাপারটা পুলিশের কানে গেলে তাদের বিপদ হবে। যা করার দ্রুত করে তাদের সরে পড়তে হবে।

যে ধরনের জায়গা খুঁজছিল আহমদ মুসা তা পেয়ে গেল। জায়গাটায় ছোট ছোট আগাছা ছাড়া বড় ধরনের গাছ নেই। নদী পাড়ের রেলিং সেখানে নেই। সম্ভবত ভেংগে যাওয়ার কারণে পুনঃনির্মাণের জন্যে খুলে ফেলা হয়েছে।

আহমদ মুসা জায়গাটা পার হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ ব্রেক করে গাড়ি থামাল আহমদ মুসা। দ্রুত কন্ঠে বলল, 'ব্রুনা, মি. সেনফ্রিড, আপনারা তাড়াতাড়ি নেমে পেছনের ঝোপটায় লুকিয়ে পড়ুন। প্লিজ তাড়াতাড়ি করুন।'

ব্রুনা ও সেনফ্রিড গড়িয়েই গাড়ির দরজা পর্যন্ত গিয়ে গাড়ি থেকে নেমে ছুটল ঝোপের দিকে। ব্রুনা একবার জিজ্ঞাসা করতে চাইল, স্যার আপনি আসবেন না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে সাহস পেল না!...

ব্রুনারা নেমে পড়তেই আহমদ মুসা গাড়ি ব্যাক ড্রাইভ করে সেই জায়গায় ফিরে এল। গাড়িটা নদীর পাড়ের প্রান্ত পর্যন্ত নিয়ে গাড়ি দাঁড় করিয়ে গাড়ি থেকে নেমে পড়ল আহমদ মুসা। তারপর পেছন থেকে টেনে গাড়িটা নদীতে ফেলে দিয়ে একটু অপেক্ষা করে দেখল গাড়িটা পুরোপুরি নদীতে পড়ল কিনা।

নিশ্চিত হয়ে আহমদ মুসা ছুটে এল সেই ঝোপে।

সেখানে পৌঁছেই আহমদ মুসা বলল, 'মি. সেনফ্রিড, আমাদের আরও পেছনে সরে যেতে হবে। চলুন, পেছনের ঐ টিলায়। টিলায় যথেষ্ট ঝোপ-জংগল আছে আর ওটা বেশ উঁচুও। ওদের গতিবিধি ভালোভাবে দেখা যাবে।'

ছুটল ওরা কিছু দূরের টিলাটার দিকে।

ওদিকে হেলিকপ্টারটি অনেকখানি সামনে এগিয়ে গিয়েছিল। তারপর তারা খেয়াল করে দেখল নিচে রাস্তার উপর সেই গাড়িটা নেই। দ্রুত তারা ফিরে আসে। কিন্তু গাড়িটার দেখা তারা পায় না।

তাড়াতাড়ি হেলিকপ্টারটা হাইওয়ের সেখানকার ছোট সরু বাইলেনটাও চেক করে আসে। কিন্তু গাড়ির দেখা তারা পায় না।

পাগলের মত হেলিকপ্টার চারদিকে ঘুরতে থাকে। এক সময় হেলিকপ্টারটা নদীর উপর স্থির হয়ে দাঁড়ায়। তারপর হেলিকপ্টারটা ধীরে ধীরে ল্যান্ড করল নদীর পাড়ে।

'ওরা এখন মনে করছে গাড়ি এ্যাকসিডেন্ট করে আমরা নদীতে পড়ে গেছি। ওরা এখন নিশ্চিত হবার জন্যে নদীতে নেমে গাড়ি পরীক্ষা করবে এবং লাশগুলোকে হাত করতে চাইবে। আমাদের সরে পড়ার এটাই উপযুক্ত সময়।' বলল আহমদ মুসা।

বিস্ময়-বিমুগ্ধ ব্রুনা বলল, 'আপনি তাহলে এই উদ্দেশ্যেই মাইক্রোটিকে নদীতে ফেলে দিয়েছেন! ধন্যবাদ স্যার!'

আহমদ মুসা ব্রুনার কথার দিকে কর্ণপাত না করে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আসুন, আমরা যাত্রা শুরু করি।'

টিলা থেকে তারা নেমে এল।

'জংগলের মধ্যে দিয়েই আমরা প্রথমে পূর্ব দিকে যাব, তারপর আমরা নেকার নদীর সমান্তরালে উত্তর দিকে চলব।'

বলে চলতে শুরু করল আহমদ মুসা।

'পাশে একটু দূরেই তো রাস্তা আছে। আমরা সে রাস্তায় উঠতে পারি। সেখানে গাড়িও মিলবে।' বলল ব্রুনা।

'সেটাই সুবিধাজনক। কিন্তু রাস্তায় ওঠা ঠিক হবে না। অল্পক্ষণের মধ্যেই ওরা জানতে পারবে গাড়িতে আমরা নেই। তারপরেই ওরা হন্যে হয়ে খুঁজতে শুরু করবে। চারপাশের পথ তারা চষে ফিরবে। রাস্তায় উঠলে ওদের হেলিকপ্টারের চোখ এড়ানো কঠিন হবে।' আহমদ মুসা বলল।

'ধন্যবাদ স্যার, ঠিক বলেছেন। কিন্তু স্যার, এরকম বিপদে আমাদের মাথা সব সময় গুলিয়ে যায়। কিন্তু আপনার মাথা কি করে ঠাণ্ডা থাকে?' বলল ব্রুনা।

'সবারই মাথা ঠাণ্ডা থাকতে পারে, যদি সবাই সব ব্যাপারে আল্লাহর উপর নির্ভর করতে পারে।' আহমদ মুসা বলল।

'আমি বুঝলাম না স্যার।' বলল ব্রুনা।

‘মাথা গুলিয়ে যাবার যে কথা বললে সেটা ভয়ের কারণে হয়। মৃত্যু ভয় সবচেয়ে বড় ভয়। এই ভয় যদি জয় করা যায়, তাহলে কোন ভয়ই আর থাকে না। মৃত্যুভয় দূর হয় আল্লাহর উপর নির্ভরতা থেকে। এ বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ যদি না চান দুনিয়ার কেউ মারতে পারবে না, আর আল্লাহ যদি চান, তাহলে দুনিয়ার সবাই মিলে চেষ্টা করেও কাউকে রক্ষা করতে পারবে না। এই বিশ্বাস আল্লাহর উপর নির্ভরতা থেকেই আসে।’ আহমদ মুসা বলল।

চলতে শুরু করেছে তারা।

দ্রুত হাঁটছে তারা জংগল ঠেলে যতটা সম্ভব সামনে। মিনিট দশেক পার হয়ে গেল। তারা তখনও জংগলের পথেই চলছে।

হেলিকপ্টারের শব্দে তারা সকলেই পেছন দিকে ফিরে তাকাল। দেখল, পেছনের আকাশে সেই হেলিকপ্টারটি উড়ছে।

‘নদীতে পড়ে যাওয়া গাড়ি পরীক্ষা করে ওরা নিশ্চিত হয়েছে যে, ওদের বোকা বানানো হয়েছে। এখন ওরা পাগলের মত খুঁজছে আমাদের।’ আহমদ মুসা বলল।

‘চরম এই সংকটকালে ওদের বোকা বানাবার বুদ্ধি আপনার মাথায় এল কি করে স্যার! এটা আমার কাছে এখনও বিস্ময়!’ বলল ব্রুনা।

‘সৃষ্টি ও স্রষ্টা সম্পর্কে আরও জান ব্রুনা। মানুষ যখন উপায়হীন হয়ে পড়ে, তখন আল্লাহ স্বয়ং উপায় বের করে দেন।’ আহমদ মুসা বলল।

‘স্যার, আগে এই বিপদ থেকে বাঁচি তারপর আমি সব জানার চেষ্টা করব।’ বলল ব্রুনা।

‘ধন্যবাদ ব্রুনা।’ আহমদ মুসা বলল।

‘স্যার, একটা কথা আমি বুঝতে পারছি না, আমরা যে ঐ মাইক্রোতে আছি, হেলিকপ্টার থেকে ওরা তা বুঝল কি করে?’

‘ও মাইক্রোটা তো ওদের। ওরা...।’

আহমদ মুসার কথার মাঝখানেই ব্রুনা বলে উঠল, ‘ঠিক স্যার। এ ধরনের মাইক্রো তো দেশে শত শত আছে। আর অত উপর থেকে গাছপালার মধ্য দিয়ে গাড়ির নাম্বার দেখতে পাওয়া সম্ভব নয়।’

‘খুব সহজ ব্যবস্থা ওদের ছিল, যা তাড়াহুড়ার মধ্যে আগে আমার মনে পড়েনি। ওদের প্রতিটি গাড়িতে ট্রান্সমিটার সেট করা থাকে। এর মাধ্যমে ওরা গাড়ির ভিতরের কথোপকথন, গাড়ির অবস্থান মনিটর করে। আমাদের গাড়িতেও ট্রান্সমিটার সেট করা ছিল আর সেটাই তাদের খবর দিয়ে ডেকে এনেছে।’ আহমদ মুসা বলল।

ব্রুনা ও সেনফ্রিড দু’জনেরই চোখ বিস্ফোরিত হয়ে গেল! ভয়ে তাদের বুক কেঁপে গেল। শত্রুরা এতটা সাবধান, এতটা ক্ষিপ্র! পরম ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় তাদের হৃদয়টা নুয়ে গেল আহমদ মুসার জন্যে। অজানা, অনাত্মীয় এই বিস্ময়কর মানুষটি জীবন বাজী রেখে তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। বুদ্ধি ও শক্তি সব যুদ্ধেই সে অগ্রগামী।

আহমদ মুসা হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিয়েছিল।

ব্রুনারাও তার পেছনে পেছনে ছুটল।

‘এই এলাকাটা আমাদের তাড়াতাড়ি পার হতে হবে। ওরা পাগল হয়ে গেছে। ওরা এলাকাটা চষে ফেলবে। সবাই দ্রুত পা চালান।’ আহমদ মুসা বলল।

৪

ক্র্যডল থেকে টেলিফোন তুলতে তুলতে ভাবল, এ বার নিয়ে পাঁচ বার টেলিফোন তার বসের কাছ থেকে এসেছে। আজ পঁচিশ বছর সে তার বসের ব্যক্তিগত স্টাফ হিসাবে কাজ করছে। কিন্তু শান্ত, ঠাণ্ডা মানুষটিকে এতটা উদ্বিগ্ন সে কখনো দেখেনি। সে অর্থ-সম্পদ, মর্যাদা-প্রতিপত্তি অর্জনের ক্ষেত্রে সব বাঁধাই নিষ্ঠুরভাবে দমন করেন। শত্রুর জীবনের বিন্দুমাত্র মূল্য নেই তার কাছে। কিন্তু তার এই রূপটা কিন্তু বাইরে থেকে একটুও বুঝার উপায় নেই। যা করে সব ঠাণ্ডা মাথায় করে, হাসতে হাসতে করে। যেখানে তার উত্তেজিত হবার কথা, সেখানে সে বরফের মত ঠাণ্ডা থাকে। কিন্তু সেই লোকটাই আজ তার বিরক্তি, উদ্বেগ ও উত্তেজনা কিছুতেই আড়াল করতে পারছে না।

হিংগিস্ট টেলিফোনের স্পীকার মুখের কাছে নিয়ে এসে বলল, 'ইয়েস স্যার। আমি হিংগিস্ট স্যার। আদেশ করুন স্যার।'

'হিংগিস্ট, ডরিন ডুগান নতুন কি জানিয়েছে?' বলল টেলিফোনের ওপারে হিংগিস্টের বস, 'ব্ল্যাক লাইট' সংগঠনের প্রধান।

'নতুন কোন তথ্য দিতে পারেনি স্যার। হাইওয়েসহ এলাকার সব রাস্তায় তারা ওদের খুঁজেছে এবং খুঁজছে।' বলল হিংগিস্ট।

'ও গড, তিনজন লোক হাওয়া হয়ে গেল। আমি বুঝতে পারছি না ডরিন ডুগানের মত লোক ওদের মত চুনোপুঁটির কাছে বুদ্ধির যুদ্ধে হেরে গেল!' বলল হিংগিস্টের বস ওপার থেকে।

হিংগিস্ট কিছু বলার আগেই ওপার থেকে টেলিফোন সংযোগ কেটে গেল। তার বস ওপার থেকে টেলিফোন রেখে দিয়েছে।

বিব্রত, বিপর্যস্ত হিংগিস্ট তার টেলিফোনের রিসিভার রাখল।

হিংগিস্টের মনে নানা চিন্তা-দুশ্চিন্তার ঘুরপাক। বসের শেষ কথাটা তার ভালো লাগেনি। তার বসের মধ্যে এমন হতাশা দেখতে সে অভ্যস্ত নয়।

সে তার বসের সাথে আছে প্রায় পঁচিশ বছর। এই পঁচিশ বছরে কখনো কোন অবস্থায়ই তার বসকে সে হারতে দেখেনি, হতাশ হতে দেখেনি। সে যা চেয়েছে, তাই হয়েছে সব সময়।

পঁচিশ বছর আগে এক অভিজাত ক্যাসিনোর এক জুয়ার আসরে তার বসকে সে প্রথম দেখে। তখন হিংগিস্ট চাকরি খুঁজে পাওয়ার ব্যাপারে একদম হতাশ হয়ে একটা রিভলবার যোগাড় করে ছিনতাইয়ের কাজ শুরু করেছে। তার লক্ষ ছিল, সে এভাবে বড়লোকদের পকেট কেটে টাকা যোগাড় করে একটা বড় ব্যবসায় ফেঁদে নিজেই এমপ্লয়ার হয়ে বসবে।

এক ধনাঢ্য মার্চেন্টকে টার্গেট করে সেদিন সে ঐ ক্যাসিনোতে বসে ছিল। তার বস লোকটিও তার সামনের টেবিলে একাই সাথে বসে কফি খাচ্ছিল। লোকটিকে দেখে আপনাতেই তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। কারণ লোকটি দীর্ঘকায়, জার্মানদের এভারেজ হাইটের চেয়ে লম্বা এবং অ্যাক্রব্যাটদের মত সুগঠিত ও সর্পিল শরীর। আর চোখ ছুরির ফলার মত ধারালো।

ক্যাসিনোর সে রুমটাও ছিল জুয়াড়িদের। বড় ঘরটির এক পাশে চলছিল জুয়া খেলা একটা বড় টেবিলে। ক্যাসিনোর অনেক জুয়ার টেবিলের মধ্যে এই টেবিলকে বলা হয় কিং টেবিল। টাকার কিংরাই এ টেবিলের জুয়ার আড্ডায় বসে।

হঠাৎ গণ্ডগোল বেঁধে যায় জুয়ার টেবিলে।

একজন জুয়াড়ি অবিশ্বাস্য একটা বড় দান জিতে যায়। বিপরীত দিকের শক্তিশালী পক্ষ তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

আমার সামনের টেবিল থেকে লোকটি স্প্রিং-এর মত একটা লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। ছুটে গেল আক্রান্ত লোকটির কাছে। চিৎকার করে বলল, 'এ আমার লোক, সকলে সরে দাঁড়াও।'

আমার বস লোকটির হাতে তখন দুই হাতে দুই রিভলবার।

তার কথা শেষ হবার আগেই পেছন থেকে দু'জন তার দু'হাতে আঘাত করল। রিভলবার পড়ে গেল তার দু'হাত থেকে।

আমিও উঠে দাঁড়িয়েছিলাম।

কি হয়ে গেল যেন আমার মধ্যে! আমি দ্রুত আমার পকেট থেকে রিভলবার বের করে 'এদিকে বস' বলে চিৎকার করে উঠে রিভলবার ছুঁড়ে দিলাম লোকটির দিকে।

আমার চিৎকারে সবাই তাকিয়েছিল এদিকে। বস লোকটিও।

আমার ছুঁড়ে দেয়া রিভলবার সে লুফে নিয়ে এক অবিশ্বাস্য দ্রুততার সাথে রিভলবার খালি করে ফেলল। চোখের পলকে তার চারপাশে ছয়টা লাশ পড়ে গেল। এবার সে তার হাত থেকে পড়ে যাওয়া দু'টি রিভলবার তুলে নিল অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সাথে। তবে রিভলবার ব্যবহারের আর দরকার হলো না। প্রতিপক্ষ ৬টি লাশ ফেলে দ্রুত পালিয়েছে।

আমি আবার টেবিলে বসে পড়েছিলাম।

সব লোকটি তার সাথীকে নিয়ে আমার কাছে এল। আমাকে জড়িয়ে ধরে ধন্যবাদসহ আমার রিভলবার আমাকে ফিরিয়ে দিয়ে বলল, 'চলুন, বাইরে গিয়ে কথা বলি। এখানে থেকে পুলিশের ঝামেলায় পড়ে লাভ নেই।'

আমি তাদের গাড়িতে চড়ে আরেকটা ক্যাসিনোতে এসে বসলাম।

সব লোকটি আবার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলল, 'এই সাহায্য আমার জীবন বাঁচিয়েছে। আপনি কি আমাকে চেনেন?'

'না।' আমি বললাম।

কিন্তু সাহায্য করলেন যে?' বলল সে।

'কিছু ভেবে আমি এটা করিনি। হঠাৎ করে মনে হয়েছিল, আমার রিভলবারটা আপনাকে দেয়া উচিত। ব্যস, আমি দিয়ে দিলাম।' আমি বললাম।

'ধন্যবাদ। অনেক ধন্যবাদ। আপনি কি করেন?' বলল বস লোকটি।

'আগে চাকরি খুঁজতাম। এখন ছিনতাই করি। ঠিক করেছি, এভাবে টাকা জমিয়ে বড় কিছু একটা করে আমি মানুষকে চাকরি দেব।' বললাম আমি।

'ভালো চিন্তা। কিন্তু এটা অনিশ্চিতের পথ। আপনি আমাদের সাথে কাজ করবেন?' বলল সে।

'জুয়া খেলার কাজ?' বললাম আমি।

বস লোকটি হাসল। বলল, ‘জুয়া খেলা আমাদের কাজ নয়। কাজের জন্যে টাকা যোগাড়ের একটা উপায় মাত্র।’ বলল সে।

‘তাহলে কাজটা কি?’ বললাম আমি।

‘অনেক বড় কাজ। কি কাজ সেটা অবশ্যই জানবেন, তবে এ পর্যায়ে নয়। এটুকু শুনে রাখুন, শুধু ধনাগার দখল নয়, এই ধনাগার আসে যা থেকে তাও আমরা দখল করতে চাই।’

বসকে আগেই পছন্দ হয়েছিল। তার এই কথাও পছন্দ হলো। শুধু বললাম, ‘ব্যাপারটা রাজ্য দখলের মত?’

‘রাজ্য দখল নয়, মানুষ দখল বলতে পারেন। রাজ্য তো হয় মানুষের। মানুষ দখল হয়ে গেলে রাজ্য তখন আপনাতেই দখল হয়ে যায়। রাজ্য তখন আর দখল করতে হয় না।’ বলল সে।

আমি সেই থেকে তাদের সাথে শামিল হয়েছি।

বস আমাকে তার পাশে রেখেছেন। পিএ, পিএস, সিকিউরিটি সবই আমি।

পরে অনেক কিছুই জেনেছি। সংগঠনের নাম ‘ব্ল্যাক লাইট’। নানা রংয়ের রে লাইটে’র মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়, তবে অন্ধকারে ব্ল্যাক লাইটই বেশি পাওয়ারফুল হয়। ব্ল্যাক লাইট সংগঠনও তাই। এদের শক্তি অস্ত্র নয়, বিজ্ঞানের অপব্যবহার। এই প্রকল্পের কালো থাবায় রয়েছে আপাতত উত্তর জার্মানির অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যগুলো।

আমার খুব ভালো লাগে এদের এই প্রকল্প। এর সাফল্য সম্পর্কেও আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু নতুন শত্রুর অভ্যুদয়, সালজবার্গের ব্যর্থতা, স্টুটগার্টের পার্বত্য উপত্যকায় আমাদের বিস্ময়কর পরাজয়, নিকার নদী এলাকায় ফাঁদ কেটে শত্রু বেরিয়ে যাওয়া এবং সর্বশেষ বসের হতাশাপূর্ণ উক্তি আমাকে উদ্বিগ্ন করেছে।

হিংগিস্টের সামনে কফিটা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। ভালো লাগছে না তার কফি খেতেও।

চেয়ারে গা এলিয়ে চোখ বন্ধ করে চিন্তা থেকে মুক্ত হতে চাইল সে।

হলো না নিরিবিলি থাকা। গেটের ইন্টারকম বেজে উঠল।

গেটের সিকিউরিটি অফিসারের কন্ঠ। বলল, ‘স্যার, মি. গেরারড গারভিন এসেছেন।’

‘হ্যাঁ, ওনার আসার কথা। উপরে নিয়ে এস।’ বলল হিংগিস্ট।

গেরারড গারভিন একজন ‘সিচুয়েশন অ্যানালিস্ট’। তিনি ‘ব্ল্যাক লাইট’ সংগঠনের প্রধান তার বসের এক উপদেষ্টা। যে কোন ঘোরালো পরিস্থিতিতে তার বস তাকে ডাকেন।

হিংগিস্ট কথা শেষ করেই বিশেষ ইন্টারকমে বলল তার বসকে, ‘স্যার, গেরারড গারভিন এসেছেন।’

‘তাকে নিয়ে এস।’ বলল ইন্টারকমের ওপার থেকে তার বস।

গেরারড এলে হিংগিস্ট বলল, ‘চলুন স্যার। স্যার আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন।’

হিংগিস্ট আগেই উঠে দাঁড়িয়েছিল।

চলল তার অফিস কক্ষের বিপরীত দিকের দেয়ালের সাথে আটকে রাখা বড় স্টিলের আলমারির দিকে।

চাবি দিয়ে তালা খুলল আলমারির।

আলমারির দেয়ালে ছোট বড় অনেক শেলফ। সেলফে অফিসের ফাইল ও জিনিসপত্র। সেলফগুলো আলমারির মাঝ বরাবর এসেছে। আলমারিতে ঢুকল হিংগিস্ট ও গেরারড গারভিন। তারা প্রবেশ করল একদম আলমারির ভিতরে। সংগে সংগেই আলমারির দরজা আপনাতেই বন্ধ হয়ে গেল। দরজা বন্ধ হওয়ার সাথে সাথেই আলমারিতে আলো জ্বলে উঠল।

হিংগিস্ট আলমারির দেয়ালের গায়ে অদৃশ্য একটা টাস লকে সম্ভবত একটা কোড টাইপ করল। সাথে সাথেই আলমারির সেলফের আর্ধেকটা সরে এল। আর তখনই পেছনের একটা দরজা উন্মুক্ত হয়ে গেল।

হিংগিস্ট গেরারড গারভিনকে নিয়ে দ্রুত সামনের দিকে এগোতে লাগলো।

পেছনে আলমারির সেলফের দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

অল্পক্ষণ হাঁটার পরেই তারা একটা এসকালেটর সিঁড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো। একসালেটরটা এসে দাঁড়াবার সাথে সাথেই সব আলো নিভে গেল এবং এসকালেটর চলতে শুরু করল।

ঘুটঘুটে অন্ধকারে এসকালেটর কোনদিকে যাচ্ছে কোথায় যাচ্ছে বুঝার কোন উপায় নেই।

এসকালেটরটি অনেকবার উপর-নিচ করে এক সময় স্থির দাঁড়িয়ে গেল।

এসকালেটরের যেখানে তারা দাঁড়িয়েছিল, তার সামনের একটা দরজা খুলে গেল।

'আসুন স্যার!' বলে হিংগিস্ট খোলা দরজা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করল।

হিংগিস্ট ও গেরারড গারভিন ভিতরে প্রবেশ করার পর পেছনের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। এই দরজা বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে বিপরীত দিকের দেয়ালে আরেকটা দরজা খুলে গেল। সেই সাথে একটা ভারি কন্ঠ ভেসে এল, 'মি. গেরারড গারভিন, ওয়েল কাম। আসুন। হিংগিস্ট, তুমিও এস।'

খোলা দরজা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করল তারা।

ঘরের ভিতরে একটা বড় টেবিল। টেবিলের ওপাশে একটা রাজকীয় চেয়ার। টেবিলের এপাশে আরো দু'টি চেয়ার।

টেবিলের ওপাশে রাজকীয় চেয়ারে বসে আছে আপাদ-মস্তক কালো পোষাকে আবৃত একটা কালো মূর্তি। শুধু নাকের নিচ থেকে ঠোঁটের নিচ পর্যন্ত উন্মুক্ত। চেয়ারের উপর বসা লোকটির তীরের মত ঋজু শরীর।

তার নাকের নিচে ঠোঁটের উপর হিটলারী গোঁফ তার অবয়বে একটা হিংস্র রূপের সৃষ্টি করেছে। ঠোঁটে ভেসে ওঠা হাসি তা ঢাকতে পারেনি।

এই কালো মূর্তিই 'ব্ল্যাক লাইট' সংগঠনের প্রধান। ব্ল্যাক লাইটের লোকদের কাছে সে ব্ল্যাক বার্ড নামে পরিচিত। আসল নাম তার কি কেউ জানে না। বাড়ি তার কোথায় তাও কারো জানা নেই। তবে তার জার্মান উচ্চারণে পোলদের অ্যাকসেন্ট আছে।

চেয়ারে বসতেই ব্ল্যাক বার্ড গেরারড গারভিন ও হিংগিস্টকে বসতে বলল। বসল হিংগিস্টরা।

‘গারভিন, তোমাকে ডেকেছি একটা সমস্যায় পড়ে।’ বলল ব্ল্যাক বার্ড।

‘আমি কি করতে পারি স্যার? আদেশ করুন।’ বলল গেরারড গারভিন।

‘এক অজ্ঞাত এশিয়ান এসে দাঁড়িয়েছে সেনফিড ব্রুনাদের পাশে। গত দুই দিনে অন্তত চারবার তার কাছে আমাদের মারাত্মক পরাজয় ঘটেছে।’

বলে ব্ল্যাক বার্ড চারটি ঘটনাই তার কাছে বিস্তারিত তুলে ধরল।

গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনছিল গেরারড গারভিন।

ব্ল্যাক বার্ড কথা শেষ করলেও গেরারড সংগে সংগে কথা বলল না। ভাবছিল সে।

এক সময় মাথা তুলল গেরারড গারভিন। বলল, ‘লোকটি অসাধারণ প্রফেশনাল। যে অস্ত্র ও কৌশল সে ব্যবহার করেছে তা বিশ্বমানের। আর তার সাহসের মাত্রা খুবই দুর্লভ ধরনের। যা শুনছিলাম তাতে আমি নিশ্চিত, তাকে সেনফ্রিড পরিবারের জন্যে এ্যাসাইনড করা হয়েছে। ঐ পরিবারের কোন বন্ধু সে নয়। বন্ধু হলে সে অনেক আগেই দৃশ্যপটে আসত। ব্রুনার কোন প্রেমিকও সে নয়। ঘটনার বিবরণ শুনে মনে হলো ঐ দিন সকালে ব্রুনার সাথে তার প্রথম সাক্ষাত।’

হঠাৎ থেমে গেল গেরারড গারভিন। তার চোখে-মুখে নতুন ভাবান্তর। বলল, ‘অ্যালিনা মানে ব্রুনার বড় বোন আনালিসা অ্যালিনা কোথায়? লোকটা তার কেউ নয় তো, মানে প্রেমিক বা এ ধরনের কেউ?’

সংগে সংগে উত্তর দিল না ব্ল্যাক বার্ড। সেও সম্ভবত ভাবছিল। বলল একটু সময় নিয়ে, ‘হ্যাঁ, অনেক দিন খোঁজ নেই অ্যালিনার। আমরা যতটা জেনেছি তাতে দেখা যাচ্ছে, অ্যালিনা আন্তর্জাতিক ধরনের একটা সংগঠনের চাকুরে। গোটা দুনিয়া তার ঘুরে বেড়াতে হয়। আমরা তাঁকে খুঁজে পেতে ব্যর্থ হয়েছি।’

‘তাহলে সে তো এশিয়াসহ পৃথিবীর যে কোন দেশেই থাকতে পারে। অ্যালিনার পক্ষে এই এশিয়ানকে তার পরিবারের সাহায্যের জন্যে নিয়োগ করা স্বাভাবিক।’

‘এটাও হতে পারে। তবে লোকটির ব্যাপারে অস্ট্রিয়ার ইমিগ্রেশান, বিমান বন্দর, হোটেলে খোঁজ নিয়ে আমরা জেনেছি, সে মার্কিন নাগরিক। মার্কিন

পাসপোর্ট নিয়ে সে এসেছে। ভিভি আইপি ইউরো ভিসা তার। ভিসা সে নিয়েছে তাহিতি থেকে। সুতরাং সে নিয়োগ দিলে বা অনুরোধ করে তাকে কাজে লাগালে লোকটির সাথে নিশ্চয় আনালিসা অ্যালিনাও আসতো। না আসাটা প্রমাণ করে লোকটির সাথে অ্যালিনার কোন সম্পর্ক নেই। সুতরাং সব দিকের বিচারে লোকটিকে অ্যালিনা নিয়োগ দেবে, এটা স্বাভাবিক মনে হয় না।' বলল ব্ল্যাক বার্ড।

'আপনার কথা ঠিক স্যার। তার নামটা কি স্যার?' গেরারড গারভিন বলল।

'আহমদ আবদুল্লাহ মুসা।' বলল ব্ল্যাক বার্ড।

আহমদ মুসার পিতা-মাতার দেয়া নাম আহমদ আবদুল্লাহ মুসা। কিন্তু ছোটবেলা থেকেই আহমদ মুসা নামে সে পরিচিত হয়ে আসছে। তার বিভিন্ন পাসপোর্ট ও আন্তর্জাতিক সব রেকর্ডেও সে আহমদ মুসা। কিন্তু মার্কিন সরকারের দেয়া নাগরিকত্ব ও পাসপোর্টে তাঁর পূর্ণ নাম আহমদ আবদুল্লাহ নাম ব্যবহার করা হয়েছে।

'আহমদ আবদুল্লাহ মুসা? আহমদ মুসা নয় তো?' জিজ্ঞাসা গেরারড গারভিনের।

ব্ল্যাক বার্ড তাকাল গেরারড গারভিনের দিকে। বলল, 'কোন আহমদ মুসার কথা বছছ? মতুতুংগা দ্বীপের বন্দীখানা থেকে এই সেদিন প্রায় যে আহমদ মুসা ৭০ জন বিজ্ঞানীকে উদ্ধার করার ঐতিহাসিক কাজ করেছে, যে আহমদ মুসার শত শত কীর্তিগাথা পত্র-পত্রিকা ও ইন্টারনেটে রয়েছে, সেই আহমদ মুসার কথা?'

'জি আমি সেই আহমদ মুসার কথা বলছি।' গেরারড গারভিন বলল।

হিটলারি গোঁফের নিচে ব্ল্যাক বার্ডের ঠোঁটে একখণ্ড অবজ্ঞার হাসি ফুটে উঠল। বলল, 'না গারভিন, আকাশ আর মাটি এক নয়। নামের মধ্যে কিছু সাদৃশ্য থাকলেও সেই আহমদ মুসা ও এই আহমদ আব্দুল্লাহ মুসা এক অবশ্যই নয়। এই আহমদ আব্দুল্লাহ মুসা অসাধারণ এক ব্যক্তিত্ব, কিন্তু ঐ আহমদ মুসা এক জীবন্ত কিংবদন্তী! যাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ বহু দেশের প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রীরা সমীহ

করে চলে। সুতরাং তুমি যে আশংকা করছ, তা ঠিক নয় গারভিন। তার মত লোক আপনা-আপনি এসে সেনফ্রিডদের মত পরিবারের পাশে দাঁড়াবে এটা অবিশ্বাস্য।'

'আপনার কথাই হয়তো ঠিক। কিন্তু নামটা শুনে হঠাৎ আহমদ মুসার কথা আমার মনে হলো। আর এই লোকটার বৈশিষ্ট্য এমন যার সাথে আহমদ মুসার মিল আছে। অবশ্য দুই ব্যক্তি এক হওয়ার জন্যে এই মিলটুকু যথেষ্ট নয়। তাছাড়া আপনি যে কথা বলেছেন তা যৌক্তিক। আহমদ মুসার মত ব্যক্তিত্ব এমন কাজে এভাবে আসে না। সেনফ্রিডের যে সমস্যা তা তারা নিজেরাই জানে না। তারা নিজেরা যা জানে না, সে কাজের জন্যে কেউ আহমদ মুসাকে ডাকবে এবং সে আসবে তা বাস্তব নয়।' বলল গেরারড গারভিন।

'তাহলে বল, আমাদের সমস্যা কোথায় গিয়ে দাঁড়াল?' বলল ব্ল্যাক বার্ড।

'ব্রুনাদের সাথে আসা লোকটি আহমদ মুসা হোক বা না হোক, সে যে একজন বিপজ্জনক লোক এবং তার পথে দাঁড়ানো যে সহজ নয়, এটা প্রমাণিত হয়ে গেছে। বুঝা যাচ্ছে তারা ব্রুমসারবার্গে আসছে। তারা আসছে নিশ্চয় একটা প্রতিকারের উদ্দেশ্য নিয়ে। তার মানে তারা এখন অ্যাগ্রেসিভ। লড়াইকেও তারা ভয় করছে না। এত সাহস তারা পেল কোথায়? নিশ্চয় ঐ লোকটিই তাদের সাহসের উৎস। সুতরাং স্যার, সব বাদ দিয়ে এই লোকটিই আপনাদের এক নম্বর টার্গেট হওয়া উচিত। একে সরিয়ে দেয়া ছাড়া আপনারা নিরাপদ নন।' গেরারড গারভিন বলল।

ব্ল্যাক বার্ডের হিটলারি গোঁফের নিচে এক টুকরো ক্রূর হাসি ফুটে উঠল। বলল, 'ধন্যবাদ গারভিন, তুমি এ রকম একটা সুন্দর স্পষ্ট পরামর্শ দেবে সেটাই আমি আশা করেছিলাম। ধন্যবাদ তোমাকে।'

কথা শেষ করেই ব্ল্যাক বার্ড তাকাল হিংগিস্টের দিকে। বলল, হিংগিস্ট, পাশের ঘরে নাস্তা রেডি। গেরারড গারভিনকে নিয়ে যাও। ভালো করে নাস্তা করাও তাকে।'

হিংগিস্ট বুঝল এটাই বিদায়ের ইংগিত।

হিংগিস্ট উঠে দাঁড়াল।

উঠে দাঁড়াল গেরারড গারভিনও।

গেরারড গারভিনকে 'আসুন স্যার!' বলে দরজার দিকে হাঁটতে শুরু করল হিংগিস্ট।

তার পেছনে হাঁটতে শুরু করেছে হিংগিস্টও।

উত্তরমুখী রাস্তা ধরে হাঁটছিল আহমদ মুসা, সেনফ্রিড ও ব্রুনা।

রাস্তাটা ফাঁকা, তবে ফার্মল্যান্ডের রাস্তার মত প্রাইভেট মনে হচ্ছে। গাড়ি-ঘোড়া দেখা যাচ্ছে না।

পথের দু'ধারে ফসলের মাঠ, জংগল ও টিলার মত উচ্চ ভূমি।

এখনও কোন বড় লোকালয় চোখে পড়েনি।

রাস্তার আশেপাশে দু'একটা বাড়ি ও ফার্ম হাউজ দেখা যাচ্ছে। বাড়িগুলো পুরনো ও ওল্ড প্যাটার্নের।

'এটাই বাদের ওয়াটলেসবার্গ এলাকা। জার্মানির প্রাচীনতম সভ্যতার ধ্বংসাবশিষ্ট এলাকা এটি। জার্মানির ওল্ড স্যাক্সনদের একটা বড় অংশ এখানে বাস করে। এরা তাদের আদি সংস্কার-সংস্কৃতি এখনও ধরে রেখেছে। জার্মানির প্রাচীন স্থাপনাগুলো এখানেই বেশি দেখা যায়। এদের দেখলে জার্মানির প্রাচীন সভ্যতা-সংস্কৃতি দেখা হয়ে যায়। আমার খুব ভালো লাগে এদের।' বলল সেনফ্রিড।

'আসল কথাই বললেন না বাবা। জার্মানির মানে ইউরোপের আদি ডেমোক্র্যাসির কিছু এখনও এদের মধ্যে দেখা যায়।' ব্রুনা বলল।

'হ্যাঁ, ঠিক বলেছ ব্রুনা। এটা জার্মানির একটা গৌরবময় ঐতিহ্য।' বলল সেনফ্রিড।

'জার্মানি মানে ইউরোপের আদি ডেমোক্রাসি? সেটা কি?' আহমদ মুসা বলল।

'সেটা ওল্ড স্যাক্সনদের একটা সমাজ ব্যবস্থা। যা ছিল আদি গণতন্ত্র। অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে রাইন নদীর অববাহিকায় স্যাক্সনদের সমাজে এটা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বাস্তবে না দেখলে বিষয়টা বুঝা যাবে না স্যার। বলল ব্রুনা।

'এই বাদেন এলাকায় কি শুধু ওল্ড স্যাক্সনরাই বাস করে?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

'অন্য কম্যুনিটির কিছু লোকও বাস করে এ এলাকায়। কিন্তু সেটা শহর এলাকায়। গ্রাম এলাকা শুধুই ওল্ড স্যাক্সনদের?' বলল ব্রুনা।

'এখানেই সমস্যা। ওল্ড স্যাক্সনরা সম্পদ লোভী ও কূটবুদ্ধির নয়, ওরা সরল-সহজ, অল্পে তৃপ্ত। সম্পদ অর্জন ও দখল নিয়ে কোন সংঘাত-সংঘর্ষে নামে না তারা। এই সুযোগে নন-স্যাক্সনরা দূর্নীতিবাজ সরকারি কর্মকর্তাদের সাহায্যে এই বাদেন এলাকার ওল্ড স্যাক্সনদের বেশ জমি-জমা দখল করে নিয়েছে। এই বিষয়টা একটা রাজনৈতিক সমস্যারও সৃষ্টি করেছে।' ব্রুনার পিতা সেনফ্রিড বলল।

আহমদ মুসা ও সেনফ্রিড পাশাপাশি হাঁটছিল। তাদের পেছনে পেছনে হাঁটছিল ব্রুনা।

কথা শেষ করেই সেনফ্রিড দাঁড়িয়ে পড়ল।

তারা চাররাস্তার মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছে।

কোনদিকে যাবে তারা এই সিদ্ধান্তের জন্যেই দাঁড়িয়ে পড়েছে সেনফ্রিড।

আহমদ মুসাও দাঁড়িয়েছে। কিন্তু তার দৃষ্টি পূবের রাস্তার দিকে।

পূবের রাস্তা ধরে দু'টি কার ও তার কিছু পেছনে বড় আকারের একটা পাজেরো টাইপের জীপ পাগলের মত স্পীডে ছুটে আসছে।

আহমদ মুসা বুঝল সামনের কার দু'টোকে তাড়া করছে পেছনের বড় জীপটা।

আগের দু'টি কার বিচিত্রভাবে ডেকোরেটেড। সাধারণত বিয়ের কারগুলোকে এভাবে সাজানো হয়।

আহমদ মুসার ভাবনার চেয়েও দ্রুত গতিতে চলছিল গাড়িগুলো।

আহমদ মুসার চিন্তাকে এলোমেলো করে দিয়ে কার দু'টি পৌঁছে গেল চৌরাস্তাটির মুখে এবং সেই পাজেরোটি কার দু'টোকে ওভারটেক করে সামনে এসে কার দু'টোর পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে গেছে।

পাজেরোটি দাঁড়াতেই তার ছয়টি দরজা খুলে গেল। বেরিয়ে এল আটজন লোক। তাদের কয়েক জনের হাতে রিভলবার।

তারা ছুটে গেল কার দু'টির দিকে।

আহমদ মুসা বুঝল কি ঘটতে যাচ্ছে।

ব্রুনা ভয়ে জড়সড় হয়ে আহমদ মুসার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। ফিস ফিস করে বলল, 'স্যার, কার দু'টির ডেকোরেশন ওল্ড স্যাক্সনদের বিয়ের গাড়ির মত। মনে হয় স্যার, কার দু'টো স্যাক্সনদের বিয়ের গাড়ি।'

'দু'টো গাড়ি ডেকোরেটেড কেন? আমি দেখেছি শুধু বরের গাড়িই ডেকোরেটেড হয়, যাতে চড়ে বিয়ের পর বর কনেকে নিয়ে যায়।' আহমদ মুসা বলল।

'ওল্ড স্যাক্সনদের নিয়ম হলো বর একটা ডেকোরেটেড গাড়ি নিয়ে আসবে, সে গাড়িতে চড়ে কনে শ্বশুর বাড়ি যাবে। এই গাড়ির মালিক হবে কনে। কনে পক্ষ আরেকটা ডেকোরেটেড গাড়ি দেবে, সেটায় চড়ে বর তার বাড়ি যাবে। এই গাড়ির মালিক হবে বর। এই গাড়ি দু'টি বিয়ের মূল্যবান স্মৃতি হিসাবে থাকে।' বলল ব্রুনা।

'সুন্দর ব্যবস্থা তো! এই দুই কারের কোনটিতে বর, কোনটিতে কনে থাকবে তারও কোন নিয়ম আছে?' আহমদ মুসা বলল।

'স্যার, সামনেরটায় কনে আছে, পেছনেরটায় বর রয়েছে। এক্ষেত্রে...।'

কথা শেষ করতে পারল না ব্রুনা। ব্রুনার কথার মাঝখানেই আহমদ মুসা বলে উঠল, 'দেখ, দেখ ব্রুনা, এরা মনে হয় কনেকে টার্গেট করেছে।'

আহমদ মুসার মত ব্রুনাও ঘটনার দিকে মনোযোগ দিল। তারা দেখল, পাজেরো থেকে ৮জন বেরিয়ে গিয়ে সামনের কারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

কেউ গাড়ির উপর লাথি চালাচ্ছে। কেউ গাড়ির দরজা খোলার চেষ্টা করছে। ভিতরের আরোহীরা গাড়ি লক করে দিয়েছে ভিতর থেকে। কেউ কেউ গাড়ির জানালার কাচ ভাঙার চেষ্টা করছে।

সামনের কারের পেছন দিকের বাঁ পাশের জানালার কাচ ভেঙে দরজা খুলে ফেলল ওরা।

একজন মহিলাকে টেনে বের করে ধাক্কা মেরে ফেলে দিল। মহিলাটি পঞ্চাশোর্ধ্ব। হতে পারে বরের মা।

এরপর টেনে-হিঁচড়ে বের করল আর একজন তরুনীকে। তাঁর পরনের পোষাক দেখেই বুঝা গেল যে, এই মেয়েটিই কনে।

মেয়েটি চিৎকার ও কান্নাকাটি করছে।

এই সময় পেছনের গাড়ি থেকে একজন যুবক বেরিয়ে এল ট্রেডিশনাল স্যাক্সন পোষাক পরা অবস্থায়। সে ছুটে আসছিল তরুণীটিকে ওদের হাত থেকে উদ্ধারের জন্যে।

তিনজনে টেনে-হেঁচড়ে বের করছিল মেয়েটিকে। তাদের মধ্যে থেকে একজন যুবক তরুণীটিকে ছেড়ে দিয়ে পকেট থেকে রিভলবার বের করে গুলি করল যুবকটিকে। পরপর দু’টি গুলি। দু’টি গুলিই যুবকটির ডান বুকে বিদ্ধ হলো। যুবকটি আর এক পাও ওগোতে পারল না। তার দেহটা ভেঙে পড়ল যেখানে সে দাঁড়িয়েছিল সেখানেই।

যুবকটি গুলি বিদ্ধ হতেই একজন যুবক চিৎকার করে বেরিয়ে এল পেছনের গাড়ি থেকে। সে যে বর, তার পোষাক দেখেই তা বুঝা গেল।

আগের যুবককে যে গুলি করে মেরেছে সেই যুবকটিই আবার রিভলবার উঁচিয়েছে।

আহমদ মুসা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে।

কে ঠিক বা বেঠিক তা সে জানে না। কিন্তু কনেকে ছিনতাই করা হচ্ছে এবং বরকে টার্গেট করা হয়েছে হত্যার জন্যে, এটা ন্যায় নয়, অন্যায় এবং এটা সৎ কাজ নয়, অবশ্যই কোন ষড়যন্ত্র। তার চোখের সামনে এটা সে ঘটতে দিতে

পারে না। এর প্রতিফল কি হবে তাও সে জানে না। কিন্তু যাই ঘটুক, সে মজলুমের পক্ষে দাঁড়াতে চায়।

চোখের পলকে আহমদ মুসার ডান হাত পকেট থেকে বেরিয়ে এল রিভলবার নিয়ে। গুলি করতে একটুও দ্বিধা করল না। গুলি করতে উদ্যত রিভলবারধারী যুবকটির ডান বাহুসন্ধিকে গুলি গিয়ে বিদ্ধ করল। তার হাত থেকে রিভলবার পড়ে গেল। ডান বাহু চেপে ধরে সে বসে পড়ল।

তার অন্য সাথীরা সংগে সংগেই তাকাল আহমদ মুসার দিকে। রিভলবার হাতে দাঁড়ানো আহমদ মুসাকে তারা দেখতে পেল।

সংগে সংগেই কয়েকটি রিভলবার উঠল আহমদ মুসার লক্ষে।

আহমদ মুসার রিভলবার ধরা হাত নিচু হয়নি। তার হাতের রিভলবার ঘুরে গেল ওদের লক্ষে অদ্ভুত দ্রুততার সাথে। আহমদ মুসার রিভলবার থেকে চারটা গুলি বেরিয়ে গেল ভাবনার মত দ্রুতগতিতে। ওদের আঙুল রিভলবারের ট্রিগার স্পর্শ করার আগেই পড়ে গেল ওদের রিভলবার ওদের হাত থেকে। রিভলবারধারী চারজনের কারো হাত, কারো বাহু, কারো বাহুসন্ধিকে বিদ্ধ করেছে আহমদ মুসার রিভলবারের গুলি।

তিনজন তখনও অক্ষত দাঁড়িয়ে ছিল। ওরা তাদের কোমরের ঝুলানো হোল্ডার থেকে ছুরি বের করছিল।

আহমদ মুসা রিভলবার উদ্ধত করে তাদের দিকে ছুটে গেল। চিৎকার করে বলল, ‘যেই ছুরি বের করবে তাকে মরতে হবে। আমি কাউকে মারতে চাই না। এদের কাউকেই আমি মারিনি। কিন্তু আমার কথার অন্যাথা করলে সে রক্ষা পাবে না। তোমরা সকলেই ছুরি নিচে মাটিতে ফেলে দাও এবং আমি যে কাজ করতে বলি তা কর।’

কাজ দিল আহমদ মুসার কথা।

ওরা ওদের ছুরি ফেলে দিল।

‘কারো কাছে ভিডিও ক্যামেরা আছে কিনা?’ উচ্চ কণ্ঠে বলল আহমদ মুসা।

পেছনের গাড়ি থেকে বেরিয়ে আসা সেই বরবেশী যুবক বলল, 'একটা ভিডিও ক্যামেরা আছে।'

বলে সে পেছনের গাড়ি থেকে ক্যামেরাটি বের করে নিয়ে এল।

'এখানে ঘটনার যে দৃশ্য দেখা যাচ্ছে, তার পরিপূর্ণ দৃশ্য ভিডিওতে নিয়ে আসুন। যে যেখানে আছে, যা যেখানে আচে তার চিত্র ভিডিওতে থাকতে হবে, শুধু আমাদের তিনজনের ছবি ছাড়া।' যুবকটিকে লক্ষ করে বলল আহমদ মুসা।

ছবি তোলা হয়ে গেল। গাড়ি থেকে সবাই বেরিয়ে এসেছিল।

সামনের গাড়িতে বরের পিতা-মাতা ও কনের পিতা-মাতা ছিল এবং পেছনের গাড়িতে কনের এক ভাই, বরের দুই ভাইসহ ওল্ড স্যাক্সনদের সাব-কাউন্সিলের ডেপুটি ডিউক ছিল।

ছবি ওঠানোর পর আহমদ মুসা যে তিনজন আহত হয়নি, সে তিনজনসহ ওদের সবাইকে বলল, 'আপনারা সবাই আপনাদের গাড়িতে উঠুন এবং তাড়াতাড়ি কোন হাসপাতালে যান। অনেকেরই অনেক রক্তক্ষরণ হয়েছে, তাদের দ্রুত চিকিৎসা প্রয়োজন।'

ওরা সবাই আহমদ মুসার দিকে একবার তাকাল। তারপর তারা নিরবে উঠে গেল গাড়িতে।

গাড়ি ওদের স্টার্ট নিল।

চলে গেল তারা।

এ দু'গাড়ির সবাই পাথরের মত দাঁড়িয়ে।

বর কনেকে কি ইশারা করল।

দু'জনে এক পা দু'পা করে এগিয়ে এল আহমদ মুসার কাছে।

আহমদ মুসার সামনে দু'জন মুহূর্তের জন্যে স্থির হয়ে দাঁড়াল। তারপর দু'জন এক সাথে মাথা ঝুঁকিয়ে দীর্ঘ বাও করল আহমদ মুসাকে। মাথা তুলে কান্নায় ভেঙে পড়ল তারা। বলল তারা দু'জনেই, 'গড থিউ হানরকে ধন্যবাদ। আপনি আমাদের সন্মান বাঁচিয়েছেন, যে সন্মান জীবনের চেয়ে বড়। আপনি আমাদের জীবনও বাঁচিয়েছেন। অপরিশোধ্য এক ঋণে আপনি আমাদের বেঁধে ফেলেছেন। আমাদের কৃতজ্ঞতা আপনি গ্রহণ করুন।'

বর ও কনের পিতা-মাতাসহ অবশিষ্ট সবাই এগিয়ে এল। তারাও আহমদ মুসাকে বাও করল এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল।

ঘটনাগুলো ঘটে গেল দ্রুত ও অব্যাহত গতিতে।

আহমদ মুসা কিছু বলার সুযোগ পায়নি।

পাশে দাঁড়িয়ে ব্রুনা ফিসফিস করে বলছিল, 'স্যার, এদের কথা বুঝতে পেরেছেন তো? এরা ওল্ড স্যাক্সন ভাষায় কথা বলে। এদের জার্মান ভাষা খুব শুদ্ধ নয়।'

আহমদ মুসা বলেছিল, 'না, আমি বুঝতে পেরেছি ওদের কথা।'

ওদের বাও পর্ব শেষ হলে বর-কনেসহ সবাইকে উদ্দেশ্য করে আহমদ মুসা বলল, 'আমি আনন্দিত যে, আপনারা ঈশ্বর অর্থাৎ আল্লাহকে ধন্যবাদ দিয়েছেন। কৃতজ্ঞতা তাঁরই প্রাপ্য, আমার নয়।'

মুহূর্তের জন্যে থেমে বর-কনেকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'বর-কনে ভাই-বোনরা শোন, মানুষ একে অপরকে সাহায্য করলে সেটা ঋণ হয় না। এই সাহায্য করা একে অপরের দায়িত্ব। আমি সে দায়িত্ব পালন করেছি। নতুন জীবনের শুরুতে 'অপরিশোধ্য' কোন ঋণের বোঝা তোমাদের মাথায় রাখার দরকার নেই।'

শেষ বাক্যটা বলল আহমদ মুসা মুখে হাসি টেনে, স্নেহের হাসি।

আহমদ মুসার হাসি ও স্নেহমাখা কথায় বর-কনের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তারা আবার বাও করল আহমদ মুসাকে। তাদের চোখে অসীম শ্রদ্ধা ও সম্মানের দৃষ্টি।

এগিয়ে এলো চার প্রৌঢ়, বর-কনের পিতা-মাতাসহ চারজন। তাদের মধ্যে একজন নিজের পরিচয় দিয়ে বলল, 'আমি বরের বাবা। আমার দু'টি অনুরোধ আপনার কাছে। একটি অনুরোধ হলো, বর-কনের বিয়ে হয়ে গেছে। কনেকে আমরা নিয়ে যাচ্ছি। বাড়িতে আজ আমাদের মূল অনুষ্ঠান। আমাদের এই অনুষ্ঠানে আপনাকে, ম্যাডামকে ও আপনাদের সাথী ভদ্র মহোদয়কে দাওয়াত। আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ আমাদের দাওয়াত আপনারা গ্রহণ করুন। অন্য অনুরোধটি হলো একটা বিরাট ঘটনা ঘটে গেছে। এই ঘটনায় আপনি সিদ্ধান্তকারী

ভূমিকা পালন করেছেন। এখন করণীয় সম্পর্কে আপনার কোন পরামর্শ আছে কি?’

থামল বরের পিতা বার্টওয়াল্ড।

বরের পিতা বার্টওয়াল্ড থামলে আহমদ মুসা ব্রুনা ও তার পিতা আলদুনি সেনফ্রিডকে ওদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিল। ব্রুনাকে দেখিয়ে বলল, ‘ইনি ম্যাডাম নন, ইনি মিস ব্রুনা ব্রুনহিল্ড। আমি তাদের অতিথিমাত্র।’

এভাবে আলদুনি সেনফ্রিডকে পরিচয় দিল এবং বলল, ‘এদের অতিথি হিসাবে আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর্যায়ে নেই। এরা ইচ্ছা করলে তাদের অতিথিকে কোথাও নিয়ে যেতে পারেন। আর দ্বিতীয় বিষয়টির ব্যাপারে আমার নিজের কোন বক্তব্য নেই। আপনাদের আইন যা বলে তাই করা উচিত।’

এগিয়ে এল ওল্ড স্যাক্সনদের সাব-কাউন্সিলের ডেপুটি ডিউক অসওয়াল্ড আহমদ মুসার দিকে কয়েক ধাপ। বলল, ‘আইন যা বলে তাই যদি আমরা করব, তাহলে আসামীদের আমরা ছাড়লাম কেন? কেস দূর্বল করার সুযোগ হলো ওদের।’

‘না, তা হবে না জনাব। ওদের সবার ছবি নেয়া হয়েছে। রিভলবার ও অন্যান্য অস্ত্রে ওদের হাতের ছাপ আছে। সুতরাং কেস দুর্বল হওয়ার কথা নয়। আর আপনারা যদি চান, তাহলে পুলিশের এক উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে এ ব্যাপারে বলতে পারি।’ বলল আহমদ মুসা।

‘অনেক ধন্যবাদ, বললে ভালো হয়। অবশ্য এখানকার পুলিশ অফিসার ভালো। কিন্তু আমাদের প্রতিপক্ষ খুব সাংঘাতিক। ওরা না পারে এমন কিছু নেই। আইনের কোন মূল্য নেই ওদের কাছে।’ বলল ডেপুটি ডিউক অসওয়াল্ড।

‘ঠিক আছে, ‘আমি বলছি জনাব।’

বলে আহমদ মুসা পকেট থেকে মোবাইল বের করে কল করল তাহিতি গভর্নরের বন্ধু জার্মানির পুলিশপ্রধান বরডেন ব্লিসকে। তাকে সব কথা জানিয়ে তার সাহায্য চেয়ে বলল, ‘আমার মনে হচ্ছে জনাব এ রকম টেলিফোন আপনাকে আরো অনেক বারই হয়তো করতে হবে।’

'প্লিজ কোন দ্বিধা করবেন না আহমদ মুসা। আপনি আমাদের অতিথি। যে কাজটা আপনি করছেন, সেটা আমাদের কাজ। আর আপনার টেলিফোন পেলে আমি খুশি হবো আহমদ মুসা। আমার গর্ব হয় ভাবতে যে, মার্কিন প্রেসিডেন্টসহ পৃথিবীর কয়েক ডজন রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানের সম্মানিত বন্ধুর সাথে আমি কথা বলছি। আমি বাড়তি কিছু বলছি না, এটাই বাস্তবতা মি. আহমদ মুসা।' বলল পুলিশপ্রধান বরডেন ব্লিস।

শুভেচ্ছা ও সাহায্যের প্রতিশ্রুতির জন্যে ধন্যবাদ দিয়ে আহমদ মুসা অনুমতি নিয়ে কল অফ করে দিল।

আহমদ মুসা কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই কনের পিতা বলল আলদুনি সেনফ্রিডকে লক্ষ করে, 'বরের পিতা মি. বার্টওয়াল্ড যে দাওয়াত দিয়েছেন, তা আমাদের সকলের পক্ষ থেকে দাওয়াত আপনাদের সকলকে। দয়া করে আপনার মেহমানসহ আপনারা আমাদের দাওয়াতে শরিক হবেন।'

'ধন্যবাদ! আমাদের মেহমানের আপত্তি না থাকলে আপনাদের দাওয়াত কবুলে আমাদেরও আপত্তি নাই। কিন্তু কোথায় কত দূর যেতে হবে?' বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

'বেশি দূরে নয়, এখান থেকে সবচেয়ে কাছের লোকালয় উইসকারহেইম। সুন্দর উপত্যকায় সুন্দর একটা লোকালয়। জানতে পারি কি, কোথায় আপনারা যাচ্ছেন?' বলল বরের পিতা বার্টওয়াল্ড।

'ব্রুমসারবার্গে যাচ্ছি আমরা।' আলদুনি সেনফ্রিড বলল।

'ব্রুমসারবার্গ? তাহলে এ পথে কেন?' বলল কনের পিতা।

'আল্লাহ নিয়ে এসেছেন আমাদের, তাই। আপনাদের সাথে পরিচয় করানো একটা উপলক্ষ হতে পারে।' আহমদ মুসা বলল।

বর-কনে দু'জনেই দু'হাত জোড় করে উপরে তুলে উর্ধ্বমূখী হয়ে দু'চোখ বন্ধ করে কৃতজ্ঞতা ও ভক্তিমাখা প্রার্থনার সুরে বলল, প্রভু ফ্রিগ, টিউ, থানোর আমাদের জন্যে এমন মিরাকল যেন বার বার ঘটান।'

ফ্রিগ, টিউ, থানোররা কি আপনাদের বিভিন্ন গড?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

‘আমাদের গড়ের এগুলো প্রাচীন নাম। অনেকেই বিশ্বাস করতো এগুলো বিভিন্ন গড়ের নাম। কিন্তু তা নয়, আসলে এগুলো এক গড়ের বিভিন্ন নাম। দুরূহ যাতায়াত ব্যবস্থার কারণে একই দেশের ভৌগলিক বিচ্ছিন্নতার কারণে বিভিন্ন অঞ্চলে একই গড়ের বিভিন্ন নাম হয়েছিল মাত্র। বলল বর এড্রিক।

‘ধর্ম ও ঐতিহ্যের ব্যাপারে তুমি তো খুব সচেতন দেখছি?’

বলল আহমদ মুসা।

হাসল বর এড্রিক। পাশের কনের দিকে ইংগিত করে বলল, ‘স্যার, আমালিয়া ধর্ম, ইতিহাস, ঐতিহ্যের ছাত্রী। ওতো এসব ব্যাপারে পণ্ডিত।’

কনে আমালিয়া লজ্জায় লাল হয়ে গেল। মুহূর্তের জন্যে মুখ তুলে আবার মুখ নিচু করল।

‘ধর্ম ও ঐতিহ্য চেতনা মানুষের অতি প্রয়োজনীয় একটা বড় গুণ। ধন্যবাদ তোমাদের।’ আহমদ মুসা বলল।

বরের পিতাও মোবাইলে কথা বলছিল।

আহমদ মুসা কথা শেষ করে তার দিকে তাকাল।

বরের পিতা বার্টওয়াল্ড কথা শেষ করেই আহমদ মুসাকে বলল, ‘জনাব, পুলিশ আসছে। রওয়ানা দিয়েছে সংগে সংগেই।’

‘ঠিক আছে, পুলিশ আসছেন। তাঁরা দেখুক। পুলিশ কি ঘটনা আগে জানতে পেরেছিল?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

‘মনে হলো তাই। আমি ঘটনার কথা তুলতেই জায়গার নাম করে বলল, ওখানকার ঘটনা তো? তারপর বলল, আমরা প্রস্তুত হয়েছি ওখানে যাবার জন্যে। কোনোভাবে তারা ঘটনার কথা কিছু জানতে পেরেছিল?’ বলল বরের পিতা বার্টওয়াল্ড।

‘কার সাথে কথা বললেন, সেই ভালো পুলিশ অফিসারের সাথে?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

‘না, তিনি নেই। কি এক ট্রেনিং-এ তিনি বার্লিন গেছেন।’ বলল বরের পিতা।

পুলিশের গাড়ির সাইরেন শোনা গেল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই গাড়ি এসে গেল। তিনটি গাড়ি।

নামল একদল পুলিশ।

একজন পুলিশ অফিসার সামনে এগিয়ে এসে চিৎকার করে পুলিশকে নির্দেশ দিল, 'তোমরা লাশটাকে গাড়িতে তোল।'

তারপর আহমদ মুসাদের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'কনের ও বরের বাপ কে?'

বরের বাপ ও কনের বাপ কয়েক ধাপ তার দিকে এগিয়ে তাদের পরিচয় দিল।

'তোমরা একজনকে হত্যা করেছ এবং আরও কয়েকজনকে আহত করেছ। তারা কোথায়?'

'আমরা হত্যা করিনি। আহতরা চলে গেছে।' বলল বরের বাপ।

'আমরা হত্যা করিনি। নিহত ব্যক্তিটি আমাদের লোক।' কনের বাবাও বলল সংগে সংগেই।

'তাহলে কে হত্যা করেছে? সে কোথায়?' পুলিশ অফিসার বলল।

'সে আহতের মধ্যে একজন ছিল। চলে গেছে।' বলল বরের বাবা।

'চলে গেছে? কথা ঘুরাবার আর জায়গা পেলেন না? তারা আহত হয়েছে কাদের হাতে?' পুলিশ অফিসারের জিজ্ঞাসা।

'আমাদের হাতে।' বরের বাবাই বলল।

'তাহলে খুনিকে যেতে দিলেন কেন?' পুলিশ বলল।

'যাতে চিকিৎসা পায় এজন্যে। ওরা আমাদের পরিচিত। সবার নাম বলতে পারি। গেলেই ওদের পাওয়া যাবে।' বলল কনের বাবা।

পুলিশ অফিসার হো হো করে হাসল। বলল, 'এই কাহিনী আর কাউকে বলবেন, পুলিশকে নয়। বর-কনে ছাড়া সবাই আন্ডার এ্যারেস্ট। যে রিভলবার দিয়ে গুলি করেছেন, সেটা কোথায়?'

বিপদে পড়ে গেল বরের বাবা ও কনের বাবা। তারা একে-অপরের দিকে তাকাল। দু'জনেই ভাবল, তারা তাদের অতিথি, তাদের জীবন-সম্মান রক্ষাকারী আহমদ মুসার কথা বলতে পারে না। কিন্তু তারা কোন্ মিথ্যা কথাটা বলবে সেটা

ভাবছিল। সেই মুহূর্তে আহমদ মুসা এগিয়ে এল। বলল, 'অফিসার! রিভলবারটা আমার কাছে, রিভলবারটা আমার। একজন নব-বিবাহিত কনের সম্মান রক্ষা এবং কয়েক জনের জীবন রক্ষার জন্যে ডিফেন্সের মিনিমাম ব্যবস্থা হিসাবে কয়েকজনকে আহত করতে হয়েছে।'

'তার মানে বলছেন, হত্যা আপনি করেননি?' পুলিশ অফিসার বলল।

'যে গুলিতে নিহতের ঘটনা ঘটেছে, সেটা আমার রিভলবারের নয়। যে রিভলবারগুলো পড়ে আছে, সেগুলোর কোন একটার গুলি ওটা। সে রিভলবারের ফিংগার প্রিংন্ট থেকে প্রমাণিত হবে, কে তাকে হত্যা করেছে।' বলল আহমদ মুসা।

পুলিশ অফিসার কিছুটা বিস্ময় নিয়ে পরিপূর্ণভাবে তাকাল আহমদ মুসার দিকে। বলল, 'আপনাকে তো জার্মান মনে হচ্ছে না। কে আপনি, কোন দেশে বাড়ি?'

বলেই পুলিশ অফিসারটি তাকাল ব্রুনা ও আলদুনি সেনফ্রিডের দিকে। বলল, 'এরা কি আপনার সাথের?'

'হ্যাঁ।' বলল আহমদ মুসা।

হঠাৎ পুলিশ অফিসারটির চোখ-মুখের চেহারা পাল্টে গেল। মনে হলো, বড় কিছু যেন পেয়ে গেছে। তড়িঘড়ি করে ব্রুনাদের বলল, 'আপনার নাম কি ব্রুনা ব্রুনহিল্ড এবং ইনি আপনার পিতা আলদুনি সেনফ্রিড?'

'হ্যাঁ, অফিসার।' বলল ব্রুনা।

খুশিতে গোটা মুখ ঢেকে গেল পুলিশ অফিসারটির। তড়াক করে আহমদ মুসার দিকে ফিরে বলল, 'তাহলে আপনি স্টুডগার্টের ওদিকে থ্রিহিল উপত্যকায় অর্ধ ডজন মানুষকে নৃশংসভাবে হত্যা করে এসেছেন। থ্যাংকস গড! আপনাকেই তো আমরা খুঁজছিলাম। একেবারে হাতের মুঠোয় এসে পড়েছেন।'

বলেই পুলিশ অফিসারটি পকেট থেকে মোবাইল বের করে স্বগত কণ্ঠে বলল, 'আমাদের স্টেট-পুলিশপ্রধান এডমন্ড এড্রিস স্যারকে খবরটা জানাই।'

মোবাইলে কল করল পুলিশ অফিসার।

‘গুড ইভনিং স্যার। আমি হের হেস-এ উইসকারহেইম পুলিশ অফিসের ভারপ্রাপ্ত অফিসার।’

ওদিক থেকে কথা শুনে আবার সে বলল, ‘ধন্যবাদ স্যার। খবরটি হলো স্যার, স্টুটগার্টের ওপারে তিন পাহাড়ের উপত্যকায় যে পৈশাচিক গণহত্যার মত ঘটনা ঘটে, তার খুনিকে ধরে ফেলেছি স্যার, তার সাথের দু’জন পলাতকসহ। আমি..স্যরি! বলুন স্যার।’

ওপারের কথা শুনতে শুনতে সে আড় চোখে একবার আহমদ মুসার দিকে তাকাল। বলল, ‘স্যার, তাঁর নাম জিজ্ঞেস করিনি। তবে ব্রুমসারবার্গ থেকে পলাতক বাবা-মেয়ের নাম আলদুনি সেনফ্রিড ও ব্রুনা ব্রুনহিল্ড।’

আবার অনেকক্ষণ ধরে সে ওপারের কথা শুনল। মুখটা তার ধীরে ধীরে চুপসে গেল। মাথাটা একটু ঝুঁকে পড়ল। অবশেষে বলল, ‘ওকে স্যার। কিছুই আমার জানা ছিল না স্যার। স্যরি।’ থামল সে।

ওপার থেকে আবার কিছু কথা শুনল। তারপর বলল, ‘ঠিক আছে স্যার, আমি সব বুঝেছি। ধন্যবাদ স্যার।’

পুলিশ অফিসারটি কথা শেষ করেছে।

হাতের মোবাইলটি পকেটে ফেলে সে এগিয়ে এল আহমদ মুসার কাছে। নরম কণ্ঠে বলল, ‘স্যার! স্যরি, আপনার পরিচয় দেয়া উচিত ছিল। আপনি জার্মানির সম্মানিত মেহমান। একটা গুরুত্বপূর্ণ তদন্তে আপনি এসেছেন। এ কথা বললেই আর কিছু ঘটত না। ওয়েলকাম স্যার।’

‘ধন্যবাদ অফিসার। একটা কথা কি জানতে পারি?’ বলল আহমদ মুসা।

‘কি কথা বলুন স্যার?’ বলল পুলিশ অফিসার।

‘ব্রুনা ও তার পিতা আলদুনি সেনফ্রিডকে পলাতক বলছেন কেন?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

‘আমি বিষয়টির তেমন কিছু জানি না। ওদের দু’জনের ছবিসহ একটা সার্চনেট আছে আমাদের পুলিশ অফিসে।’ পুলিশ অফিসারটি বলল।

‘সার্চনেটে কোন অভিযোগের কথা আছে?’

বলল আহমদ মুসা।

‘বেশি কিছু নেই। ‘ব্রুমসারবার্গের ঐতিহ্যবাহী স্যাক্সন স্টেট দখলের ষড়যন্ত্র করছে মালিক মিসেস কারিনা কারলিনকে হত্যা করে’-এই বাক্যই শুধু লেখা আছে।’ পুলিশ অফিসার বলল।

‘অভিযোগ কে করেছিলেন?’ বলল আহমদ মুসা।

‘অভিযোগ কারিনা কারলিনের।’ পুলিশ অফিসার বলল।

‘আর একটা প্রশ্ন অফিসার।’ বলল আহমদ মুসা।

‘সিওর। বলুন।’ পুলিশ অফিসার বলল।

‘স্টুটগার্টের ওপারের থ্রি হিল উপত্যকায় যে ঘটনা ঘটেছে, তা আপনাদের জানিয়েছে কে? পুলিশ সূত্রে?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

পুলিশ অফিসারটি হাসল। বলল, ‘আপনি যা আশা করছেন, সেটাই ঠিক। আমরা অন্য সূত্রে জানতে পেরেছি। মাত্র কিছুক্ষণ আগে দু’জন লোক আমাদের পুলিশ অফিসে এসেছিল। তারাই খবরটা জানিয়েছে। তারা আপনাদের ধরার জন্যে আমাদের সাহায্য চায়।’ আপনারা এদিকে এসেছেন তাও জানায় ওরা।’ পুলিশ অফিসার বলল।

‘ওরা কি তাদের পরিচয় দিয়েছিল?’ আহমদ মুসার জিজ্ঞাসা।

‘আইডি কার্ড দেখিয়েছিল।’ পুলিশ অফিসার বলল।

‘প্লিজ অফিসার, বলবেন তাদের অ্যাড্রেস কি ছিল আইডি কার্ডে?’ বলল আহমদ মুসা।

‘ওরা দু’জনেই হামবুর্গের বাসিন্দা।’ পুলিশ অফিসার বলল।

‘হামবুর্গ!’ বলল আহমদ মুসা। তার চোখে-মুখে বিস্ময়। অনেকটা স্বগত কণ্ঠেই কথাগুলো বলল আহমদ মুসা।

মনে মনে ভাবল, কোথায় ব্রুমসারবার্গ, আর কোথায় হামবুর্গ।

‘হ্যাঁ, আপনি ঠিক বলেছেন স্যার।’

কথাটা শেষ করেই পুলিশ অফিসার বর-কনের পিতাকে লক্ষ করে বলল, ‘ঠিক আছে আপনারা চলে যান। আপনারা লিখিত একটা বিবরণ পাঠাবেন। আমরা একটা এফআইআর লিখে নিচ্ছি।

'ধন্যবাদ স্যার! আমাদের বাড়ির অনুষ্ঠান অন্তত পণ্ড হওয়া থেকে বাঁচবে। অনেক ধন্যবাদ স্যার।' বলল বরের বাবা।

'ধন্যবাদ আমাকে নয় জনাব, স্যারকে দিন। তাঁর উপস্থিতি আজ আপনাদের রক্ষা করেছে। ওরা কিন্তু আপনাদের বিরুদ্ধে আটঘাট বেঁধেই লেগেছিল।' পুলিশ অফিসার বলল।

বরের বাবা কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই আহমদ মুসা বলল, 'আল্লাহর জন্যেই সব প্রশংসা অফিসার। আপনাদেরকেও ধন্যবাদ সহযোগিতার জন্যে।'

আহমদ মুসার কথা শেষ হতেই বরের পিতা আহমদ মুসাকে বলল, 'স্যার, আমরা এখন যেতে পারি।'

'আপনারা গুরুজন, এভাবে 'স্যার, বলছেন কেন?'

বলল আহমদ মুসা। তার চোখে-মুখে অস্বস্তি।

'যার যতটুকু সম্মান তাকে তা দেয়া উচিত। আমরা আগে আপনাকে চিনতে পারিনি। থাক এ বিষয়। এবার যেতে পারি।' বলল বরের পিতা।

'জনাব একে চেনার অনেক বাকি আছে এখনও। আমার বস স্যার এডমন্ড ওর সম্পর্কে বললেন, কয়েক ডজন সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধান আছেন যারা ওর বন্ধু। খোদ মার্কিন প্রেসিডেন্ট তাকে সমীহ করেন, তার পরামর্শ ও সাহায্য নেন। আমাদের নায়ক কিংবদন্তী রবিনহুড, জেমস বন্ডের কীর্তিকলাপ ছিল এক দেশ বা এক জোনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। আর ওঁর কর্মক্ষেত্র গোটা বিশ্ব। দেখুন ওঁর সফরটা। সেই তাহিতি থেকে এসেছেন জার্মানিতে। জানি না, আপনারা ওঁকে ডেকেছেন কিনা। ওঁকে কিন্তু ডাকতে হয় না। যেখানে ওঁকে দরকার, সেখানেও তিনি দেবদূতের মত হাজির হন।'

থামল পুলিশ অফিসার।

বর-কনে, বর ও কনের পিতা, ব্রুনা, তার পিতা, সবাই আহমদ মুসার দিকে রাজ্যের বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে ছিল। পুলিশ অফিসারের কথা শেষ হতেই সবাই জার্মান ভংগিতে সামনে ঝুঁকে মাথা নুইয়ে বাও করল আহমদ মুসাকে।

বিব্রত আহমদ মুসা পুলিশ অফিসারকে বলল, 'আপনি আমার সম্পর্কে অযথাই বেশি বলেছেন।'

'আমার বস এডমন্ড এড্রিন আপনার সম্পর্কে যা বলেছেন, আমি তো তার সব কথা বলিনি। আপনি ফ্রান্স ও জার্মানিতেও...।'

পুলিশ অফিসার কথা শেষ করতে পারলো না। আহমদ মুসা তাকে থামিয়ে দিয়ে বরের পিতার উদ্দেশ্যে বলল, 'চলুন', আমরা গাড়িতে উঠি।' অনেক সময় ধরে কথা বলছি আমরা।'

বরের পিতা ব্যস্ত হয়ে উঠল। বলল, 'স্যার, আপনি, ম্যাডাম ব্রুনা ও তার পিতা বর-কনের গাড়িতে উঠুন। আমরাও গাড়িতে উঠছি।' বলল বরের পিতা।

বর ও কনে এগিয়ে এসে বলল, 'আমাদের পরম সৌভাগ্য, আসুন স্যার।'

আহমদ মুসা গাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করে বলল, 'গাড়ি কিন্তু আমি ড্রাইভ করব।'

'কেন স্যার, ড্রাইভার তো আছে।' বর বলল।

'তা আছে। কিন্তু কেন জানি আমার ড্রাইভ করতে ইচ্ছা করছে।' বলল আহমদ মুসা।

'ঠিক আছে স্যার। তাহলে ড্রাইভার অন্য গাড়িতে যাবে। আমি আপনার পাশে বসব স্যার।'

'কনে থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে?' বলল আহমদ মুসা।

'বলতে পারেন, কনে থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্যেই। কারণ আমাদের সমাজে বরের গাড়িতে যাবার সময় বর-কনে এক সঙ্গে বসে না। ভিন্ন গাড়িতে যায়।' বর বলল।

কিন্তু তোমার পিতা তো বর-কনে এক গাড়িতে ওঠার কথা বললেন।' বলল আহমদ মুসা।

'হতে পারে নিরাপত্তার কারণে। আপনাকেও বর-কনের গাড়িতেই উঠতে বলেছেন।' বর বলল।

'ঠিক আছে!' বলে আহমদ মুসা গাড়িতে উঠল।

সবাই উঠল গাড়িতে।

গাড়ি চলতে শুরু করল।

চারটি গাড়ি খুব দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছিল ফার্মল্যান্ডের প্রশস্ত রাস্তা ধরে।

সামনের গাড়িটি ছোট নাইন সিটার মাইক্রো।

পেছনের তিনটিই জীপ।

মাইক্রোতে সাতজন আরোহী। সবার হাতেই রিভলবার।

ড্রাইভিং সিটের পাশে কালো হ্যাট, কালো জ্যাকেট, কালো প্যান্ট পরা লোকটির হাতে ছিল মাইক্রো মেশিনগান।

মাইক্রোর অবশিষ্ট ছয়জনের দু'জন ছাড়া অন্যদেরও কালো হ্যাট ও কালো জ্যাকেট। পরনেও কালো প্যান্ট।

সামনের কালো পোষাকের লোকটি পাশে ড্রাইভিং সিটের লোকটিকে লক্ষ করে বলল, 'ওরা তো ঠিকই তিনজন ছিল?'

ড্রাইভিং সিটের লোকটির পরনে নীল প্যান্টের উপর সাদা জ্যাকেট। মাথা খালি। লম্বা চুল মাথায়। চেহারাটা নায়কের মত। কালো পোষাকধারীর প্রশ্নের জবাবে বলল লোকটি, 'অবশ্যই তিনজন। একজন বয়স্ক, একজন তরুণী ও অন্যজন যুবক। তরুণী ও বয়স্ক লোকটি জার্মান। যুবকটি এশিয়ান।

'গুলি করেছে শুধু এশিয়ান যুবকটাই তো?' জিজ্ঞাসা সামনে বসা সেই কালো পোষাকধারীর।

'হ্যাঁ। তরুণী ও বয়স্ক লোকটির কোন ভূমিকাই ছিল না।' বলল ড্রাইভিং সিটের লোকটি।

'ঠিক মিলে যাচ্ছে। আরেকটা কথা, তারা কোন দিক থেকে আসছিল, আপনারা কি খেয়াল করেছিলেন?' কালো পোষাকের সেই লোকটি বলল।

'দক্ষিণ থেকে তারা হেঁটে আসছিল।' বলল ড্রাইভিং সিটের লোকটি।

'হেঁটে আসছিল, গাড়িতে নয়?' কালো পোষাকধারী লোকটি বলল।

‘হ্যাঁ তাই।’ বলল ড্রাইভিং সিটের লোকটি।

কালো পোষাকধারী লোকটি খুশি হয়ে উঠল। বলল, ‘সব মিলে যাচ্ছে। নিশ্চয় তারা তাদের গাড়ি নদীতে ফেলে দেবার পর আর কোন গাড়ি পায়নি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। ওদেরকে এখন ওখানে পেলেই হয়।’

‘সময় বেশি যায়নি। আর পুলিশের সাথে আমাদের কথা হয়েছে। আমরা পুলিশকে জানিয়েছি। পুলিশ এতক্ষণে ঘটনাস্থলে পৌঁছে গেছে। ওরা কেউ চলে যেতে পারবে না।’ বলল ড্রাইভিং সিটের লোকটি।

‘আমাদের সাথেও পুলিশের যোগাযোগ আছে। ওরা গাড়ি ছেড়ে পালাবার পর আমরাও বিষয়টি পুলিশকে জানিয়েছি। তারাও ওদের পেলে ছাড়বে না।’ বলল কালো পোষাকধারী।

‘তাহলে তো আর চিন্তা নেই। আমরাও দ্রুতই চলছি।’ বলল ড্রাইভিং সিটে বসা লোকটি।

‘ধন্যবাদ। আপনাদের চাওয়া শুধু মেয়েটিকেই তো? পেয়ে যাচ্ছেন, চিন্তা নেই।’ কালো পোষাকধারী বলল।

‘এবার মেয়েটিকেই নয়, তার বাবা ও বরের বাবা ও সাথের অন্যদেরও চাই। শাস্তি দিতে চাই আমরা নিজ হাতে। আমাদের ছয় সাতজন লোক গুলিবিদ্ধ। অনেকে পঙ্গু, কারও কারও প্রাণ সংশয়ও হতে পারে। ওদের ছাড়া যাবে না।’ বলল ড্রাইভিং সিটের লোকটি।

গাড়ি তিনটি দ্রুত এগিয়ে চলছিল ফার্মল্যান্ডের প্রশস্ত রাস্তা ধরে।

হঠাৎ সামনের মাইক্রোটি হার্ডব্রেক কষল।

ড্রাইভিং সিটের লোকটির দৃষ্টি সামনের দিকে। সবাই সামনে তাকাল। সামনের সিটের কালো পোষাকের লোকটির দৃষ্টিও সেদিকে।

গাড়ির ব্রেক কষেই ড্রাইভিং সিটের লোকটি বলে উঠল, ‘সামনের তিনটি গাড়ি তো ওদেরই। ঐতো দু’টি ডেকোরেটেড গাড়ি। এই ডেকোরেশন করা গাড়িটি বেশ পরিচিত, কিছুক্ষণ আগেই দেখেছি। ঠিক ওরাই আসছে।’

কথাটা কানে যেতেই তার পাশের সিটের কালো পোষাকধারী লোকটি জানালার দিকে মুখ বাড়িয়ে তীক্ষ্ণ একটা শীষ দিল। তারপর লাফ দিয়ে গাড়ি থেকে নামল মেশিন রিভলবার হাতে নিয়ে।

পেছনের দু'টি গাড়িও থেমে গিয়েছিল।

শীষ দেয়ার সাথে সাথেই ছয় সাতজন কালো পোষাকধারী গাড়িগুলো থেকে নেমে এল।

সামনের কালো পোষাকধারী লোকটি গাড়ি থেকে নেমেই গুলি বৃষ্টি করতে করতে ছুটল সামনের গাড়ি তিনটির দিকে। কালো পোষাকের লোকগুলোও ছুটল সেদিকে।

কালো পোষাকের লোকটি মেশিন রিভলবার থেকে গুলি বৃষ্টি করতে করতে তিনটি গাড়ির প্রথমটির একেবারে কাছাকাছি চলে গিয়েছিল। গাড়িটির উইন্ড স্ক্রিনের সবটাই গুলিতে ভেঙে পড়েছিল। ভাবছিল তাদের অব্যাহত গুলি বৃষ্টির মধ্যে ওরা গুলি করতে সুযোগ পাচ্ছে না এবং পাবেও না।

কিন্তু হঠাৎ উইন্ড স্ক্রিন ও জানালা ভেঙে যাওয়া প্রথম গাড়িটি গর্জন করে উঠে স্টার্ট নিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়ল সামনের মেশিন রিভলবারধারী কালো পোষাকের লোকটির উপর। তাকে চাপা দিয়েই থেমে গেল গাড়িটি। তার পরেই রিভলবারের গর্জন। চোখের পলকে সামনের আরও চারটি কালো পোষাকধারী গুলিবিদ্ধ হয়ে মাটিতে ঢলে পড়ল। আরও দু'জন কালো পোষাকধারী অন্য পাশে ছিল। গুলি থেকে বাঁচার জন্য তারা মাটিতে শুয়ে পড়ে গড়িয়ে দ্রুত সরে এল এবং তাদের গাড়ির আড়ালে সরে গেল।

তাদের তিনটি গাড়িও দ্রুত ব্যাক ড্রাইভ করে পালাতে শুরু করল। কালো পোষাকের দু'জন লোকও কোন রকমে গাড়িতে উঠল। ড্রাইভিং সিটের সেই লোকটি স্বগত কণ্ঠে বলল, 'আমরা তো এদের ভরসাতেই এসেছিলাম। ওদের সাথে লড়াই করার অস্ত্র ওখানেই তো আমরা ফেলে রেখে এসেছি। ছুরি, চাকু দিয়ে তো ওদের সাথে লড়াই করা যায় না।'

গাড়ি তিনটি পালিয়ে যেতেই আহমদ মুসা উইন্ড স্ক্রিন উড়ে যাওয়া, জানালা ভাঙা গাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। তার পাশের বরও ততক্ষণে উঠে বসেছে। পেছনে বসা ব্রুনা, ব্রুনার বাবা ও কনেও উঠে বসেছে। তারাও বেরিয়ে এল।

পেছনের গাড়ি থেকে ছুটে এল বর-কনের বাবারা। তারা বর-কনের কাছে এসে শশব্যস্তে বলল, 'তোমরা সবাই ভালো আছ তো? স্যার, ভালো আছেন তো?'

'গাড়ির সামনের দিকে চেয়ে দেখ, স্যার ভালো না থাকলে একজনকে গাড়ি চাপা দিয়ে, আরও চারজনকে গুলি করে হত্যা করলেন কি করে?' বলল কনে ফ্রিজা।

বর-কনের বাবারা গাড়ির সামনে চাইল। দেখল গাড়ির সামনের চাকার তলে পিষ্ট মানুষের লাশ এবং দেখল সামনে পড়ে থাকা আরও চারজন গুলিবিদ্ধ লোকের লাশ।

তারা কোন কথা বলতে পারলো না। অবাক বিস্ময়ে তাদের বাকরুদ্ধ অবস্থা! ফ্যাল ফ্যালে দৃষ্টিতে একবার লাশগুলো আর একবার আহমদ মুসার দিকে তাকাতে লাগল।

আহমদ মুসা তখন লাশগুলোকে উল্টে পাল্টে পরীক্ষা করছিল।

'বাবা, মনে হয় কোন বিস্ময় দিয়েই আমরা তাঁর পরিমাপ করতে পারবো না। তিনি শুধু স্যার নন, আসলে তিনি ভগবানের পাঠানো দেবদূত! না হলে ঠিক সময়ে, ঠিক স্থানে আমরা তাকে পেলাম কি করে?' বলল কনে ফ্রিজা।

'ঠিক বলেছ ফ্রিজা। আমরাও তাঁকে আমাদের বিপদের সময় ঠিক এভাবেই তাকে পেয়েছি।' বলল ব্রুনা। বিস্ময় তার চোখে-মুখেও!

'সত্যিই দেবদূত তিনি। গড ব্লেস হিম! বর উইল ফ্রিড বলল।

'লাশগুলোতে উনি কি দেখছেন? চল, আমরা ওদিকে যাই।' বলল বরের বাবা।

সবাই ওদিকে চলল।

আহমদ মুসা কালো পোষাকধারী একজনের কলার ব্যান্ড পরীক্ষা করছিল।

ব্রুনারা, বর-কনেরা, তাদের বাবারা তার পেছনে গিয়ে দাঁড়াতেই আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। পেছনে ফিরে বর-কনের বাবাদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এরা তো আপনাদের প্রতিপক্ষ আগের লোক নয়?'

'না, এরা তারা নয়। কিন্তু এই গাড়িগুলোর মধ্যে সম্ভবত একটা গাড়ি সেই ঘটনাস্থলে দেখেছিলাম।' বলল কনের বাবা।

'তার মানে আপনাদের পরাজিত প্রতিদ্বন্দ্বীরা নতুন আক্রমণের জন্যে এই কালো পোষাকধারীদের হায়ার করে নিয়ে এসেছে।'

'সর্বনাশ! ওরা দেখা যাচ্ছে বিরাট ষড়যন্ত্র করেছিল। পুলিশ আমাদেরকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যেতে চেয়েছিল বর-কনে বাদে। আর ওরা আসছিল বরের কাছ থেকে কনেকে কেড়ে নিতে।' বলল বরের পিতা।

'যাক, আল্লাহ রক্ষা করেছেন। এখন একটা কথা বলুন, 'ব্ল্যাক লাইট' নামে কোন সংস্থার নাম কি আপনারা জানেন?'

এ কথা বলে আহমদ মুসা একজন কালো পোষাকধারীর লাশের উপর ঝুঁকে পড়ে জ্যাকেটের কলার ব্যান্ড উল্টিয়ে পাতলা সাদা প্লাস্টিক প্লেটের উপর কালো একটা ফ্রেম দেখালো এবং তার নিচে দশটা রোমান বর্ণ দেখালো। দুই গুচ্ছে বা শব্দে লেখা। বলল, 'শব্দ দু'টির কোন অর্থ হয় না। কিন্তু শব্দ দু'টিকে সমান্তরাল দিকে উল্টে দিলে মানে শেষটা শুরুতে এবং শুরুটা শেষে নিয়ে আসলে শব্দ দু'টির অর্থ দাঁড়ায় ব্ল্যাক লাইট (Black Light)। ব্ল্যাক লাইট কালো ফ্রেম সিম্বলের সাথে মিলে যায়। এ অঞ্চলে কি 'ব্ল্যাক লাইট' নামে কোন সংগঠন আছে?'

'না, এমন নামের কোন সংস্থা আছে বলে আমরা জানি না। এরা কি কোন সংগঠনের লোক?' বলল বরের বাবা।

'এখনও আমি সঠিক জানি না। তবে মনে হচ্ছে কোন না কোন সংগঠনের লোক এরা।' আহমদ মুসা বলল।

আহমদ মুসার দিকে আগ্রহের সাথে তাকিয়ে ছিল ব্রুনা। তার চোখে কিছুটা বিস্ময় ও উদ্বেগ। কিছু যেন সে বলতে চায় আহমদ মুসাকে। কিন্তু কিছুই বলল না সে।

আহমদ মুসা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বর-কনের বাবাকে বলল, 'আপনারা পুলিশকে এ বিষয়টা জানান। ঘটনা রেকর্ড হওয়া ও লাশগুলো তাদের জিম্মায় নেয়া দরকার।'

'ঠিক বলেছেন স্যার। এটা খুব জরুরি।' বলল বরের বাবা।

বর-কনের বাবা যখন পুলিশকে টেলিফোন করতে উদ্যোগ নিচ্ছিল, সে সময় আহমদ মুসা একটু সরে পকেট থেকে মোবাইল বের করে।

ব্রুনাও পিছু নিল আহমদ মুসার।

ব্রুনা আহমদ মুসার পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই আহমদ মুসা বলল, 'তুমি নিশ্চয় আমাকে কিছু বলবে?'

'ধন্যবাদ স্যার, আপনি ঠিক বুঝেছেন।' বলল ব্রুনা।

'বল কি জান তুমি 'ব্ল্যাক লাইট' সম্পর্কে?' আহমদ মুসা বলল।

'বিষয়টা এই ব্ল্যাক লাইটের ব্যাপার কিনা আমি জানি না। কিন্তু ব্ল্যাক লাইটের এই রকম ইগসিগনিয়া ও এই নাম আরও এক জায়গায় দেখেছি।' বলল ব্রুনা।

'কোথায় দেখেছ?' আহমদ মুসা বলল।

'মায়ের পারসে পেয়েছিলাম।' বলল ব্রুনা।

'যে মায়ের সাথে তোমাদের বিরোধ হয়েছে, সেই মায়ের?' আহমদ মুসা বলল।

'হ্যাঁ, অবশ্যই। কিন্তু স্যার, যে মা বলছেন কেন? আমাদের আরও কোন মা আছে?' বলল ব্রুনা।

'এ প্রশ্নের উত্তর ভবিষ্যতের জন্যে তোলা রইল। এখন বল, তোমার মায়ের হ্যান্ডব্যাগে কি পেয়েছিলে?' আহমদ মুসা বলল।

'সেদিন সে সময়ে মা টয়লেটে ছিলেন। গোসল করতে বাথরুমে গিয়েছিলেন। গোসলে মা অনেক সময় নেন। আমি মায়ের ঘরে গিয়েছিলাম মায়ের আইডি কার্ডের নাম্বার নেয়ার জন্যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা ডকুমেন্টে রেফারেন্স দেয়ার প্রয়োজন ছিল। মা টয়লেটে জেনে ফিরে আসছিলাম। হঠাৎ দেখলাম মায়ের বালিশের তলায় তাঁর পারসের একাংশ দেখা যাচ্ছে। মায়ের

পারসেই তার আইডি থাকে। অপেক্ষা করার কোন উপায় ছিল না বলে মায়ের পারস বের করে তা খুলে তার আইডি কার্ডের নাম্বার নিলাম। কার্ড রাখতে গিয়ে ছোট্ট একটা চিরকুট দেখলাম। চিরকুটটির কালো ফ্রেম ও তার নিচের লেখাটাই আমার দৃষ্টি কেড়েছিল। মনে করলাম মনোগ্রামটা কিসের দেখি তো। চিরকুট হাতে নিলাম। কিন্তু কোন সংস্থার নাম পেলাম না। ফ্রেমের নিচের দুই শব্দ থেকে কিছু বুঝলাম না। ভেবে নিলাম কোন কোম্পানীর উদ্ভট কোন নাম হবে।' বলল ব্রুনা।

'চিরকুটটিতে কি ছিল?' আগ্রহের সাথে জিজ্ঞাসা করল আহমদ মুসা।

'একটা ফিংগার প্রিন্ট ছিল। আর ছিল দু'লাইন লেখা। কিন্তু লেখা রোমান হরফে হলেও পড়তে পারিনি। আমার পরিচিত কোন ভাষা নয়। হয়তো ব্ল্যাক ফ্রেমের নিচের লেখার মতই সাংকেতিক কিছু হতে পারে।' বলল ব্রুনা।

আহমদ মুসার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বলল, 'ধন্যবাদ ব্রুনা।'

'ধন্যবাদ কেন?' বলল ব্রুনা।

'কারণ তুমি আমার সামনের অন্ধকার পথের কিছুটা আলোকিত করেছ।' আহমদ মুসা বলল।

'কেমন করে?' বলল ব্রুনা। তার চোখে-মুখে বিস্ময়!

'সবই জানবে। তবে এটুকু জেনে রাখ, এ কালো পোষাকধারীরাই হেলিকপ্টারে আমাদের পিছু নিয়েছিল। আর তোমার কথায় প্রমাণিত হলো, তোমাদের সব ঘটনার মূলে রয়েছে এরাই। আহমদ মুসা বলল।

'মানে 'ব্ল্যাক লাইট' নামের সংগঠন?' বলল ব্রুনা।

'হতেও পারে, আবার এটা পুরো সত্য নাও হতে পারে। হতে পারে এরাই মূল প্রতিপক্ষ অথবা তাদেরকে কেউ কাজেও লাগাতে পারে।' আহমদ মুসা বলল।

বর-কনের বাবারা আহমদ মুসার দিকে এগিয়ে আসছিল। আহমদ মুসা তাদের দিকে ঘুরে দাঁড়াল।

বরের বাবা আহমদ মুসার কাছে এসে দাঁড়িয়েই বলল, 'স্যার, পুলিশ আসছে। আমি সব তাদের জানিয়েছি। আগের সেই পুলিশ অফিসারের সাথেই কথা হলো। তিনিই আসছেন।'

'ভালোই হলো। কথা বেশি বলতে হবে না।' আহমদ মুসা বলল।

'স্যার, একটা কথা বলতে ইচ্ছা করছে।' বলল বর। বর ও কনে আহমদ মুসার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

'বলে ফেল।' আহমদ মুসা বলল।

'ওদের গুলি বর্ষণ শুরু হলে ভাবছিলাম, আমরা শেষ হয়ে যাচ্ছি, মৃত্যু এখন মাথার উপর। সবাইকে গাড়ির ফ্লোরে শুয়ে পড়তে বলে আপনিও শুয়ে পড়েছিলেন। তার পরেই গুলি শুরু হয়। কিন্তু আপনি কি করে গাড়ি চালিয়ে লোকটিকে চাপা দিলেন এবং চারজনকে মারলেন?' বলল বর উইলফ্রিড।

'কেন তুমি তো আমার পাশেই ছিলে, দেখনি?' আহমদ মুসা বলল।

'আমি তো শুয়েই চোখ বন্ধ করেছিলাম। ভেবেছিলাম কিভাবে মরছি তা না দেখাই ভালো।' বলল বর।

আহমদ মুসা হাসল।

'জানার কৌতুহল আমাদেরও। প্লিজ বলুন স্যার।' বলল কনে ফ্রিজা।

'বলার তেমন কিছু নেই। আমি আধ শোয়া হয়ে মেশিন রিভলবারের শব্দ লক্ষে গাড়ি চালিয়েছিলাম আকস্মিকভাবে। তার রিভলবারের গুলি বৃষ্টি বন্ধ করার এটাই ছিল সবচেয়ে নিরাপদ ও সহজ পথ। এই ঘটনায় অবশিষ্ট রিভলবারধারীরা মুহূর্তের জন্যে হতচকিত হয়ে পড়েছিল। সেই সুযোগে আমি ওদের আমার রিভলবারের শিকার বানিয়েছিলাম।' আহমদ মুসা বলল।

'কথার কথা বলছি, ধরুন, আপনার এই চেষ্টা যদি কাজে না আসত, তাহলে কি করতেন?' বলল বর।

'ব্যর্থতা নিশ্চয় আরেক সুযোগের দ্বার খুলে দিত। কথায় আছে, যত পথ, তত খোলা মানে তত বিকল্প পথ থাকা। বিপদ যিনি দেন, বিপদ উত্তরণের পথও তিনি রাখেন।' আহমদ মুসা বলল।

'কিন্তু বিপদে কি এত কথা মনে থাকে?' বলল বর।

'আল্লাহ মনে করিয়ে দেন মানে কি করণীয় সেটা আল্লাহ মাথায় এনে দেন।' আহমদ মুসা বলল।

'এটা কিন্তু ধর্মবিশ্বাসীদের একটা কথা স্যার। এটা কি আসলেই ঘটে স্যার?' বলল ব্রুনা।

'জ্ঞান উৎকর্ষ লাভ করার পর এটা কিন্তু এখন মাত্র ধর্মবিশ্বাসীদের কথা নয়। আধুনিক সভ্যতার বিবেক যাকে বলা হয় সেই আর্নল্ড টোয়েনবি বলেছেন যে, আবিষ্কার, উদ্ভাবন, কাব্য-মহাকাব্য, গল্প-উপন্যাসের মত কোন মৌলিক সৃষ্টিই স্রষ্টার অনুপ্রেরণা ছাড়া হয় না। আর্নল্ড টোয়েনবি বিশ্বাসীদের পুরাতন কথাকেই তো নতুন করে বলেছেন।' আহমদ মুসা বলল।

'ধন্যবাদ স্যার। কিন্তু স্রষ্টার অনুপ্রেরণা মানুষের কাছে কিভাবে আসে?' বলল কনে।

'মানুষের মাথায় নতুন চিন্তার আকারে আসে। একে মুসলিম পরিভাষায় 'ইলহাম' বলে। আহমদ মুসা বলল।

পুলিশের গাড়ির সাইরেন শুনা গেল। সবাই সেদিকে তাকাল।

'চলুন, আমরা গাড়ির ওদিকে যাই।' বর-কনের বাবার দিকে তাকিয়ে বলল আহমদ মুসা।

সবাই গাড়ির দিকে চলল।

বৌভাতের মূল অনুষ্ঠান শেষ।

ভাঙা আসরে এখানে-সেখানে গল্পের আসর বসেছে। বর-কনেকে কেন্দ্র করে বসেছে বরের বাবা, কনের বাবা, এলাকার কয়েকজন সমাজপতি এবং বরের বাড়িতে বিয়ের চুড়ান্ত অনুমোদনের জন্যে আসা ধর্মীয় নেতা হের হেনরি। তাদের সাথে ছিল ব্রুনা ও তার বাবা আলুদনি সেনফ্রিড।

তাদের গল্প-কথার নানা বিষয়ের মধ্যে ধর্মনেতা হের হেনরি বলে উঠল, 'আপনাদের অতিথি আহমদ মুসা কোথায়?'

কথাটা বলল সে বরের পিতাকে লক্ষ করে।

'বন থেকে একজন পুলিশ অফিসার এসেছেন, তার সাথে কথা বলতে গেছেন।' বলল বরের বাবা।

'আমি বিস্মিত হয়েছি তার প্রার্থনার ধরন দেখে। ভোরে আমি তার ঘরের পাশ দিয়ে যাবার সময় দেখলাম তিনি ফ্লোরে কার্পেটের উপর তোয়ালে বিছিয়ে প্রার্থনা করছেন। আবার বিকেলে দেখলাম বাগানে ঘাসের উপর দাঁড়িয়ে, বসে ও মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রার্থনা করছেন। মুসলমানরা শুধু মসজিদে প্রার্থনা করে, কিন্তু এমনটা তো দেখিনি। এটা দেখে আমাদের অতীতের কথা আমার মনে পড়ে গেছে। আমাদের আদি স্যাক্সন সমাজে যখন আমরা বাস করতাম নিরপদ্রপে ও স্বাধীনভাবে রাইনের ভাটি অঞ্চলে এবং আরও উত্তরে, তখন ব্যক্তিগত প্রার্থনা এভাবেই হতো। সামাজিক প্রার্থনার জন্যে প্রার্থনাগৃহ...।'

কথা শেষ না করেই থেমে গেল স্যাক্সনদের এ অঞ্চলের ধর্মনেতা হের হেনরি।

আহমদ মুসা এ সময় সেখানে এল। বর-কনের বাবাসহ কয়েকজন উঠে দাঁড়িয়ে স্বাগত জানিয়ে আহমদ মুসাকে সেখানে বসালো। হের হেনরি এ সময় তার কথা বন্ধ করে থেমে গেল।

আহমদ মুসা বসলে হের হেনরি বলল, 'জনাব, আপনার কথাই আমরা বলছিলাম। আমি বলছিলাম যে, বিকালে বাগানে ঘাসের উপর দাঁড়িয়ে আপনার প্রার্থনা দেখে আমার অতীতের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। জার্মানির স্যাক্সনরা আদিতে এভাবে ব্যক্তিগত প্রার্থনা যত্রতত্র করত। সামাজিকভাবে প্রার্থনার জন্যে প্রার্থনা গৃহ অবশ্যই ছিল। আমাদের পণ্ডিতরা বলেন, এটাই ছিল আমাদের বিশ্বাসের স্বাধীন ও স্বর্ণযুগ।'

'সে স্বর্ণযুগ আপনাদের উল্লেখ করার মত আর কি ছিল?' বলল আহমদ মুসা। তার চোখে কিছুটা বিস্ময়।

'আমাদের সমাজ ছিল গণতান্ত্রিক। প্রত্যেক মানুষের অধিকার ছিল সর্বোচ্চ। সরকার নামের প্রশাসন কর্তৃপক্ষের ভূমিকা খুবই গৌণ ছিল। একমাত্র যুদ্ধাবস্থাতেই সরকার বা শাসক কর্তৃপক্ষের ভূমিকা সবার উপরে উঠতো, এমনকি

যুদ্ধের সময় এলেই 'ডাচি' বা 'রাজা' নির্বাচিত হতেন। শান্তির সময়ও নির্বাচন হতো, কিন্তু যুদ্ধের সময় একে আবশ্যক মনে করা হতো। জাতির জন্যে জাতির ইচ্ছাকে সঠিকভাবে প্রতিফলিত করার জন্যেই এই ব্যবস্থা।' বলল অঞ্চলের ধর্মগুরু হের হেনরি।

'এই স্বর্ণযুগ আপনাদের কোন সময় পর্যন্ত ছিল?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

'অষ্টম শতাব্দীর সমাপ্তির (৭৯৩ খৃস্টাব্দ) মুখে রোম সম্রাট শার্লেম্যান আমাদের এলাকা দখল করার পূর্ব পর্যন্ত। শার্লেম্যানরা শুধু রাজনৈতিকভাবে আমাদের দেশই দখল করলো না, ক্রমান্বয়ে তারা আমাদের ভাষা, আমাদের ধর্ম, আমাদের প্রার্থনাগৃহ, আমাদের সংস্কৃতি সবই ধ্বংস করে ফেলে। শক্তির জোরে খৃস্টধর্মবিশ্বাস আমাদের উপর চাপিয়ে দেয়।' বলল হের হেনরি।

আহমদ মুসার চোখ দু'টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, 'জানেন, ঠিক এই সময়েই ইসলামী সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল এশিয়ায় ও আরব অঞ্চলে। আপনাদের সেই স্বর্ণযুগের সাথে ইসলামের অদ্ভুত মিল আছে। ইসলামে ব্যক্তির অধিকারকে সর্বোচ্চ মূল্য দেয়া হয়েছে। সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তির ন্যায্য অধিকার যদি সমুন্নত হয়, তাহলে তাদের নিয়ে গঠিত সমাজ ন্যায়ভিত্তিক হয়ে থাকে, রাষ্ট্রও তখন জনকল্যাণমূলক হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু ব্যক্তির অধিকার নিশ্চিত করার পর আমাদের ধর্ম ইসলাম সামষ্টিক স্বার্থ, সমাজের স্বার্থ, দেশের স্বার্থ দেখার জন্যে, সামষ্টিকের শক্তি দিয়ে ব্যক্তির অন্যায়কে নিয়ন্ত্রিত করার জন্যে সরকার ব্যবস্থাকেও অপরিহার্য মনে করে। ইসলামেও সরকার জনমতের ভিত্তিতেই নির্বাচিত হয়।'

স্যাক্সনদের ধর্মনেতা হের হেনরির চোখে বিস্ময়! বলল, 'আপনি যেমন প্রার্থনা করলেন, এর বৈশিষ্ট্যের সাথে আমাদের সেকালের প্রার্থনার অনেক মিল ছিল। তাহলে দেখছি আমাদের সমাজ-সংস্কৃতির সাথে আপনার সমাজ-সংস্কৃতির চমৎকার মিল আছে। মুসলমানদের আমরা দেখি, কিন্তু ইসলামের এই রূপ সম্পর্কে তো আমরা কিছু জানি না। ঠিক কোন সময়ে এই সভ্যতার শুরু হয়?'

‘ছয়শ তেইশ সালের দিকে, যখন ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ স. মদিনায় ইসলামের মানবিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করেন।’ আহমদ মুসা বলল।

‘আমাদের সভ্যতাও একদম সমসাময়িক। কিন্তু কোন যোগাযোগ ছিল বলে মনে হয় না। তাহলে এই মিল হলো কি করে?’ বলল হের হেনরি।

‘ঠিক জানি না, তবে আপনাদের স্যাক্সনদের এই ট্রেডিশন আরও অতীত থেকে এসেছে। হতে পারে স্যাক্সনদের কাছে অথবা অন্য নামের আপনাদের কোন পূর্বপুরুষদের কাছে আমাদের রসূল স.-এর মতই কোন রসূল এসেছিলেন হয়তো। তার শিক্ষাই স্যাক্সনদের ‘গোল্ডেন এজ’ যা এখন পর্যন্ত চলে আসছে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘কিন্তু স্যার, আপনি যেমনটা বললেন, সে রকম রসূলকে অর্থাৎ যিশুকে, তো খৃস্টানরাও মানে! কিন্তু তাদের মধ্যে তো জনগণের এমন অধিকার মানা হয় না এবং তাদের প্রার্থনাও তো নিরাকারের না হয়ে যিশুর মূর্তিকে সামনে রেখে করা হয়?’ বলল স্যাক্সনদের আঞ্চলিক সরদার সাব-কাউন্সিলের ডিপুটি ডিউক অসওয়াল্ড।

আহমদ মুসা একটু গম্ভীর হলো। বলল, ‘দুর্ভাগ্য যে, যিশুর মূর্তি গড়া হয়েছে, যিশুর শিক্ষার চেয়ে যিশুর ক্রুসিফাইড করাকে যেমন বড় দেখানো হচ্ছে, তাকে যেমন ঈশ্বরের সন্তান বানিয়ে তাকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে, ঠিক তেমনি তাঁর ঐশী গ্রন্থ ‘ইঞ্জিল’ (যাকে ‘বাইবেল’ বলা হয়)-কে সঠিকরূপে রাখা হয়নি, বিকৃত করা হয়েছে। এ কারণেই সমাজ-সভ্যতার দিক থেকে আমাদের সাথে তাদের মিল নেই, যে মিল আপনাদের সাথে আমাদের আছে।’

‘ধন্যবাদ স্যার, অল্প কথায় সাংঘাতিক একটা বিষয় আমাদের বুঝিয়েছেন। ধন্যবাদ আপনাকে। আমাদের ধর্মগুরু মহোদয় বলেছেন, রোমানরা আমাদের বিশ্বাস, ইতিহাস, সাহিত্য-সংস্কৃতি সবই ধ্বংস করেছে। আমি একটু যোগ করে বলতে চাই, এমনকি ওরা আমাদের বিল্ডিং-এর স্ট্রাকচারও বদলে দিয়েছে। আগে প্রার্থনাগৃহসহ আমাদের গুরুত্বপূর্ণ বিল্ডিংগুলোতে উর্ধ্বমুখী উঁচু স্তম্ভ বা মিনার থাকত। রোমান সভ্যতা মিনারগুলো গুঁড়িয়ে দেয় এবং নিষিদ্ধ করে দেয় মিনার নির্মাণ। এই কথা বলা আমি এ জন্যেই প্রয়োজনীয় মনে করলাম যে,

এই ধরনের মিনার নির্মাণের ঐতিহ্য মুসলমানদের রয়েছে। তাদের প্রার্থনাগৃহের জন্যে মিনার প্রধান অলংকার। এদিন দিয়েও স্যাক্সনদের ট্রেডিশনের সাথে মুসলমানদের মিল আছে।' বলল বর উইলফ্রিড।

'ঠিক বলেছ। আমিও বিষয়টা খেয়াল করেছি।' বলল স্যাক্সনদের আঞ্চলিক ধর্মগুরু বা যাজক হের হেনরি।

'কিন্তু এই অদ্ভুত মিলের কারণ আসলে কি? ব্যাপক যোগাযোগ কিংবা গোড়ায় এক না হলে এই মিল সম্ভব নয়। সকলেরই জানা এমন ব্যাপক যোগাযোগ কখনো হয়নি, সম্ভবও ছিল না। তাহলে গোড়াটা কি?' কনে ফ্রিজা বলল।

'গোড়া অবশ্যই আল্লাহ। আমি যেটা বলেছি, যুগে যুগে আল্লাহ পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির কাছে রসূল বা বাণীবাহক পাঠিয়েছেন। যুগের চাহিদাসম্মত বিধি-বিধান বাদ দিলে তাদের সকলের শিক্ষা-সংস্কৃতি ও জীবন-কাঠামো একই হয়ে থাকে। কিন্তু একটা কথা আমি ভাবছি মি. হের হেনরি, আমি জানতাম স্যাক্সনরা সবাই স্বেচ্ছায় অথবা বাধ্য হয়ে খৃস্ট ধর্ম গ্রহণ করেছে। কিন্তু এখন দেখছি, আপনারা নিজেদের বাঁচিয়ে রেখেছেন। এখন আপনাদের সংখ্যা কেমন হবে?' আহমদ মুসা বলল।

'সম্রাট শার্লেম্যানের শুরু করা খৃস্টান রোমকদের খৃস্টীয় করনের এক মর্মন্তুদ কাহিনী সেটা। সুন্দর নদী রাইনের ভাটি অঞ্চলে স্বাধীনচেতা ও ঐতিহ্যবাহী স্যাক্সনদের সমৃদ্ধ জনপদ বিরান করে দেয়া হয়। যারা খৃস্টধর্ম গ্রহণ না করেছে তাদের বাঁচতে দেয়া হয়নি। এরপরও পালিয়ে নিজের বিশ্বাস ও ঐতিহ্য রক্ষা করেছে অনেকেই। সুযোগ-সন্ধানী ধনিক ও ক্ষমতালিপ্সুরা দল বেঁধে রোমকদের তাবেদারি ও খৃস্টধর্ম গ্রহণ করলেও সাধারণ মানুষদের অনেকেই নিজেদের ধর্ম ও সমাজ নিয়ে পালিয়ে আত্মরক্ষা করে। আমরা সেই সাহসী ও স্বাধীনচেতা মানুষদেরই উত্তর পুরুষ। সংখ্যা আমাদের এখন কম নয়। কিন্তু সংখ্যা বড় কথা নয়, এ মানুষের সংখ্যা কম হলেও এরা একেকজন একেকটা করে পর্বতের মত বড় মাপের।' বলল হের হেনরি।

‘হ্যাঁ মি. হেনরি, এই মর্মান্তিক ইতিহাসের ছিটে-ফোঁটা আমরা ইতিহাসে পড়েছি। বিস্তারিতটা সাধারণ ইতিহাসে নেই। তবে বিজয়ী খৃস্টানদের খৃস্টীয় করণের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা আমাদেরও রয়েছে। স্পেনে যখন তারা বিজয়ী হলো, তখন স্যাক্সনদের মতই মুসলমানদের বাঁচতে দেয়া হয়নি খৃস্টধর্ম গ্রহণ না করলে। অথচ মুসলিম বিজয়ের সময়ে কিংবা মুসলিম শাসনের অধীনে স্পেনে খৃস্টানরাসহ সব ধর্মের মানুষ সকল নাগরিক অধিকার ভোগ করেছে। জেরুসালেমে খৃস্টানরা তাদের বিজয়ের পর ৭০ হাজার মুসলিম নাগরিককে হত্যা করে। তাদের ঘোড়ার হাঁটু পর্যন্ত ডুবে যায় মানুষের রক্তে। কিন্তু মুসলমানরা জেরুসালেম বিজয়ের পর একজন খৃস্টান নাগরিককেও হত্যা করেনি। আপনাদের কথা শুনে আমাদের এই অতীত মনে পড়ে গেল।’ আহমদ মুসা বলল।

‘অদ্ভুত ব্যাপার, মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রেও সাদৃশ্য আছে এই দুই জাতির মধ্যে!’ বলল ফ্রিজা।

‘স্থান-কাল-পাত্রভেদে জালিমদের রূপ বদলায়, কাজ বদলায় না। একটা কথা, স্যাক্সনদের মধ্যে আপনাদের মত যারা তারা এমন বিশেষ অঞ্চলে বাস করেছেন?’ হের হেনরিকে লক্ষ্য করে বলল আহমদ মুসা।

‘বিশেষ অঞ্চল ঠিক আছে। কিন্তু এক অঞ্চলে নয়। কয়েকটি বিশেষ অঞ্চলে আমরা বাস করছি। সেটা রাইনের ভাটি অঞ্চলেই। তবে তীর থেকে অনেক ভিতরে। অবশ্য ব্রুমসারবার্গের মত শহরাঞ্চলে আমাদের স্যাক্সনরা আত্মগোপন করে ছোটখাট চাকরি, শ্রমিকের কাজ করে যাচ্ছে।’

‘আপনাদের এই হিজরত বা স্থানান্তর কখন, কিভাবে হয়?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

‘এই স্থানান্তর হয়েছে শার্লেম্যানের আক্রমণ থেকে পরবর্তী চল্লিশ-পঞ্চাশ বছরে। ধীরে ধীরে, গোপনে। আমরা সরে গেছি ওদের দৃষ্টির ফোকাস থেকে বেশ দূরে। সে সময় এ অঞ্চলগুলোতে ছিল জংগল ও অকৃষিযোগ্য জমি। তাই মানুষের বসবাসও ছিল না। তাই এ অঞ্চলগুলো ছিল আমাদের জন্যে নিরাপদ আশ্রয়।’ বলল হের হেনরি।

'আপনারা যারা বিভিন্ন অঞ্চলে বাস করছেন, তাদের মধ্যে যোগাযোগ ও সংহতি কেমন আছে?' আহমদ মুসা বলল।

'আমরা সকলেই একক এক সামাজিক ও ধর্মীয় ব্যবস্থার অধীন। এমনকি বিভিন্ন শহরাঞ্চলে আত্মগোপন করে বিচ্ছিন্নভাবে যারা কাজ করছে, তারাও এই একই ব্যবস্থার অধীন।' বলল হের হেনরি।

মুহূর্তের জন্যে থেমেই আবার বলে উঠল হের হেনরি, 'শুনলাম আপনারা যাচ্ছেন ব্রুমসারবার্গে। ওখানেও কিছু স্যাক্সন আছে। তাদের অধিকাংশই ট্যাক্সি ড্রাইভার, তবে দারোয়ান ও সেলসম্যানের কাজ করে অনেকে। ওরাও আমাদের সমাজের অংশ।'

'খুব ভালো চাকরি করে। আমাদের জন্যে এই সার্ভিসগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ।' আহমদ মুসা বলল।

'আপনাদের কাজে আসবে?' বলল হের হেনরি।

'জানি না। তবে যে কোন অনুসন্ধানের সব ক্ষেত্রেই এ ধরনের সার্ভিস কাজে লাগে।' আহমদ মুসা বলল।

'ঠিক আছে। আমরা আপনাদের কথা ওদের জানাব।' বলল হের হেনরি।

'ধন্যবাদ। একটা কথা, আপনারা শুধুই আত্মরক্ষা করছেন, না কোন মিশনও আপনাদের আছে?' আহমদ মুসা বলল।

'মিশন কিনা জানি না। তবে আমরা চাই, জার্মানি তার নিজের সত্তাকে খুঁজে পাক। আমরা জার্মানির বিশ্বাসের সে সত্তাকে ধরে রেখেছি এবং ব্যক্তিস্বাধীনতা ও গণতন্ত্র নামের সামাজিক সে শক্তিকেও আমরা রক্ষা করার চেষ্টা করছি। ব্যক্তি স্বার্থ ও সামষ্টিক স্বার্থের ভারসাম্য বিধান স্যাক্সন জার্মানির সবচেয়ে বড় সম্পদ।' বলল হের হেনরি।

'ধন্যবাদ। দেশপ্রেমিকরা যা করে, সেটাই আপনারা করছেন।' আহমদ মুসা বলল।

'মাঝখানে একটু কথা বলতে চাই, মাফ করবেন আমাকে।' বলল বরের বাবা বার্টওয়াল্ড।

সবাই তাকাল বরের বাবার দিকে।

বরের বাবা বলল, 'রীতি অনুসারে এখনি কনে ও বরকে কনের বাড়িতে যাত্রা করতে হবে। অনুষ্ঠান শেষ করে আবার কথা বলব। আমি আপনাদের অনুমতি চাই।'

'অবশ্যই অবশ্যই। ওটাই তো এখন মূল কাজ। গল্প তো আমাদের অবসরের বিনোদন।' বলল হের হেনরি।

বলে উঠে দাঁড়াল হের হেনরি। সবাই উঠল। আহমদ মুসাও।

ব্ল্যাক লাইটের অপারেশন কক্ষ।

ব্ল্যাক লাইট সংগঠনেরা অপারেশন চীফ 'ব্ল্যাক বার্ড' অর্ধ ডিম্বাকৃতি টেবিলের ওপাশে বিরাট সুশোভিত চেয়ারে বসে আছে।

তার শরীরটা যথারীতি কালো পোষাকে ঢাকা। মাথায় কালো হ্যাট, মুখে কালো মুখোশ।

তার সামনে টেবিলের এ পাশে দু'জন বসে। একজন ব্ল্যাক লাইটের অপারেশন চীফ ডরিন ডুগান এবং অন্যজন সিচুয়েশন এ্যানালিস্ট ও উপদেষ্টা গেরারড গারভিন।

ব্ল্যাক বার্ডের মুখ দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু অপর দু'জনের মুখে আষাঢ়ে মেঘের অন্ধকার।

কথা বলছিল ব্ল্যাক বার্ড। বলছিল, 'এভাবে আমাদের শান্ত সমুদ্রে প্রচণ্ড ঝড় উঠেছে তা দেখছ। বাঘের ঘরে এক ঘোগ এসে জুটেছে। ঘোগকে আটকাবার সব চেষ্টা এ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছে। শুধু ব্যর্থ নয়, সব চেষ্টায় পাল্টা আঘাতে আমাদের মূল্যবান লোকদের জীবনহানি ঘটেছে। সালজবার্গ থেকে শুরু করে বাদেন ল্যান্ডের দু'টি ঘটনা পর্যন্ত আমাদের কার্যকর শক্তির একটা মূল্যবান অংশ হারিয়েছি। এটা মেনে নেবার মত নয়। কে এই ঘোগ? এর হাতে আমরা এমনভাবে মার খাচ্ছি কেন? আপনাদের কাছ থেকে অর্থবহ কিছু শুনতে চাই।' থামল ব্ল্যাক বার্ড।

দু'জন মাথা নিচু করে শুনছিল।

সংগে সংগেই কথা বলল না তাদের দু'জনের কেউ।

মুহূর্ত কয়েক পরে মাথা তুলল সিচুয়েশন এ্যানালিস্ট ও উপদেষ্টা গেরারড গারভিন। বলল, 'স্যার, অতীত বাদ দিয়ে আমাদের সামনে তাকানো দরকার। অতীতকে সামনে আনলে আমরা দুর্বলই হয়ে পড়ব। লোকটি যেই হোক, অজেয় নয় অবশ্যই। আমার মনে হচ্ছে লোকটি দারুণ ধড়িবাজ আর চালাক। সে আহমদ মুসার নাম নিয়ে শখের গোয়েন্দাগিরির পাসপোর্ট নিয়ে একটা তদন্তে জার্মানি এসেছে। কি তদন্ত জানা যায়নি। তবে এই পরিচয় তার একটা মুখোশ। এ পর্যন্ত...।'

গেরারড গারভিনের কথার মাঝখানেই ব্ল্যাক বার্ড বলে উঠল, 'কেন সে কি আহমদ মুসা হতে পারে না?'

'কোথায় তাল, আর কোথায় তিল? আহমদ মুসা কি কাজে এখানে আসবে? সে রাজা-বাদশা, প্রেসিডেন্ট, প্রধান মন্ত্রীর বড় বড় মিশনে কাজ করে।

আসলে তার নাম-ডাক হওয়ার পর অনেকেই তার নাম নিয়ে মানুষকে বোকা বানিয়ে, দুর্বল করে স্বার্থ হাসিল করতে চাচ্ছে। ইন্টারনেটে গেলেই দেখবেন তার অনেক রকমের ছবি। কোনটা আসল আহমদ মুসা সেটাই বুঝা দায় হয়েছে। একটা কথা পরিষ্কার আহমদ মুসা যে ধরনের মিশনে যায়, সে রকম কিছু এখন জার্মানিতে নেই। এই জার্মানিতেই সে একবার এসেছিল টুইন টাওয়ারের মত ঘটনার তদন্ত নিয়ে। তাছাড়া সেবার আহমদ মুসা জার্মানিতে এসে স্ট্রাসবার্গের যে ফ্যামিলির সাথে ছিল, যাদের সাথে আহমদ মুসার এখনও যোগাযোগ আছে, আমি তাদের সাথে যোগাযোগ করেছি। আহমদ মুসা জার্মানিতে এসেছেন আসতে পারেন এমন কথার জবাবে তারা বলেছেন, তিনি জার্মানিতে আসতে চাইলে প্রথমে তারাই জানতে পারবেন। আহমদ মুসার সাথে তাদের নিয়মিত যোগাযোগ আছে। সুতরাং আহমদ মুসাকে নিয়ে ভাববার কিছু নেই।' বলল গেরারড গারভিন।

‘তোমার কথা সত্য হোক গারভিন। আমি চিন্তায় ছিলাম আহমদ মুসাকে নিয়ে। বিপজ্জনক ব্যক্তি সে। ঈশ্বর স্বয়ং যেন তার হাত দিয়ে কাজ করেন। যাক, এবার শুধু কথা নয়, কাজের কথা বল।’ ব্ল্যাক বার্ড বলল।

‘তার আগে একটা কথা, কারিনা কারলিনের স্টেটের আইনি দখলের অবস্থা কি?’ বলল গেরারড গারভিন।

‘এক জায়গায় এসে ঠেকে আছে। কারিনা কারলিন তার স্টেট হস্তান্তর করতে চাইলে তাকে নিজে দেওয়ানি কোর্টে হাজির হয়ে স্বাক্ষরসহ দলিলে দুই হাতের দুই বৃদ্ধাঙ্গুলির ছাপ লাগাতে হবে। কিন্তু কারিনাকে আদালতে নেয়া তো সম্ভব নয়। আমার যাকে কারিনার জায়গায় বসিয়েছি, তার দুই বৃদ্ধাঙ্গুলি ন্যানো-প্লাস্টিক সার্জারীর মাধ্যমে হুবহু কারলিনের মত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এটা হলেই আমাদের সমস্যা চুকে যাবে। আমরা জার্মানির কারিনা কারলিন স্টেটের মালিক হয়ে যাব। কিন্তু দুই বৃদ্ধাঙ্গুলির ঐ ট্রান্সফরমেশন করতে আরও সময় লাগবে। সে সময় আমাদের জন্যে প্রয়োজন। অন্যদিকে আমরা কারিনা কারলিনের উত্তরসূরী তার দুই মেয়ে ব্রুনা ব্রুনহিল্ড ও আনালিসা অ্যালিনা ও স্বামী আলদুনি সেনফ্রিডকে ধরতে পারলে কারিনা কারলিনকে হত্যা করে ওদেরকে স্টেটের মালিক বানিয়ে তারপর ওদেরও হত্যা করে স্টেটের মালিক হওয়া যেত। কিন্তু এক্ষেত্রেও উইলের কপি পাঠ করতে গিয়ে দেখা গেছে তারাও দশ বছর সম্পত্তি ভোগ করার আগে সম্পত্তি হস্তান্তর করতে পারবে না। দশ বছর পরে স্টেট হস্তান্তর করতে পারলেও তিনজনে এক সাথে একই পক্ষের কাছে হস্তান্তর করতে হবে এবং সেই পক্ষকে হতে হবে ব্রুমসারবার্গের আদি বাসিন্দা। এই ধরনের শর্ত কারিনা কারলিনের স্টেট হস্তান্তরের ক্ষেত্রে নেই। তবে সেখানেও একটা ছোট্ট শর্ত আছে। সেটা হলো, কারিনার স্টেট হস্তান্তরে তারা প্রতিবাদ করতে পারবে। এ জন্যেই যে কোন পথেই স্টেট হস্তান্তর করতে যাওয়া হোক না কেন, কারিনা কারলিনের দুই মেয়ে ও তার স্বামীকে হাতের মুঠোয় পেতে হবে অবশ্যই। সে চেষ্টাও আমরা করছি। কিন্তু তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে কোথাকার কে একজন নকল আহমদ মুসা।’ থামল ব্ল্যাক বার্ড।

নড়েচড়ে বসল গেরারড গারভিন। বলল, 'স্বীকার করতেই হবে স্যার, আপনাদের এ পর্যন্ত সুসম্পন্ন ৬টি স্টেট দখলের কোনটিতেই এমন উৎকট জটিলতা হয়নি। এক ক্লোনিং কৌশলেই সব সমাধান হয়ে গেছে। থাক, এ...।'

গেরারড গারিভিনের কথার মাঝখানেই ব্ল্যাক বার্ড বলে উঠল, 'গারভিন, বড় ফল লাভের জন্যে পরিশ্রম বড়ই করতে হয়। কারিনা কারলিন স্টেটের মত অর্থের খনি জার্মানিতে দু'একটির বেশি নেই। সোনার খনি বলেই এটা সহজলভ্য নয়। আমরা পঁচিশ বছর ধরে এই প্রকল্পের পেছনে বিনিয়োগ করছি। স্টেটটি আমাদের দখলে এসে গেছে। এখন আইনি দখল নিশ্চিত করতে পারলেই হয়। আসলে আমরা প্রকল্পটির শেষ পর্যায়ে। বিজয় আমাদের হাতের মুঠোয়। এক্ষেত্রে সকল বাধাই আমরা নিষ্ঠুরভাবে গুঁড়িয়ে দেব। এখন বল, আশু কি করণীয় আমাদের?'

'ওরা কোথায় যাচ্ছে, ব্রুমসারবার্গে?' বলল গেরারড গারভিন।

'হ্যাঁ, ব্রুমসারবার্গেই যাচ্ছে।' বলল ব্ল্যাক লাইটের অপারেশন চীফ ডরিন ডুগান।

'এটা একটা বড় প্লাস পয়েন্ট যে, ওদের গন্তব্যটা আমরা জানি। এখন ওদের থাকার জায়গা আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। তারপর ওখানেই

ওদের কবর রচনা করতে হবে। আমাদের সমস্ত মনোযোগ এখন এদিকে নিবদ্ধ করতে হবে।' গেরারড গারভিন বলল।

'হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। এটাই এখনকার আমাদের প্রধান কাজ। কিন্তু বল, এখন আমাদের কি করা উচিত।' বলল ব্ল্যাক বার্ড।

'ব্রুমসারবার্গ ও তার আশেপাশের সব বাড়ির উপর নজর রাখতে হবে কোথায় তারা উঠছে তা যেন আমরা জানতে পারি। দ্বিতীয় বিষয়টি হলো, ওদের পরিচিত বা ঘনিষ্ঠ জন যারা ব্রুমসারবার্গে আছে তাদের সন্ধান করতে হবে এবং তাদের উপর চোখ রাখতে হবে। ওরা ব্রুমসারবার্গে যখন আসছে, তখন পরিচিত জনদের কারো সাথে যোগাযোগ করেই আসবে অথবা এসে যোগাযোগ করবে। সুতরাং এদের উপর নজর রাখলে ওদের খোঁজ পাওয়ার একটা পথ হবে।' গেরারড গারভিন বলল।

‘ধন্যবাদ গারভিন। ওদের পরিচিত ও ঘনিষ্ঠ জন তো ব্রুমসারবার্গে আছেই। ওদের ঠিকানা সহজেই পাওয়া যাবে।’ ব্ল্যাক বার্ড বলল।

‘ওদের ঘনিষ্ঠ জন যারা ব্রুমসারবার্গে আছে, তারা সবাই কারিনা কারলিন মানে আমাদের বন্দী ব্রিজিটিরই লোক হবার কথা। সুতরাং এদের সবার সাথে নকল আহমদ মুসার যোগাযোগ অবশ্যই থাকবে না। তবে কার সাথে যোগাযোগ করবে এটা বলা মুস্কিল। সুতরাং পরিচিত জনদের ছোট-বড় কেউ বাদ পড়ছে না, এটা নিশ্চিত করতে হবে, বিশেষ করে পরিচিত বা ঘনিষ্ঠ কারও সাথে যদি আপনাদের মানে নকল কারিনা কারলিনের সম্পর্ক ভালো না থাকে, তাহলে তাদের প্রতিই বেশি নজর রাখতে হবে।’ বলল গেরারড গারভিন।

‘ধন্যবাদ গারভিন। খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছ। তারা এ ধরনের লোকদের সাহায্যের সুযোগ নেবে। আর কিছু কথা গারভিন?’ ব্ল্যাক বার্ড বলল।

‘অবিলম্বে ব্রুমসারবার্গে পর্যাপ্ত লোক মোতায়েন করুন, বিশেষ করে আমাদের নকল কারিনা কারলিনকে এখন সেখানে থাকতে হবে। কারণ সেই ওখানকার সবাইকে চেনে। আমাদের ব্রুমসারবার্গের বর্তমান মিশনে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সে ভূমিকা তাকে পালন করতে হবে। সে প্রয়োজনীয় বুদ্ধি ও সহযোগিতা পাবে, কিন্তু তাকেই সামনে থাকতে হবে।

দু'তলার ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে আহমদ মুসা তাকিয়ে ছিল টিলা থেকে এঁকেবেঁকে নেমে যাওয়া পাথরের রাস্তাটার দিকে। রাস্তা দিয়ে রাজারের ট্রলি ঠেলে আনছিল সিজার। আহমদ মুসা তার দিকেই তাকিয়ে ছিল।

সিজারও চোখ তুলে উপরের দিকে তাকিয়ে ছিল। আহমদ মুসার উপর চোখ পড়তেই চোখ নামিয়ে নিল। তার চোখে-মুখে কেমন একটা আড়ষ্ট ভাব, তা আহমদ মুসার চোখ এড়াল না। আহমদ মুসার মনের পুরনো একটা অস্বস্তি মনের দরজায় উঁকি দিল।

আহমদ মুসা সরে এল ব্যালকনি থেকে। দরজা দিয়ে তার ঘরে ঢুকল। দেখল ওপাশের খোলা দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকছে ব্রুনা ও তার বাবা আলদুনি সেনফ্রিড।

আহমদ মুসা তাদের স্বাগত জানিয়ে বলল, 'আসুন, মনে হচ্ছে আমি এমনটাই আশা করছিলাম। বসুন, এক সাথে বসে চা খাওয়া যাবে এবং গল্প করা যাবে।'

বলে আহমদ মুসা এগোলো সোফার দিকে।

'ধন্যবাদ' বলে ওরাও এগিয়ে এল সোফার দিকে।

কয়েক দিন আগে আহমদ মুসা ব্রুনাদের সাথে ব্রুমসারবার্গের এ বাড়িতে এসে উঠেছে। এ এলাকা ব্রুমসারবার্গের পরের অংশ। মাঝখানে রাইন নদী।

ব্রুমসারবার্গের বড় অংশই রাইন নদীর পশ্চিমে। পূবের অংশেও অনেক লোকালয় গড়ে উঠেছে। লোকালয়গুলো বিচ্ছিন্ন। মাঝে রয়েছে ফসলভরা ঘন সবুজ উপত্যকা। আহমদ মুসারা যে বাড়ি ভাড়া নিয়েছে তা একটা টিলার উপর।

আন্ডার গ্রাউন্ড ফ্লোর ধরলে তা তিন তলাবিশিষ্ট ট্রাইপ্লেক্স বাড়ি। ব্রুনারা এখানে আসার আগেই তাদের বিশ্বস্ত লোক সিজারের মাধ্যমে রাইনর পশ্চিম পাড়ের তাদের বাড়ি থেকে বেশ দূরে এখানে বাসা ভাড়া নিয়েছে।

বাড়িটা খুব সুন্দর।

টিলায় এটাই একমাত্র বাড়ি। বাড়িটা নিরিবিলি ও নিরাপদ।

একেবারে টিলার গোড়ায় টিলা থেকে নেমে যাওয়া রাস্তার উপর একটা পুলিশ ফাঁড়ি।

সব মিলিয়ে বাড়িটা খুব পছন্দ হয়েছে আহমদ মুসাদের। এত সুন্দর বাড়ি যোগাড় করে দেয়ার জন্যে আলদুনি সেনফ্রিড সিজারকে বড় রকমের বখশিস দিয়েছে আহমদ মুসার সামনেই।

আহমদ মুসা ও আলদুনি সেনফ্রিড সোফায় বসেছে।

'আমি চা নিয়ে এসে বসছি স্যার।' বলে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল ব্রুনা।

'না ব্রুনা, তুমি বস। চা একটু পরে খাব। কাজের কথা কিছুটা সেরে নিই।' বলল আহমদ মুসা।

ব্রুনা ঘুরে দাঁড়িয়ে এসে বসল। সে ভাবল নিশ্চয় গুরুত্বপূর্ণ কোন কাজের কথা হবে। সে মনে মনে খুশি হলো যে, আহমদ মুসা তার উপস্থিতিকে গুরুত্ব দিচ্ছে। এই কথা ভাবতে গিয়ে হঠাৎ সে চমকে উঠল, আহমদ মুসা তাকে গুরুত্ব দিচ্ছে এটা ভাবতে তার ভালো লাগছে কেন? শুধু গুরুত্ব দেয়ার বিষয়ই নয়, আহমদ মুসা বাসায় থাকলে মনে হয় বাসায় প্রাণ আছে, আকর্ষণ আছে, কিন্তু তিনি না থাকলে সব কিছু শূন্য মনে হয়। তার আরও মনে পড়ল, সে অনেক সময়ই কারণে, অকারণে আহমদ মুসার ঘরে যায়, যেতে ভালো লাগে। কেন? মনটা তার উন্মুক্ত এক ক্যানভ্যাস হয়ে তার সামনে আসে। সে ক্যানভ্যাসে খোদাই করে লেখা যেন সে পড়তেও পারে। মনের উপর পাহারাদার বিবেক তার কেঁপে ওঠে। এ অন্যায় চিন্তা। বিবেক তাকে চোখ রাঙায়।

মনের এই নাজুক ঝড় বিব্রত ভাব ফুটিয়ে তুলেছে ব্রুনার চোখে-মুখে।

নিজেকে স্বাভাবিক করে নেবার জন্যে পিতার পাশে বসেই বলল, 'বাবা, সিজার আংকল কিন্তু আজকাল বাজারে বেশ দেরি করে।'

‘এসব ধরো না মা। বয়স হয়েছে তার, আগের সেই গতি কি আর আছে!’ বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

‘সে কি খুব পুরানো লোক আপনাদের?’ জিজ্ঞাসা করল আহমদ মুসা।

‘পুরানো মানে বলা যায়, সে আমাদের বাড়িতেই মানুষ হয়েছে। তার বাবাও আমাদের কাজের লোক ছিল। ওরা বলতে গেলে আমাদের পরিবারের সদস্যের মত।’ বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

‘বিশ্বস্ততার দিকে থেকে কেমন?’ আহমদ মুসা বলল।

‘আমার মেয়েদের আমি যতটা বিশ্বাস করি, তাকে তেমনি বিশ্বাস করি।

তার গোটা জীবনে এর অনাথা হতে আমি দেখিনি।’ বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

আপনারা ক্রমসারবার্গ থেকে চলে যাবার পর মানে আপনারা পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত মানে এই মধ্যবর্তী সময়ে তার ভূমিকা কেমন?’ আহমদ মুসা বলল।

‘আমরা পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পর এক মাসের মধ্যে সে চাকরি হারায়। সে আমাদের প্রতি বিশ্বস্ত এবং আমাদের কাছে তথ্য পাচার করতে পারে, এই কারণে তাকে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। আমরা এটা জানতে পারি যে, এরপর সে এখানকার এক ফার্মহাউসে প্রহরীর কাজ করতো।’

বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

কিছুক্ষণ থেমেই সংগে সংগে আবার বলে উঠল, ‘কি ব্যাপার। তার ব্যাপারে এত কথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন? কিছু ঘটেছে? কোন বেয়াদবী করেনি তো?’

‘না, কোন বেয়াদবী করেনি। একটা বিষয় আমি খেয়াল করেছি। তাকে সব সময় মলিন দেখি। এই মলিনতা আমার মনে হয় কোন ভয় বা উদ্বেগ থেকে সৃষ্টি।’ আহমদ মুসা বলল।

ভ্রূকুঞ্চিত হলো আলদুনি সেনফ্রিডের। বিস্ময় ব্রুনার চোখে-মুখেও!

একটু ভেবে বলল আলদুনি সেনফ্রিড, ‘আমি তো এটা খেয়াল করিনি।’

ভাবছিল ব্রুনাও। বলল, 'সব সময়ই তো তাকে দেখছি, তাও কিছু বুঝতে পারিনি।'

'ভয় বা উদ্বেগ কিসের? তার তো এমন কোন সমস্যা নেই। কিংবা কারো সাথে কোন প্রকার শত্রুতাও তার মত লোকের থাকার কথা নয়। থাকলেও তা জানতে পারতাম। তার কোন সমস্যাই সে কোন দিন গোপন করেনি।' বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

'এটা তো আরও ভাবনার বিষয়! আরেকটা কথা। এখানে আসার দু'দিন পর আমার গাড়ি একটা এ্যাকসিডেন্টে পড়েছিল। আমি নিশ্চিত, আমাকে হত্যার জন্যেই মাইক্রোটা আমার কারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। রং সাইড থেকে এসেছিল। সাবধান থাকায় সামান্য আঘাতের উপর দিয়ে আমার জীবন বেঁচে গেছে। আমি গাড়ি থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসার পর উঠে দাঁড়িয়ে দেখেছিলাম কিছু দূরে একটা দোকানের পাশে সিজার দাঁড়িয়ে ছিল। সে দেখছিল আমাকে। কিন্তু ছুটে আসেনি আমার কাছে। তার চোখে-মুখে আতংক ছিল না, যা থাকার কথা ছিল। তার বদলে ছিল ভয়, একটা অপরাধবোধজনিত মুষড়ে পড়া ভাব।' আহমদ মুসা বলল।

বিস্ময় ফুটে উঠল আলদুনি সেনফ্রিডের চোখে-মুখে! বলল, 'আপনি কি বলছেন? আমি বুঝতে পারছি না সে এমনটা করবে কেন? আপনি কি ভাবছেন জনাব?'

'আমি কোন সিদ্ধান্তে এখনও নিইনি। ভাবছি, গাড়িটা আমাকে হত্যা করতে চেয়েছিল কেন? এটাও আমার একটা বড় ভাবনার বিষয়। পুলিশও একমত যে, মাইক্রোটা রংসাইড থেকে উদ্দেশ্যমূলকভাবেই আমার গাড়িকে আঘাত করেছিল। প্রশ্ন হলো, এখানে কে আমাকে হত্যা করতে চেয়েছিল। কেউ তো এখানে আমাকে চেনার কথা নয়!' আহমদ মুসা বলল।

'কথাটা আমার মনেও এসেছে। কে ঘটাল এই ঘটনা? পুলিশ তো কোন হদিস করতে পারলো না।' বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

'পুলিশ খোঁজ নিয়ে দেখেছে, মাইক্রোর নাম্বারটা ছিল ভুয়া। ঐ রংয়ের কোন মাইক্রোর সন্ধান পুলিশ ব্রুমসারবার্গে পায়নি।' আহমদ মুসা বলল।

'আপনি কি মনে করেন, সিজারের সেদিন ঐ আচরণের কারণ কি? তাকে কি জিজ্ঞাসা করব? আমি জিজ্ঞাসা করলে সত্য না বলে পারবে না।' বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

'না জনাব, এখন তাকে কিছুই বলা যাবে না। যখন বলতে হবে, আমি আপনাকে জানাব। যা চলছে, যেমনভাবে চলছে সেভাবেই চলুক। আমাদের সামনে এগোবার জন্যে এটা দরকার।' আহমদ মুসা বলল।

'আপনি যা বলছেন, সেটাই হবে। কিন্তু আপনি কি তার তরফ থেকে কোন আশংকা করছেন?' বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

'না, তার তরফ থেকে কোন আশংকা করছি না। আশংকা সব সময় শত্রুপক্ষের তরফ থেকে। তারা কোন পথে আসবে, সেটাই আশংকার বিষয়।' আহমদ মুসা বলল।

'কিন্তু আমাদের কি করণীয়?' বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

'মি. সেনফ্রিড, কতকগুলো প্রশ্নের সমাধানে আমাদের কাজ করতে হবে। এক. ব্ল্যাক লাইট কারা? তাদের সাথে আপনাদের স্টেট আত্নসাতের ঘটনার সম্পর্কটা কেমন? তারাই মূল প্রতিপক্ষ কিনা? তাদের হেড কোয়ার্টার কোথায়? কিন্তু সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হলো, ব্রুনার মায়ের হুবহু নকল মা কিভাবে কোত্থেকে এল? কি করে এটা সম্ভব হলো? ব্রুনার আসল মা কারিনা কারলিন কোথায়? এসব প্রশ্নের সমাধানের মাধ্যমেই আমরা প্রকৃত সমাধানে পৌঁছব।' আহমদ মুসা বলল।

'জটিল সব প্রশ্ন। কিভাবে এর সমাধান হবে? আপনি এত পরিশ্রম করবেন আমাদের জন্যে? ওরা তো আপনাকেও টার্গেট করেছে। ওদের ব্যর্থতা ওদেরকে আরও ক্ষেপিয়ে তুলবে। একদিকে আমাদের সমস্যা, অন্যদিকে আপনার নিরাপত্তা নিয়েও আমার উদ্বেগ বোধ হচ্ছে। ঈশ্বর আমাদের উপর এ কি বিপদ দিলেন?' বলল আলদুনি সেনফ্রিড অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে।

আহমদ মুসা আলদুনি সেনফ্রিডকে সান্ত্বনা দিয়ে নরম কণ্ঠে বলল, আল্লাহর উপর ভরসা করুন মি. সেনফ্রিড। দু:খের পরে সুখ আসে। এটাও আল্লাহরই বিধান। আপনার পরিবারে অবশ্যই হাসি ফিরে আসবে।'

‘আপনি কি নিশ্চিত এটা ব্রুনার নকল মা?’ বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

‘আমি নিশ্চিত মি. সেনফ্রিড।’ আহমদ মুসা বলল।

‘তাহলে ব্রুনার আসল মা কোথায়? আর কখন কিভাবে সে হাওয়া হয়ে গেল?’ বলল সেনফ্রিড।

‘হাওয়া হয়নি। সে আছে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘সত্যি কি আপনি মনে করেন আমার স্ত্রী কারিনা কারলিন বেঁচে আছে?’ জিজ্ঞাসা সেনফ্রিডের।

‘আমার তাই মনে হচ্ছে মি. সেনফ্রিড।’ আহমদ মুসা বলল।

‘মাফ করবেন, কেন তা মনে করছেন?’ বলল সেনফ্রিড।

‘এই মুহূর্তে যুক্তি দিতে পারবো না। এটা আমার মনের কথা। আর মাথায় বিশেষ কথা আসে আল্লাহর তরফ থেকেই।’ আহমদ মুসা বলল।

আলদুনি সেনফ্রিড মাথা নুইয়ে দু’হাত জোড় করে উপরে তুলে বলল, ‘হে ঈশ্বর! আমার এই মহান মেহমানের কথা আপনি সত্য করুন।’ কান্নায় ভেঙে পড়ল সেনফ্রিডের কণ্ঠ।

ব্রুনাও হাত উপরে তুলেছিল। তারও দুই চোখ দিয়ে অশ্রু গড়াচ্ছে।

একটা স্বপ্ন দেখে উঠে বসল আহমদ মুসা।

আশ্চর্য লাগল স্বপ্নটি দেখে আহমদ মুসার। একটা বাস্তবের সাথে তার অদ্ভুত মিল! গত বিকেলে রাস্তার ভ্যাকুয়াম ক্লিনার লোকটি, যে তাদের টিলার একমাত্র রাস্তাটা ক্লিন করছিল, আহমদ মুসাকে একটা গোলাপ দিয়ে বলেছিল, ‘শুভ বিকেল স্যার। আপনারা বাড়িতে নতুন উঠেছেন। আপনাদের স্বাগত।’

কিছুটা বিরক্ত হয়েছিল আহমদ মুসা। ফুল নিয়ে সে এসে বসেছিল নিচের ড্রইংরুমে। ফুলটি সে পাশের ফ্লাওয়ার ভাসে গুঁজে রেখেছিল। সামনে এনে একবার শুঁকেও দেখেনি সে। স্বপ্নে সেই ক্লিনার লোকটিই তাকে বলছে, ‘স্যার আমার শুভেচ্ছা গ্রহণ করলেন না! একবার ফূলটা শুকেও দেখলেন না।’

স্বপ্নটা জীবন্ত।

ক্লিনার লোকটির কথা তার মনেকে দারুণভাবে বিদ্ধ করেছে। সত্যি তো সে তার শুভেচ্ছা গ্রহণ করেনি! ফুলটি সে শুঁকে দেখেনি, সামনেও নিয়ে আসেনি। দরিদ্র, সামান্য মানুষ বলেই তো! কেন জানি তার মনে হলো তার ভুলের সংশোধন এই মুহুর্তেই হওয়া দরকার। ফুলটি তার তুলে নিয়ে আসা প্রয়োজন। মন থেকেই আহমদ মুসা এর প্রচণ্ড তাকিদ অনুভব করল।

ঘড়ির দিকে তাকাল। দেখল ২টা বেজে পাঁচ মিনিট। মনে মনে বলল, অসুবিধা নেই। সিঁড়ি দিয়ে নেমে কয়েক পা হাঁটলেই নিচের ড্রইংরুম। ফূলটা নিয়ে আসতে হবে। আহমদ মুসা নব ঘুরিয়ে দরজা টানল। নি:শব্দে খুলে গেল দরজা। দরজার পরেই প্রশস্ত একটা করিডোর। আহমদ মুসার ঘরটা বাড়ির সামনের দিকে সর্বদক্ষিণের ঘর। ঘরের দরজা থেকে প্রশস্ত করিডোর উত্তরে এগিয়ে একটা লাউঞ্জে মিশেছে। লাউঞ্জ থেকেই নিচের তলায় নামার সিঁড়ি।

আহমদ মুসা দরজা থেকে করিডোরে পা রাখবে এই সময় পায়ের শব্দ পেল সিঁড়ির দিক থেকে। অস্পষ্ট শব্দ। একাধিক লোক উঠে আসছে সিঁড়ি দিয়ে। সিঁড়ির কার্পেটের উপর দ্রুত পায়ের আঘাত থেকে একটা খসখসে শব্দ ভেসে আসছে।

ভ্রূকুঞ্চিত হলো আহমদ মুসার। এত রাতে সিঁড়ি দিয়ে একাধিক লোক উঠে আসছে, কারা ওরা? ব্রুনা ও ব্রুনার বাবা কি কোন কারণে নিচে গিয়েছিল? কিন্তু পায়ের শব্দ তো দু'য়ের অধিক লোকের! পায়ের শব্দ দ্রুত এবং একই গতিতে উঠে আসছে, ফ্লোরে রাখা পায়ের নিচের শব্দ তরঙ্গ ও বাতাসের ওয়েভে ভেসে আসা শব্দের ঢেউ থেকে এটা পরিষ্কার। তাহলে কারা আসছে এত রাতে?

আহমদ মুসা পায়ের আঙুলে ভর করে দ্রুত দৌড়ে লাউঞ্জে ঢোকার মুখে বাম পাশে টয়লেটের আধা-আধি খুলল যাতে প্রয়োজনে আড়াল পাওয়া যায় এবং দেয়ালের প্রান্ডে লাউঞ্জের মুখে দাঁড়াল। উকিঁ দিল সন্তর্পণে লাউঞ্জের সিঁড়ির দিকে। হ্যাঁ, ওরা পৌঁছে গেছে। ওদের পোষাকের দিকে নজর পড়তেই চমকে উঠল আহমদ মুসা! সেই কালো হ্যাট আর কালো পোষাকে ঢাকা লোকগুলো।

তার মানে ব্ল্যাক লাইটের লোক ওরা। জেনে গেছে তাহলে ওরা আমাদের অ্যাড্রেস।

কালো পোষাকধারী সবাই লাউঞ্জে উঠে এসেছে।

ওরা আহমদ মুসার করিডোরের দিকে আসছিল।

আহমদ মুসা টয়লেটে ঢোকার চিন্তা করছিল। এমন সময় ওদের একজন নেতা হবে বলে মনে হয়। সে বলে উঠল, 'না, আগে নকল আহমদ মুসাকে নয়, বাপ-বেটিকে আগে হাতে পেতে হবে। ওদিকে আগে চল। একজন এখানে লাউঞ্জে থাকবে পাহারায়।'

ওরা ব্রুনা ও তার বাবার ঘরের দিকে চলে গেল।

আহমদ মুসা অবাক হলো, ওরা কি করে জানল বাড়ির কোন্ ঘরে কে থাকে? কেউ বলে না দিলে বাইরের পর্যবেক্ষণ থেকে বিষয়টা এত নিশ্চিতভাবে জানা সম্ভব নয়।

অতি সন্তর্পণে উঁকি দিল আহমদ মুসা লাউঞ্জে। দেখল, একজন ছাড়া অন্য সবাই চলে গেছে ব্রুনা ও তার বাবার ঘরের দিকে। তারা পাশাপাশি কক্ষে থাকে।

ওরা পৌঁছে গেছে ব্রুনাদের ঘরের কাছে।

লাউঞ্জে দাঁড়ানো লোকটির হাতে সর্বাধুনিক মাইক্রো মেশিনগান। মেশিনগানটি লোকটির হাতে ঝুলছে। ব্যারেলটা নিচে নামানো। লোকটি বেশির ভাগ সময় তার সাথীরা যেদিকে গেছে, সেদিকে ও সিঁড়ির দিকে চোখ রাখছে।

আহমদ মুসা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল। ওদেরকে বেশি সময় দেয়া যাবে না।

সাবমেশিনগানধারী লোকটি দক্ষিণ পাশের আহমদ মুসার করিডোরের দিকটা পেছনে রেখে উত্তরে ব্রুনা ও তার বাবার কক্ষের দিকে থেকে চোখ সরিয়ে ধীরে ধীরে দৃষ্টি দিচ্ছে পশ্চিম পাশের সিঁড়ির দিকে।

আহমদ মুসা দু'পায়ের আঙুলে ভর করে নি:শব্দে দুই লাফে লোকটির পেছনে দাঁড়িয়েই বাম হাত দিয়ে তার গলা পেঁচিয়ে ধরল সাঁড়াশির মত। মিনিটের মধ্যেই তার দেহ নি:সাড় হয়ে গেল। তার হাত থেকে মেশিনগান খসে পড়ল।

আহমদ মুসা লোকটিকে ফেলে রেখে ফ্লোর থেকে মাইক্রো মেশিনগানটি তুলে নিয়ে ছুটল ব্রুনাদের ঘরের দিকে।

লাউঞ্জের পরেই বড় একটা হল ঘর। একে ড্রইংরুম হিসাবে ব্যবহার করা হয়, আবার ছোটখাট ঘরোয়া গ্যাদারিং-এর জন্যেও ব্যবহৃত হয়। হল ঘরটির দেয়াল ব্লাইন্ড কাচের ও মুভেবল বলে দুই উদ্দেশ্যেই সুন্দর কাজে লাগে। হল ঘরটির পরে পাশাপাশি দু'টি বড় রুম। দুই রুমের মাঝখানে টয়লেট। আর হলরুমের পূর্ব দিকে আর একটি বড় ঘর। আর তা একই সাথে আর্কাইভ ও লাইব্রেরী, যা স্টাডি রুম হিসাবেও ব্যবহৃত হয়।

এই আর্কাইভ ও হলরুমের মাঝখান দিয়ে চলে গেছে করিডোর। এই করিডোর ধরে কয়েক গজ এগোলেই ব্রুনা ও আলদুনি সেনফ্রিডের শোবার ঘর দু'টি।

এ করিডোরটি ওদের ঘরের সামনের পূর্ব-পশ্চিম লম্বা বারান্দায় গিয়ে শেষ হয়েছে।

আহমদ মুসা শুয়ে পড়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগোচ্ছিল। শত্রুকে আগে আক্রমণে আসতে দিতে চায় না আহমদ মুসা। সেজন্যেই এই সাবধানতা।

আহমদ মুসা ধীরে ধীরে এগোচ্ছিল। তার পরিকল্পনা হলো, করিডোরটার প্রান্তে গিয়ে উঁকি মেরে দেখবে তারা কি করছে। ব্রুনা ও মি. সেনফ্রিড দু'জনের দরজার সামনে থেকে মানুষের সাড়া পাচ্ছে।

করিডোরের ঠিক ডান পাশ দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল আহমদ মুসা। প্রান্ত দিয়ে, যাবার ফলে করিডোরের শেষ পর্যন্ত যাবার আগেই বাম পাশের দরজার সামনে যারা দাঁড়িয়ে আছে তাদের দেখা যাবে।

আহমদ মুসা এগোচ্ছিল।

তখনও বাম দিকের দরজা দেখতে পাবার মত কৌণিক অবস্থানে সে পৌঁছতে পারেনি। কিন্তু তার চোখ দরজার দিকে।

হঠাৎ দেখল একজন লোক বাম দিকের দরজার দিক থেকে ছুটে আসছে। তার চোখ ডান পাশের দরজার দিকে। কিন্তু এ করিডোরের সামনাসামনি আসতেই আহমদ মুসা তার চোখে পড়ে গেল।

চমকে উঠে থমকে দাঁড়াল সে। পরক্ষণেই কাঁধের মাইক্রো মেশিনগান হাতে এনে আহমদ মুসাকে তাক করতে যাচ্ছিল।

আহমদ মুসাও তাকে একই সংগে দেখে ফেলেছিল। কাঁধ থেকে স্টেনগান নামানো থেকেই বুঝল, না মারলে তাকেই মরতে হবে। আহমদ মুসার স্টেনগানের ব্যারেল ওদিকে তাক করাই ছিল। টার্গেট এ্যাডজাস্ট করে ট্রিগার চাপতে দেরি হলো না আহমদ মুসার।

লোকটির স্টেনগান আহমদ মুসাকে টার্গেট করার আগেই লোকটি গুলি খেয়ে ঢলে পড়ে গেল।

গুলি করেই আহমদ মুসা দ্রুত কিছুটা সামনে এগোলো। বাম দিকের দরজাটা তার সামনে এল। দেখল দরজার সামনে দাঁড়ানো দু'জন তাদের স্টেনগান বাগিয়ে ছুটে আসছে।

কি ঘটতে যাচ্ছে আহমদ মুসা পরিস্কার বুঝতে পারল। বাম দিকের লোকগুলোই নয়, ডান দরজার সামনের লোকরাও নিশ্চয় ছুটে আসছে। সবাইকে তার মোকাবিলা করতে হবে। আর সবাইকে এক সাথে মোকাবিলা করা সম্ভব হবে না।

তাই আহমদ মুসা সময় নষ্ট করল না।

স্টেনগানের ট্রিগারে তর্জনি রাখাই ছিল।টার্গেট ঠিক করার পর তর্জনি স্টেনগানের ট্রিগারের উপর চেপে বসল।

সামনে ছুটে আসা লোক দু'টি গুলি খেয়ে সামনেই হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল।

গুলি করেই আহমদ মুসা স্টেনগানের ব্যারেল বাম থেকে ডান পাশের দিকে নিয়ে গুলি বৃষ্টির দেয়াল সৃষ্টি করল। তারপর করিডোরের ডান পাশের দিকে গড়িয়ে চলল, যাতে ডান দিকের দরজার সামনের করিডোরটা তার স্টেনগানের গুলির আওতায় এসে যায় এবং ওপাশের লোকরা তাকে টার্গেট করার সুযোগ পাওয়ার আগেই তার গুলি বৃষ্টির মুখে পড়ে যায়।

আহমদ মুসার নির্ভুল পরিকল্পনা। সত্যিই ডান দরজার সামনের লোকরা ছুটে আসছিল এবং তারাও গুলি ছুঁড়তে শুরু করেছিল। কিন্তু আহমদ মুসার গুলি

যেভাবে ওদের কভার করছিল, সেভাবে তারা আহমদ মুসাকে টার্গেট করতে পারেনি এবং তাড়াহুড়ার কারণে তারা আহমদ মুসার সঠিক অবস্থান দেখতে পায়নি। তার ফলে তারা বেপরোয়াভাবে এ করিডোরের দিকে ছুটে আসতে গিয়ে আহমদ মুসার গুলি বৃষ্টির মুখে পড়ে গেল। তিনজনের যে দু'জন ডান পাশে ছিল তারা লাশ হয়ে গেল, কিন্তু বেঁচে গেল একজন। দুই স্টেনগানের গুলি বৃষ্টি থেমে যাওয়া এবং এক স্টেনগানের গুলি অব্যাহত থাকা দেখে আহমদ মুসা এটা বুঝে নিল।

আহমদ মুসা দ্রুত করিডোরের বাম পাশ থেকে গড়িয়ে করিডোরের ডান পাশে চলে গেল। তারপর স্টেনগানের ট্রিগারে হাত রেখে দ্রুত ক্রলিং করে করিডোরের প্রান্তে গিয়ে পৌঁছল, যেখানে থেকে করিডোরের গার্ডার একেবারে 'এল' প্যাটার্নে টার্ন নিয়ে পুব দিকে চলে গেছে। ওদিকেই গার্ডারের আড়ালে অবশিষ্ট একজন লোক লুকিয়ে আছে অথবা আক্রমণের কোন কৌশল নিয়ে এগিয়ে আসছে।

আহমদ মুসা তার স্টেনগানের ব্যারেল 'এল'-এর কোণাটায় যতখানি সম্ভব পূর্ব দিকে ঘুরিয়ে রেখে অপেক্ষা করতে লাগল।

মিনিটখানেকের মধ্যেই আহমদ মুসা অতিষ্ট হয়ে উঠল। কি করছে তৃতীয় লোকটি? সে যদি আক্রমণে এদিকে আসতে চায় যে কোন কৌশলে, তাহলে এতটা সময় লাগার কথা নয়। সময় সে নষ্ট করতে পারে না। কারণ সে জানে, সে খুব ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে। কারণ যে কোন সময় সে তার গুলির মুখে পড়তে পারে, তার আড়াল নেবার কোন জায়গা নেই। সুতরাং বেপরোয়া আক্রমণে আসার কোন বিকল্প তার কাছে নেই, তাহলে সে চুপ করে আছে কেন? নিশ্চয় সে চুপ করে বসে নেই!

আহমদ মুসা স্টেনগানের ট্রিগারে তর্জনি রেখে উঁকি দিল ডানের বারান্দার দিকে।

সে দেখল বারান্দার গার্ডারের গা ঘেঁষে বসে সে গ্যাস মুখোশ পরছে। তার সামনে পিং পং বলের মত কিছু রাখা। দেখেই আহমদ মুসা বুঝল, ওটা কোন প্রেশার গ্যাস বোমা, যা সংজ্ঞা লোপ করতে পারে নির্দিষ্ট এলাকার সব মানুষের।

অথবা ওটা যদি কোন বিষাক্ত গ্যাস বোমা হয় তাহলে বিস্ফোরণের কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে মৃত্যু অবধারিত। নিজের নিরাপত্তার জন্যে গ্যাস মুখোশ পরার পরই সে ওটা ব্যবহার করবে।

আহমদ মুসা ভাবছে।

গ্যাস মুখোশ পরা তার হয়ে গেছে। হাতে তুলে নিতে যাচ্ছে তার সামনের সাদা বলটা।

ট্রিগারে হাত রেখেই আহমদ মুসা তার দেহটাকে উল্টে দিয়ে সামনের বারান্দার মাঝখানে চলে এল এবং শুয়ে থেকেই লোকটির দিকে রিভলবার তাক করে চিৎকার করে বলল, 'হাত উপরে তোল, না হলে তোমার দেহ ঝাঁঝরা হয়ে যাবে।'

লোকটি কথাটার দিকে কোন কানই দিল না। সাদা বলটার দিকে অগ্রসরমান তার হাত দ্রুততর হলো এবং ছোঁ মেরে নিয়ে নিল সাদা বলটি নিজের হাতের মুঠোয়। উঠছিল তার হাত উপর দিকে বিদ্যুত গতিতে।

আহমদ মুসা তাকে আর সময় দিল না। সে যা বলেছিল তাই ঘটল। আহমদ মুসার স্টেনগানের গুলিতে লোকটার দেহ ঝাঁঝরা হয়ে গেল।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল।

সে ডাক দিল ব্রুনা ও তার বাবা আলদুনি সেনফ্রিডকে।

তারা দরজা খুলে বেরিয়ে এল।

ভয়ে ব্রুনা কাঁপছিল। মুখ তার ভয়ে ফ্যাকাসে। আলদুনি সেনফ্রিডের অবস্থাও একই রকম। আতংকে নির্বাক সেও।

'আর কোন ভয় নেই মি. সেনফ্রিড,ব্রুনা। ওরা সাতজন এসেছিল। সবাই মারা পড়েছে।

'মি. আহমদ মুসা আবারও আমাদের জীবন বাঁচালেন।' বলে আহমদ মুসাকে জড়িয়ে ধরল আলদুলি সেনফ্রিড।

ব্রুনাও নির্বাক হয়ে দাঁড়াল আহমদ মুসার সামনে। তার বুকে তোলপাড় চলছে। আমরা তো ঘুমুচ্ছিলাম। কিছুই টের পাইনি। তিনি কেমন করে টের পেলেন? তিনি নিশ্চয় জেগে ছিলেন। এমনভাবে তিনি জেগে থাকেন। বিস্ময়কর

এই মানুষ! কেউ মানুষের জীবনকে পাগলের মত ভালো না বাসলে নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্যকে এমনভাবে ভালোবাসতে পারে না। এরাই মানুষের মধ্যে সোনার মানুষ। তার গর্ব হচ্ছে যে, তার আপা একে ভালো বেসেছিলেন এবং এর জন্যে জীবন দিয়েছেন। এমন মানুষেকে ভালো না বেসে পারা যায় না!

ব্রুনার চিন্তা আরও এগোতো, কিন্তু আলদুনি সেনফ্রিডের কথা শেষ হবার সাথে সাথে আহমদ মুসা বলে উঠল, 'আপনারা একটু দাঁড়ান। আমি নিচে ড্রইং রুম ও আশপাশটা একটু দেখে আসি।'

বলে আহমদ মুসা চলতে শুরু করল।

'মি. আহমদ মুসা প্লিজ, আমরা আপনার সাথে আসতে চাই।' বলল আলদুনি সেনফ্রিড। তার চোখে-মুখে অস্বস্তি।

আহমদ মুসা ফিরে দাঁড়াল। বলল, 'কেন মি. আলদুনি সেনফ্রিড? আমি গিয়েই চলে আসব।'

'কিসে কি হচ্ছে, কিছুই আমার কাছে পরিষ্কার নয়। এখানে থাকতে আমার ভয় করছে মি. আহমদ মুসা।' বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

ব্রুনা কিছু বলতে গিয়েও পারল না। কথা ফুটল না তার মুখে। একটা জড়তা তাকে জড়িয়ে ধরেছে।

আহমদ মুসা একটু ভাবল। তারপর বলল, 'আসুন জনা্ব।'

আহমদ মুসা হাঁটতে শুরু করল।

মি. আলদুনি সেনফ্রিড ও ব্রুনা আহমদ মুসার পেছনে চলতে লাগল।

লাউঞ্জে আরেক জনের লাশ দেখে আর একবার আঁৎকে উঠল ব্রুনারা।

'এ লোক এখানে পাহারায় ছিল। তাকে না মেরে সামনে এগোনো অসম্ভব ছিল।' আহমদ মুসা বলল।

'আপনি টের পেলেন কি করে মি. আহমদ মুসা? আপনি কি জেগে ছিলেন?' জিজ্ঞাসা আলুদনি সেনফ্রিডের।

'ঘুমিয়ে ছিলাম।' আহমদ মুসা বলল।

'তাহলে ওদের সাড়া পেয়ে জেগে উঠেছেন?' বলল সেনফ্রিড।

‘ওদের সাড়া পেয়ে জাগিনি। কিভাব জাগলাম, সেটা পরে বলছি। সে বিষয়টা নিয়ে ভাবতে গিয়েই নিচের ড্রইং রুমে আসছিলাম।’ আহমদ মুসা বলল।

আহমদ মুসার শেষের কথাটার কিছুই বুঝল না ব্রুনারা। কিন্তু আর কিছু জিজ্ঞাসাও করল না।

তারা নিচের ড্রইং রুমে এসে গেছে।

তারা সবাই ড্রইং রুমে প্রবেশ করল।

আহমদ মুসা সোজা এগোলো ফুলদানির দিকে। ফুলে গুচ্ছের সাথে রাখা একমাত্র গোলাপ হাতে তুলে নিল আহমদ মুসা।

গোলাপটি তুলে নিয়েই আহমদ মুসা গোলাপের গন্ধ নেবার জন্যে নাকের কাছে নিয়ে এল ফুলটিকে। ফুলটি নাকের সামনে এনে শুঁকতে গিয়ে চমকে উঠল আহমদ মুসা। দেখল ফুলের ঠিক মাঝখানে গোল করে জড়ানো একটা লাল কাগজ গুঁজে রাখা।

শুঁকা আর হলো না ফুলটা।

বাম হাতে কাগজটা তুলে নিয়ে দুই হাতে গোল করে ভাঁজ করা কাগজটি খুলে ফেলল।

বিস্ময় আহমদ মুসার চোখে-মুখে।

ব্রুনারাও আহমদ মুসার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

আহমদ মুসা চোখ বুলাল কাগজটির উপর।

তিনটি বাক্য লেখা।

পড়ল আহমদ মুসা, ‘সিজার ফাঁদে পড়েছে। তার বউ-বেটি আটকা। আজ রাত ২টা, সাবধান থাকবেন।’

লেখাটা পড়ার সংগেই সব কিছু পরিষ্কার হয়ে গেল আহমদ মুসার কাছে। সিজারের বউ-বেটিকে আটকে রেখে বাধ্য করেছে সিজারকে তাদের কথা মত চলতে। নিশ্চয় গেটের কম্বিনেশন লকের ডিজিটাল কোড সে ব্ল্যাক লাইটকে বলে দিয়েছে। বাড়িটার ডিজাইন ও বাড়ির কে কোথায় থাকে তাও নিশ্চয় ওরা সিজারের কাছ থেকে জেনে নিয়েছে। রাত দু’টোর দিকে এ বাসায় আক্রমণ হবে, সেটাও এই চিরকুটের লেখক জানত। সে এই ব্যাপারে আহমদ মুসাকে সাবধান

করতে চেয়েছিল চিরকুট লিখে। কে এই চিরকুট লেখক? সে 'ব্ল্যাক লাইটের কেউ? তা অবশ্যই নয়। তাহলে কে?

এ প্রশ্নের জবাব আহমদ মুসা খুঁজে পেল না। লোকটা কি আসলেই ক্লিনার ছিল, না ক্লিনারের ছদ্মবেশে এসেছিল?

'মি. আহমদ মুসা, ফুলের মধ্যে থেকে ওটা কি বের হলো? ফুলই বা এখানে কোত্থেকে এল? ফুলদানিতে রাখার সময় গতকাল ফুলের গুচ্ছ আমি ভালো করে দেখেছি। তাতে এই গোলাপটি ছিল না।' বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

আহমদ মুসার চিন্তায় ছেদ পড়ল। তাকাল সে আলদুনি সেনফ্রিডের দিকে। একটু হাসল। বলল, 'আমি কিভাবে ঘুম থেকে জাগলাম বলছিলেন না। এই ফুল আমাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে দিয়েছে। আমি স্বপ্ন দেখছিলাম, যে আমাকে ফুলটা দিয়েছিল, সে আমাকে বলছিল, 'আমার ফুলটা শুঁকেও দেখলেন না।' তার এই কথার পরই আমার ঘুম ভেঙে যায়। স্বপ্নটা এতই জীবন্ত ছিল যে, আমার মনে হলো, এই মুহূর্তে ফুলটা ওখান থেকে নেয়া প্রয়োজন এবং শুঁকে দেখাও উচিত। সংগে সংগেই আমি উঠলাম। দরজা খুললাম। দরজা খুলেই টের পেলাম সিঁড়ি দিয়ে কয়েকজন লোক উঠে আসছে। তারপর আমি ওদের অনুসরণ করলাম এবং এরপর যা ঘটেছে তা আপনারা দেখেছেন।'

'মিরাকল! সত্যিই ফুলই তো আপনাকে জাগিয়েছে। বুঝা যাচ্ছে, ফুল আপনি ভালো করে দেখেননি বলেই আপনি স্বপ্ন দেখেছেন।' বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

'এবং স্বপ্ন আমি ঠিক সময়ে দেখেছি এবং ঠিক সময়েই ঘুম থেকে জেগেছি।' বলে আহমদ মুসা লাল চিরকুটটি এগিয়ে দিল আলদুনি সেনফ্রিডের দিকে।

আলদুনি সেনফ্রিড পড়ল চিরকুটটি। তার চোখ দু'টি বিস্ময়-উদ্বেগে ছানাবড়া হয়ে গেল।

পিতার দিকে চেয়ে তার হাত থেকে চিরকুটটি নিয়ে নিল ব্রুনা। ব্রুনাও চিরকুটটি পড়ল। তারও চোখ-মুখে নেমে এল বিস্ময় ও উদ্বেগ। বলল, 'স্যার আপনি কি ঠিক ২টায় ঘুম থেকে উঠেছিলেন?'

‘হ্যাঁ,ব্রুনা, স্বপ্ন দেখে ২টায় আমি ঘুম থেকে জেগেছিলাম।’ আহমদ মুসা বলল।

‘মি. আহমদ মুসা, সিজারের ব্যাপারে কি লেখা হয়েছে বুঝলাম না।’ বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

‘বলছি। ব্ল্যাক লাইটের লোকরা সিজারের স্ত্রী ও মেয়েকে কিডন্যাপ করেছে এবং সিজারকে বলেছে যে, ব্ল্যাক লাইটের লোকরা যা বলবে তা না করলে তার স্ত্রী ও মেয়েকে হত্যা করবে। মনে হচ্ছে, স্ত্রী ও মেয়েকে বাঁচানোর জন্যে সে ব্ল্যাক লাইট যা বলছে তাই সে করছে। সেই এ বাড়ির ঠিকানা ওদের জানাতে বাধ্য হয়েছে। আমার উপর যে আক্রমণ হয়, সেটাও সিজারের সাহায্য নিয়ে ওরা করেছে। আজও ওরা এ বাড়ির কোডেড লক খুলেছে সিজারের সাহায্যে।’

মুহূর্ত কয়েকের জন্যে থেমে আবার আহমদ মুসা বলল আলদুনি সেনফ্রিডের দিকে চেয়ে, সিজারের মধ্যে ভীত ও জড়সড় ভাব এই কারণেই দেখা যেত, যা আমি বলেছিলাম।’

‘সিজার এত বড় বিশ্বাসঘাতকতা করল আমাদের সাথে? ওকে এক মুহূর্ত আর রাখা যাবে না, বাড়িও আমাদের পাল্টাতে হবে। না, তাকে পুলিশে দিলে ভালো হয় মি. আহমদ মুসা?’ বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

‘না, এসব করা ঠিক হব না মি. সেনফ্রিড। তাকে তাড়ানোও যাবে না, তবে বাসা বদল করা যেতে পারে। তাকে বুঝতেই দেয়া যাবে না যে, তার বিষয়টা আমরা জানি। আর…।’

আহমদ মুসার কথার মাঝখানেই আলদুনি সেনফ্রিড বলে উঠল, ‘কিন্তু তাহলে তো সিজারকে ব্যবহার করে আরও ঘটনা ঘটাতেই থাকবে ব্ল্যাক লাইটরা।’

‘হ্যাঁ, সে আশংকা আছে। আমাদেরকে সাবধান থাকতে হবে। কিন্তু লাভ যেটা হবে সেটা হলো, সিজারকে গোপনে ফলো করে আমরা ব্ল্যাক লাইটের ঠিকানা জানতে পারি কিংবা কাউকে ধরে ফেলতে পারি। এটা আমাদের জন্যে খুব প্রয়োজন।’ আহমদ মুসা বলল।

‘এ কথাও ঠিক। ঠিক আছে যা ভালো বোঝেন তাই করুন।’

সবাই বেরিয়ে এল নিচের ড্রইং রুম থেকে।

দোতলায় ওঠার সিঁড়ির গোড়ায় এসে আহমদ মুসা বলল, 'মি. সেনফ্রিড, আপনি পুলিশকে টেলিফোন করুন। তাদেরকে সব ঘটনা জানান।'

পুলিশকে টেলিফোন করে আবার তারা দো'তলায় ফিরে এল।

'মি. আহমদ মুসা, আমার ও ব্রুনার দরজার সামনে সরু পাইপ ও ইলেকট্রনিক ধরনের একটা বক্স কেন?' বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

'আপনাদের হত্যার পরিকল্পনা তাদের ছিল না। ওরা চেয়েছিল আপনাদের সংজ্ঞাহীন করে কিডন্যাপ করতে। এসব সংজ্ঞাহীন করার সরঞ্জাম। পাইপের একটা মাথা দেখুন খোলা, আরেকটা মাথায় সুঁচালো, ফাঁপা ও মোটা-সোটা পিন। পিং পং বলের মত ওটা মানুষকে সংজ্ঞাহীন প্রেশার গ্যাস বল। বলটি ইলেকট্রনিক বক্সে নির্দিষ্ট স্থানে সেট করার পর বক্সের ফুটো দিয়ে পাইপের পিনটা ঢুকিয়ে দিলে পিনটা গ্যাস বলের ভিতরে ঢুকে নির্দিষ্ট স্থান দিয়ে গ্যাস ছাড়তে আরম্ভ করবে। তারপর ফাঁপা পিনের সাহায্যে গ্যাস প্রবেশ করবে টিউবে। টিউবের খোলা মাথা ঢুকানো থাকবে ঘরের ভিতর। গ্যাস ঘরে প্রবেশ করার সাথে সাথে ঘরে যে থাকবে সে সংজ্ঞা হারাবে।' আহমদ মুসা বলল।

'ও গড! ওদের প্ল্যান সফল হলে আমাদের বাঁচার কোন উপায় ছিল না। কি বলে যে আপনার কৃতজ্ঞতা জানাব আহমদ মুসা। কোন কথাই যথেষ্ট নয়।' বলল মি. সেনফ্রিড।

পিতার কথা শেষ হতেই ব্রুনা বলে উঠল, 'বাবা, উনি স্রেফ আপার দেয়া দায়িত্ব পালন করছেন। কোন ধন্যবাদই নাকি তাঁর প্রাপ্য নয়!'

'আবার ভুল করছ ব্রুনা। গৌরী আমাকে দায়িত্ব দেননি। তিনি আশা করেছিলেন মাত্র।' আহমদ মুসা বলল।

'দায়িত্ব দেয়া ও আশা করার মধ্যে খুব বেশি কি দূরত্ব? প্রথমটা স্থূল এবং দ্বিতীয়টা ভদ্র ভাষার, এই যা পার্থক্য।' বলল ব্রুনা।

'ব্রুনা, আমি তোমার বোন যেমনটা ছিল, তাকে তেমনটাই বড় রাখতে চাচ্ছিলাম। আর তুমি তাকে টেনে নিচেই নামাতে চাচ্ছ। নিজেদের কোন ব্যাপারে অন্যকে দায়িত্ব চাপাবার মত স্বার্থবাদী তিনি ছিলেন না। তিনি নিজেদের সম্পর্কে

আমাকে জানিয়েছিলেন অবহিত করার উদ্দেশ্যে। এর সাথে তিনি একটা মত পোষণ করেছিলেন মাত্র।' আহমদ মুসা বলল।

ব্রুনা সংগে সংগে উত্তর দিল না।

হঠাৎ তার চোখ-মুখ ভারি হয়ে উঠল।

মুহূর্ত কয়েক মাথা নিচু করে থাকার পর বলল, 'ধন্যবাদ স্যার। আমি আমার কথা প্রত্যাহার করছি। ধন্যবাদ আপনাকে, আমার বোনকে এমন পরম সুন্দর চোখে দেখার জন্যে। আমি গর্বিত স্যার।' ব্রুনার ভারি কন্ঠ একটা অবরুদ্ধ আবেগে ভেঙে পড়ল।

সে দু'হাতে মুখ ঢাকল।

বাড়ির বাইরে থেকে পুলিশের গাড়ির শব্দ ভেসে এল।

আলদুনি সেনফ্রিড ঘরের ভেতরে গিয়েছিল। দ্রুত বেরিয়ে এল। বলল, 'পুলিশ এসেছে। আমি নিচে যাই। ওদের নিয়ে আসি।'

ব্রুমসারবার্গের রাইন এলাকা।

রাইনের পশ্চিম তীর।

ব্রুমসারবার্গের সার্কুলার রোডের দক্ষিণ প্রান্ত, যেখান থেকে সার্কুলার রোডটি পূর্ব দিকে বাঁক নিয়ে রাইন পর্যন্ত নেমে গেছে, তার উত্তর প্রান্ত বরাবর এসে শেষ হয়েছে স্যাক্সনদের আদি রাজপ্রাসাদ এলাকার দক্ষিণ সীমা।

সার্কুলার রোডটি ব্রুমসারবার্গের ব্যস্ত সড়কের একটি।

স্যাক্সন রাজপ্রাসাদের এরিয়া ঠিক আছে আর অন্য কিছুর সব ঠিক নেই।

মূল প্রাসাদের কাঠামো ঠিক থাকলেও সংস্কারের মাধ্যমে দৃশ্যপট পাল্টে গেছে। মূল অংশ ঠিক থাকলেও আশে পাশের স্থাপনা প্রায় ক্ষেত্রেই আর অবশিষ্ট নেই। মাত্র দক্ষিণ প্রান্তে এসে সার্কুলার রোডটা গা ঘেঁষে রাজ প্রাসাদেরই আরেকটা বিচ্ছিন্ন অংশ এখনো টিকে আছে। স্যাক্সনদের প্রথম সম্রাট অটো দি গ্রেটের ভ্রাতুস্পুত্র ও নাতির মধ্যে সাম্রাজ্য নিয়ে বিরোধ দেখা দিলে সাম্রাজ্য ভাগ

হয় এবং সম্রাটের নাতির জন্যে আলাদা এই প্রসাদ নির্মিত হয়। ব্রুনার মা কারিনা কারলিন সম্রাটের সেই নাতিরই উত্তরপুরুষ। ব্রুনা, তার বোন ও বাবা এই বাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়েছে। এখন তার মা এই বাড়িতে থাকে। তার সাথে থাকে ব্ল্যাক লাইটের লোকরা।

এই বাড়ির পর সার্কুলার রোডটা পেরুলে রাস্তার ওপাশে সারিবদ্ধ বাড়ির মধ্যে পুরানো মডেলের জাঁকজমকহীন, অনেকটাই পরিত্যক্ত বাড়ির মত দাঁড়িয়ে আছে আরেকটা বাড়ি। এই বাড়ির ওল্ড মডেলের গেট ও প্রাচীর ঘেরা বাড়িতে গেট দিয়ে প্রবেশ করলে প্রথমেই একটা আঙিনা পাওয়া যায়। তারপর লাল পাথর বিছানো রাস্তা দিয়ে সামনে এগোলে আঙিনার মাথায় একটা গাড়ি বারান্দা। গাড়ি বারান্দা থেকে কয়েক ধাপ পেরিয়ে উঁচু বারান্দা। বারান্দার পরেই বাড়ির ভেতরে ঢোকার মূল গেট।

গেট অরক্ষিত। গেটে কোন দারোয়ান নেই। আছে কলিং বেল। কলিং বেল বাজলে কেউ দরজা খুলে দেয়। অধিকাংশ সময়ই দরজায় তালা থাকে। এখন অবশ্য তালা নেই।

বাড়ির ভেতরে ড্রয়িং রুমে বসে তিনজন কথা বলছে। আহমদ মুসা, ব্রুনা ও তার বাবা আলদুনি সেনফ্রিড।

সেদিন রাতে বাড়ি আক্রান্ত হওয়া এবং বাড়ির ঠিকানা ব্ল্যাক লাইট জেনে ফেলেছে তা প্রমাণিত হওয়ার পর আহমদ মুসারা সেদিনই ঐ বাড়ি পাল্টে ফেলেছে। এ বাড়ি তাদের নতুন ঠিকানা।

এ বাড়িটা পাওয়ার মধ্যেও একটা কাহিনী আছে।

বাড়ি আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা যেদিন ঘটে, সেদিনই রাস্তার কয়েকটা টু-লেট বিজ্ঞাপন দেখে সেসব বাড়ির লোকেশন দেখতে বেরিয়েছিল আহমদ মুসা। তার গাড়িটা তাদের টিলা এলাকার নিচে মার্কেটের ভেতর দিয়ে যাচ্ছিল। ট্রাফিক সিগনালের কারণে দাঁড়িয়ে পড়েছিল তার গাড়ি।

সে নিজে ড্রাইভ করছিল। গাড়ির জানালা খোলা ছিল।

একজন ফুলওয়ালী ফুলের একটা গুচ্ছ আহমদ মুসার সামনে ধরে বলল, 'স্যার, নেবেন ফুলটা, টাটকা ফুল। মাত্র এক মার্ক।'

আহমদ মুসা না বলতে গিয়ে হঠাৎ ক্লিনারের সেই গোলাপ ফুলের কথা মনে পড়ল। সংগে সংগে ফুলের গুচ্ছের দিকে একবার তাকিয়ে বলল, 'দাও।'

ফুলের গুচ্ছ দিয়ে একটি মার্ক নিয়ে চলে গেল ফুলওয়ালী।

ফুলওয়ালীর বয়স পঁচিশ থেকে তিরিশের মধ্যে হবে। আয়া বা সেলসম্যান অথবা কোন কর্মজীবী ধরনের মহিলা হবে।

আহমদ মুসা গুচ্ছের ফুলগুলোর উপর নজর বুলাল, কিন্তু কিছুই দেখল না।

কিছুটা হতাশ হয়ে ফুলের গুচ্ছটা পাশের সিটে রেখে আবার গাড়ি স্টার্ট দিল আহমদ মুসা ট্রাফিক লাইটের গ্রীন সিগন্যাল পেয়ে। কিন্তু তার মনটা খুঁত খুঁত করতে লাগল। মনের এ জিজ্ঞাসার অর্থ হলো, ফুলের গুচ্ছটি একটু ভালো করে দেখা দরকার।

একটু সামনে এগিয়েই পেল রাইনের পশ্চিম পাড়ে যাবার ব্রীজ।

ব্রীজ পার না হতেই একটা পার্কিং দেখে আহমদ মুসা গাড়ি দাঁড় করাল।

হাতে তুলে নিল ফুলের গুচ্ছটি। উল্টে-পাল্টে ভালো করে দেখতে লাগল।

এক স্থানে দুই বোঁটার ফাঁক দিয়ে একটা লাল কাগজের টুকরোর মত দেখতে পেল।

উজ্জ্বল হয়ে উঠল আহমদ মুসার মুখ। ঐ গোলাপেও লাল কাগজই পেয়েছিল। এটাও কি সে রকম কিছু।

তাড়াতাড়ি আহমদ মুসা সুতা ছিঁড়ে খুলে ফেলল ফুলের গুচ্ছ। বেরিয়ে এল লাল এক টুকরো কাগজ।

খুলল কাগজের খণ্ডটি।

চিরকুটটিতে দুই লাইন লেখা। পড়ল আহমদ মুসা, 'আপনাদের জন্যে সার্কুলার রোডের ৩৩৩ নম্বর বাড়িটা ভালো হবে। নাম্বারগুলো বেজোড়, লাকি। প্রদীপের নিচে অন্ধকার থাকাই বাস্তবতা।'

লেখার নিচে কারও নাম-পরিচয় নেই।

চিরকুটের লেখা পড়ে বিস্মিত হলো আহমদ মুসা। সে নিশ্চিত, আগের চিরকুটটি যারা লিখেছিল এ চিরকুটটিও তারাই লিখেছে। কিন্তু তারা জানল কি করে, আমাদের বাড়ির প্রয়োজন, বাড়ি আমরা খুঁজছি!

কারা ওরা ভেবে কোন সুরাহা করতে পারলো না আহমদ মুসা? তবে উপকারী কেউ যে হবে এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। আরেকটা ব্যাপার, বেজোড় সংখ্যার প্রতি তার এত ভালোবাসা কেন? সেদিন একজন ক্লিনার তাকে ফুল দিয়েছিল, আজ ফুল দিল কম বয়সের একজন মহিলা। তাহলে ওরা কি একটা গ্রুপ? এই গ্রুপ তাদেরকে সাহায্য করছে কেন?

কোন প্রশ্নেরই উত্তর নেই তার কাছে।

আহমদ মুসা গাড়ি ড্রাইভ করে সোজা সেই ৩৩৩ নাম্বার বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল।

চারদিকে তাকাল, বিস্ময় ঘিরে ধরল আহমদ মুসাকে। এই ৩৩৩ নাম্বার বাড়ির বিপরীতেই তো ব্রুনাদের মানে তার মায়ের বাড়ি। ওটাই তো এখন ব্ল্যাক লাইটের এখানকার কেন্দ্র। এই বাড়িটা আমরা নিলে তা হবে বাঘের ঘরে ঘোগের বাসার মত। চিরকুটের শেষ লাইনটার কথা মনে পড়ল, 'প্রদীপের নিচে অন্ধকার থাকায় বাস্তবতা!' আহমদ মুসা ভাবল, ওরা যারাই হোক, অভিজ্ঞতা আছে।

এভাবেই এই বাড়িটা পেয়ে যায় আহমদ মুসারা।

এই বাড়িটা নিয়েই তিনজনের মধ্যে কথা হচ্ছিল। ব্রুনা বলেছিল, 'বাইরে থেকে বাড়িটাকে যেমন মনে হয়, ভেতরের অবস্থাটা তার চেয়ে অনেক ভালো। ছোটবেলা থেকে বাড়িটাকে দেখছি, কিন্তু এদিকে আসা কম হতো বলে বাড়ির বাসিন্দাদের সম্পর্কে কখনো কিছুই জানতাম না।

'এদিকে আসা কম হতো কেন? তোমাদের বাড়ি আর এ বাড়িটা তো রাস্তার এপার-ওপার!' আহমদ মুসা বলল।

'খুব কাছে হলেও আমাদের বাড়িটার ফ্রন্ট সাইড ওদিকে মানে উত্তরে।' বলল ব্রুনা।

'এদিকে দিয়ে বের হওয়ার কোন ব্যবস্থা নেই?' আহমদ মুসা বলল।

'আমরা কোনদিন তা খুঁজে দেখিনি।' বলল ব্রুনা।

ব্রুনার বাবা আলদুনি সেনফ্রিড টিভি'র প্রোগ্রাম দেখছিল। অল্পক্ষণ পরেই নিজউ শুরু হবে।

তবু আহমদ মুসাদের কথা সে শুনছিল।

ব্রুনার কথা শুনে সেনফ্রিড ওদিকে তাকাল। বলল, 'আমাদের ঐ বাড়িটা যখন তৈরি হয়, তখন এই সার্কুলার রোড ছিল না। তাই সাধারণভাবে ব্যবহারের জন্য কোন এক্সিট তখন রাখা হয়নি এদিকে। তবে বিশেষ একটা

এক্সিট এদিকে আছে। কিন্তু সেটা গোপনীয়। বাড়ির বৈধ মালিক যখন যিনি থাকেন, তিনিই সেটা জানেন। সে হিসাবে আমিও এটা জানি না। তবে কথায় কথায় ব্রুনার মা আমাকে বলেছিল, 'বিশেষ সিঁড়িটা দিয়ে বেজমেন্টে নামার পর একটা আলমারির সামনে দাঁড়ানো যাবে। আলমারিতে ঢুকে ধাঁধার সমাধান করে একটা কক্ষে প্রবেশ করা যাবে। তারপর ঘরটার দেয়ালে একটা ধাঁধার সমাধান করে পাওয়া যাবে দরজা। এরপর পাওয়া যাবে ভেতর বাহির দুই দিক থেকেই খোলা যায় বাড়ি থেকে বের হওয়ার এমন একটা গোপন দরজা। ডিজিটাল কোড ভেঙে দরজাটা খুলতে হবে। এ অঞ্চলের সবচেয়ে প্রিয় পাঁচ অক্ষরের একটা নাম হলো এই কোড।' থামল আলদুনি সেনফ্রিড।

'মজার স্টোরি বললে বাবা! মা কখনো বলেনি, তুমিও কোন দিন বলনি। আগে জানলে এই ধাঁধা ভাঙার অভিযান আমি চালাতাম।' বলল ব্রুনা।

'এজন্যেই তোমাকে বলা হয়নি এবং তা বলার নিয়মও রাখা হয়নি।' আলদুনি সেনফ্রিড বলল।

'ধন্যবাদ মি. সেনফ্রিড। কথায় কথায় একটা মূল্যবান তথ্য দিয়েছেন আপনি। ধন্যবাদ আপনাকে।'

ব্রুনা কিছু বলতে যাচ্ছিল। এই সময় টেলিভিশনে খবর শুরু হয়ে গেল। মি. সেনফ্রিড হাত তুলে ব্রুনাকে থামতে ইংগিত করে টেলিভিশনের দিকে মনোযোগ দিল।

টেলিভিশনের চ্যানেলটি ব্রুমসারবার্গের লোকাল চ্যানেল।

খবরের শুরুতেই প্রধান খবর হিসাবে মর্মান্তিক এক খুনের ঘটনা প্রচার করল। একই পরিবারের স্বামী-স্ত্রী এবং ষোল সতের ও দশ এগারো বছরের দু'টি শিশুকে নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে।

এক বাক্যে ঘটনার কথা বলার পরই টেলিভিশনের পর্দায় ছবি চলে এল।

ছবির উপর নজর পড়তেই আলদুনি সেনফ্রিড, আহমদ মুসা ও ব্রুনা আঁৎকে উঠল এবং প্রায় এক সাথেই বলে উঠল, 'এ যে সিজার!'

টিভি চ্যানেলটি ঘটনার বিবরণ দিয়ে বলছিল, 'আজ ভোর রাতে কর্তব্যরত পুলিশ রাইনের তীরে আলো নেভানো একটা গাড়িকে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখতে পেয়ে একজন পুলিশ সেদিকে এগিয়ে যায়। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে গাড়িটা দ্রুত পালিয়ে যায়। ঘটনাস্থলে গিয়ে পুলিশ লাশ চারটি পেয়ে যায়। পুলিশের মতে লাশ চারটিকে রাইনে ডুবিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে ওখানে গিয়েছিল খুনিরা। খুনি বা খুনিদের সন্ধানে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।'

আলদুনি সেনফ্রিড টেলিভিশন বন্ধ করে দিয়ে বলল, 'কি বীভৎস হত্যাকাণ্ড। ব্ল্যাক লাইট কি এই হত্যা করেছে, মি. আহমদ মুসা, আপনি কি মনে করেন?'

'সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই মি. সেনফ্রিড। গতকাল আমাদের বাসায় ব্ল্যাক লাইটের লোকরা নিহত হওয়ারই পাল্টা প্রতিশোধ এটা। ব্ল্যাক লাইট এখন মরিয়া হয়ে উঠেছে।' বলল আহমদ মুসা।

'কিন্তু সিজারের উপর প্রতিশোধ নেবে কেন?' বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

'আমাদের বাসায় ব্ল্যাক লাইটের লোকরা নিহত হওয়ার জন্যে তারা সম্ভবত সিজারকেই দায়ী করছে। তারা নিশ্চয় মনে করেছে, ব্ল্যাক লাইটের অভিযানের কথা সিজার আমাদেরকে বলে দিয়েছে, তার ফলেই তাদের ঐ ক্ষতি হয়েছে। সিজারকে তার পরিবারসমেত হত্যা করে তারই প্রতিশোধ নিয়েছে ব্ল্যাক লাইট।' আহমদ মুসা বলল।

'যা হোক, বিশ্বাসঘাতকতার শিক্ষা সে পেয়েছে। আমরা তাকে বিশ্বাস করেছিলাম, তার মর্যাদা সে রাখেনি।' বলল ব্রুনা।

'ব্রুনা, তোমার অভিযোগ ঠিক আছে। কিন্তু তার দিকটাও একবার তোমাদের বিবেচনা করা দরকার। স্ত্রীসহ তার ছেলেমেয়েকে ওরা কিডন্যাপ করে তাদের হত্যা করার ভয় দেখিয়ে সিজারকে ওরা বাধ্য করেছিল তাদের কথা মত চলতে। বেচারা সিজার সত্যিই ফাঁদে পড়ে গিয়েছিল।' আহমদ মুসা বলল।

'ঠিক বলেছেন মি. আহমদ মুসা। বেচারা সিজারের তাদের কথা শোনা ছাড়া করার কিছুই ছিল না। কিন্তু তবু স্ত্রী-সন্তানদের বাঁচাতে সে পারল না, নিজেকেও মরতে হলো। এখন তার জন্যে আমরা কি করতে পারি? পুলিশকে তথ্য দিলে কি কিছু ফল হবে?' বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

'পুলিশকে বলে কোন লাভ নেই। পুলিশকে বলতে গেলে তো ব্রুনার মায়ের এই বাড়ির পরিচয়ও বলতে হয়। বলতে হয় যে, এটাই ব্ল্যাক লাইটের এখানকার হেড কোয়ার্টার। কিন্তু তা বলে দিলে আমাদের কোন লাভ হবে না, সিজারদেরও তা কোন উপকার আসবে না। সিজারের শত্রু এখন আমাদের শত্রু অথবা বলা যায়, আমাদের যারা শত্রু ছিল, তারা সিজারেরও শত্রু হয়েছে। তাদের শাস্তি আমাদেরই দিতে হবে।'

মুহূর্ত খানেকের জন্যে থেমেই আহমদ মুসা বলে উঠল, 'কিন্তু আমি ভাবছি, সিজারকে ব্যবহার করার জন্যে ওরা খুঁজে পেল কেমন করে? খুঁজলই বা কেন? সে যে আমাদের বিশ্বস্ত এটা তারা জানল কিভাবে?'

'হ্যাঁ, মি. আহমদ মুসা, এ দিকটা তো আমি ভেবে দেখিনি। কেন তারা আমাদের সন্ধানে সিজারের পিছু নিল?' বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

আহমদ মুসা ভাবছিল। বলল একটু পরই, 'তাহলে কি তারা আপনাদের স্বজন ও পরিচিত লোকদের উপর চোখ রেখেছে, বিশেষ করে ঐ সব লোক যাদের সাথে ব্রুনার মা'র, ব্রুনাদের বাড়ির সম্পর্ক ভালো নয়! সিজারকে আপনাদের অনুগত মনে করে তাকে চাকরি থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছিল। আপনারা ব্রুমসারবার্গে আসলে তার সাথে যোগাযোগ হবে এই ধারণাতেই ব্ল্যাক লাইট তার উপর নজর রেখেছিল।'

'আপনার কথা ঠিক মি. আহমদ মুসা। এটাই ঘটেছে।' বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

আহমদ মুসা সোফার উপর গা এলিয়ে দিয়েছিল।

সোজা হয়ে বসল। বলল, 'মি. সেনফ্রিড, এতদিন ওরাই শুধু অফেনসিভে এসেছে। এবার আমরাও অফেনসিভে যাব।'

'তার মানে মি. আহমদ মুসা?' বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

'এবার আমরাও কাজ শুরু করবো। প্রথমে আপনাদের বাড়ি মানে ব্রুনার মা, আপনার স্ত্রীর বাড়িতে প্রবেশ করতে চাই।' আহমদ মুসা বলল।

'কেন? ওখানে কি পাবেন?' বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

আলদুনি সেনফ্রিড ও ব্রুনা দু'জনেরই চোখে-মুখে বিস্ময়।

'কি পাব জানি না, কি খুঁজতে যাচ্ছি তাও জানি না। কিন্তু সামনে এগোবার জন্যে কিছু পেতে হবে, জানতে হবে। জানতে হবে কেন ব্রুনার মা মানে আপনার স্ত্রী বদলে গেল? কেন সম্পত্তি থেকে আপনাদের শুধু বঞ্চিত করাই নয়, আপনাদেরকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে চান তিনি? এর উত্তর ঐ বাড়িতেই প্রথমত খুঁজতে হবে।'

বলে সোফায় আবার গা এলিয়ে দিল আহমদ মুসা। চোখ দু'টিও তার বুজে গেল।

ব্রুনা কিছু বলতে যাচ্ছিল। ঠোঁটে আঙুল চেপে ব্রুনার বাবা ব্রুনাকে নিষেধ করল কথা বলতে। ব্রুনাকে কানে কানে বলল, 'উনি ভাবছেন, ভাবতে দাও।'

ব্রুনা চুপ করে গেল।

তার চোখ দু'টি আহমদ মুসার উপর নিবদ্ধ।

আহমদ মুসার এমন আত্মসমাহিত রূপ ব্রুনার কাছে নতুন। অপরূপ এই আহমদ মুসা ব্রুনার কাছে। চোখ ফেরাতে পারল না সে সেদিক থেকে।

চোখ খুলল আহমদ মুসা।

সোজা হয়ে বসল। বলল, 'মি. সেনফ্রিড, ব্রুনা, আপনারা মিসেস কারিনা কারলিনের মধ্যে পরিবর্তনটা ঠিক কখন লক্ষ করেছেন?'

'বছর দুয়েক আগে এক গ্রীষ্মে আমরা হামবুর্গে গিয়েছিলাম আমার পৈতৃক বাড়িতে। উপলক্ষ ছিল আন্তর্জাতিক কটন প্রদর্শনী দেখা। সেখানে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে কারলিন। তাকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। পনের দিন

হাসপাতালে থাকে। হাসপাতাল থেকে আসার পরই তার পরিবর্তনগুলো চোখে পড়তে থাকে।' বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

'আপনার স্ত্রীর সবচেয়ে বেশি দুর্বলতা রয়েছে এমন কিছু বিষয় আছে? মানে আমি বলতে চাচ্ছি, এমন কিছু বিষয় তার আছে, যেখানে অন্যথা হলে তিনি খুব বেশি রেগে যান?' আহমদ মুসা বলল।

আলদুনি সেনফ্রিড ও ব্রুনা দু'জনের কেউ সংগে সংগে উত্তর দিল না। ভাবছে তারা দু'জনেই।

আলদুনি সেনফ্রিড তাকাল ব্রুনার দিকে।

ব্রুনাই শুরু করল কথা, 'হ্যাঁ, স্যার, না বলে তার ঘরে ঢোকা, তার পারস ও মোবাইলে হাত দেয়া এবং তিনি গোসলে ঢুকলে বিরক্ত করাকে তিনি একেবারেই সহ্য করেন না। কিন্তু আগে মায়ের এই অভ্যেস ছিল না।'

'ব্রুনা ঠিকই বলেছে মি. আহমদ মুসা। এই সাথে আমার অনুভূতির কথা বলি। হাসপাতাল থেকে তার ফেরার পর আমার মনে হয়েছে, সে নতুন জীবন শুরু করছে। মাঝে মাঝে মনে হতো, অসুখের ফলে তার মাথার কোন ক্ষতি হয়েছে কিনা। তার স্মৃতিতে কোন গণ্ডগোল দেখা দিয়েছে কিনা। কিন্তু তার সচেতনতা ও সতর্কতা দেখে মনে হতো সে স্বাভাবিক আছে।' বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

'টাকা-পয়সা, গুরুত্বপূর্ণ কাগজ-পত্র কিংবা মূল্যবান অলংকারের মত জিনিস রাখার তার অভ্যাস কেমন ছিল?' আহমদ মুসা বলল।

'মূল্যবান জিনিস আলমারি, আলমারির লকার, ব্রিফকেস এসব জায়গাতেই রাখতো।' বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

'সব সময় কি তিনি তার শোবার ঘর লক করে রাখা পছন্দ করতেন?'

'ঘর লক করতেন না। তার টয়লেট লক করা থাকতো। ব্রিফকেস, আলমারি তো বটেই। হাসপাতাল থেকে আসার পর তিনি শোবার ঘর ও টয়লেটের লক পাল্টেছিলেন। লক এন্ড কী'র বদলে ঘরে ডিজিটাল লক লাগিয়েছিলেন। ঘরের ডিজিটাল লকের কোড তিনি কাউকে বলেননি।' বলল আলুদনি সেনফ্রিড।

'ধন্যবাদ মি. সেনফ্রিড।' আহমদ মুসা বলল।

কথা শেষ করে একবার ঘড়ির দিকে তাকাল। বলল, ‘ওঠা যাক মি. সেনফ্রিড।’

সবাই উঠল।

রাত তখন ২টা।

আহমদ মুসা তাহাজ্জুত নামাজ শেষ করে জায়নামাজটা রেখে পোষাক পাল্টে নিল। কালো প্যান্ট, কালো জ্যাকেট, কালো হ্যাট। একদম ব্ল্যাক লাইটের মতই পোষাক।

তৈরি হয়ে দাঁড়াল আয়নার সামনে।

আয়নার দিকে তাকিয়েই চমকে উঠল আহমদ মুসা। দেখল, পেছনে ব্রুনা দাঁড়িয়ে।

আহমদ মুসা দেখতে পায়নি, ব্রুনা প্রায় ঘন্টা খানেক থেকে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। আহমদ মুসার নামাজ ও পোষাক পাল্টানো সবই দেখেছে।

ব্রুনা তার বাবার কাছ থেকেও শুনেছিল যে, আজ রাতে আহমদ মুসা ঐ বাড়িতে ঢুকবে। ব্রুনা রাত নয়টা থেকেই পাহারা দিচ্ছে আহমদ মুসা কখন বের হয়। অপেক্ষায় থাকতে থাকতে অতিষ্ঠ হয়ে শেষ পর্যন্ত শোবার জন্যে গিয়েছিল, কিন্তু টেনশানে তার ঘুম আসেনি। তাই রাত ১টার দিকে আবার এসেছে আহমদ মুসার ঘরের সামনে।

ব্রুনার উপর চোখ পড়তেই আহমদ মুসা ঘুরে দাঁড়াল। বলল, ‘ব্রুনা, এই রাতে তুমি এখানে? কিছু ঘটেছে?’ আহমদ মুসার কণ্ঠে কিছুটা উদ্বেগ।

‘না, কিছু ঘটেনি।’ বলল ব্রুনা।

‘তাহলে কেন তুমি এই রাতে এখানে?’ আহমদ মুসা বলল। তার কন্ঠ কিছুটা কঠোর শোনাল।

ব্রুনা একবার চোখ তুলে তাকাল আহমদ মুসার দিকে। তার চোখে-মুখে কিছুটা আহত ভাব। সম্ভবত আহমদ মুসার কন্ঠের কারণেই। বলল, 'কেন আসতে পারি না?'

'না, পার না ব্রুনা। আমি আগেই বলেছি। তুমি জান, কেন পার না।' আহমদ মুসা বলল।

'জানি। কিন্তু সব ক্ষেত্রেই এটা প্রযোজ্য? মানুষের সম্পর্ক, আস্থা এত ভঙ্গুর?' বলল ব্রুনা।

'ভঙ্গুর, কি ভঙ্গুর নয়, প্রশ্ন এটা নয়। প্রশ্ন নীতির। এ ধরনের দেখা-সাক্ষাত নিষেধ করা হয়েছে।' আহমদ মুসা বলল।

'তাহলে পারস্পরিক আস্থা-বিশ্বাসের কোন মূল্য নেই?' বলল ব্রুনা।

'নব্বই ভাগ ক্ষেত্রে এ মূল্য রক্ষিত হতে পারে, দশ ভাগ ক্ষেত্রে তা রক্ষিত নাও হতে পারে। এই দশ ভাগের বিচ্যুতি রোধ করার জন্যে সবাইকেই এই নীতি-বিধান মেনে চলতে হবে।' আহমদ মুসা বলল।

'আপনি কি মনে করেন, এই নব্বই ভাগের মধ্যে আপনি?' বলল ব্রুনা। তার ঠোঁটে হাসির রেখা।

'আমি আমাকেও বিশ্বাস করি না ব্রুনা। এমন বিশ্বাস করতে নিষেধ করা হয়েছে। পরিস্থিতির কারণে শয়তান যে কোন সময় যে কারও উপর বিজয়ী হতে পারে। আমার উপরও হতে পারে।' আহমদ মুসা বলল।

'আমি এভাবে কখনও ভাবিনি।' বলল ব্রুনা।

'এবার ভাবো ও চলে যাও।' আহমদ মুসা বলল।

'আমি আপনার সাথে ঐ বাড়িতে ঢুকতে চাই। আপনাকে অনেক সাহায্য করতে পারবো আমি।' বলল ব্রুনা।

আহমদ মুসার দুই চোখ কপালে উঠেছে। বলল, 'যে কারণে তোমাকে একা আমার ঘরে আসতে নিষেধ করেছি, সে কারণেই তো আমি তোমাকে সাথে নিতে পারি না।'

ব্রুনা সংগে সংগে উত্তর দিল না। মাথা নিচু করে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল।

তারপর মাথা তুলেই বলল, ‘আমি যদি আপনার গৌরীর বোন হিসাবে এটা দাবী করি?’

‘কি দাবী করতে চাও?’ আহমদ মুসা বলল।

‘আপনার সঙ্গ, আপনার সান্নিধ্য, যা আর অবৈধ হবে না।’ মাথা নিচু করেই বলল ব্রুনা।

‘ব্রুনা!’ আহমদ মুসা বলল। তার কন্ঠ চাপা চিৎকারের মত শোনাল।

মুখ তুলল ব্রুনা। তার চোখ দু’টি ছল ছল করছে অশ্রুতে। বলল, ‘আপা যা করেছে, আমি তা করতে পারব না কেন? আপা তো নেই। আমি তার বোন। বোন হিসাবে তার উত্তরাধীকারীও।’ বলে দু’হাতে মুখ ঢেকে কান্নায় ভেঙে পড়ল ব্রুনা।

আহমদ মুসা সংগে সংগে কিছু বলল না। সুযোগ দিল কান্নার।

এক সময় এগিয়ে গেল ব্রুনার দিকে আহমদ মুসা।

ব্রুনার মাথায় হাত রাখল আহমদ মুসা।

ব্রুনা মুখ থেকে দু’হাত সরিয়ে চকিতা হরিণীর মত চোখ তুলল আহমদ মুসার দিকে। তার মুখ অশ্রু ধোয়া।

সার্কুলার রোডের এপারে দাঁড়িয়েই আহমদ মুসা ঠিক করতে চাইল ওপারের বাড়িটায় প্রবেশ করবে কোন জায়গা দিয়ে।

গোটা বাড়িটাই প্রাচীর ঘেরা। প্রাচীরের এদিকটা সাত আট ফুটের মত উঁচু।

রোডের পর ফুটপাত। পাথর বিছানো। তার পর ফাঁকা জায়গা কিছুটা, রাস্তার লম্বালম্বি বাড়িটার সীমা পর্যন্ত। ও জায়গা বাড়িটারই সম্পত্তি। এই ফাঁকা জায়গা ঘাসে আচ্ছাদিত। মাঝে মাঝে ফুলের গাছ ও আঙুরলতা। আঙুরলতাগুলো প্রাচীরের উপর পর্যন্ত উঠে গেছে।

আহমদ মুসা ভাবল, সার্কুলার রোড এখন প্রায় জনশূন্য হলেও প্রাচীর টপকে বাড়িতে প্রবেশ নিরাপদ নয়। পুলিশ কিংবা কারও চোখে হঠাৎ পড়েও যেতে পারে।

বাড়ির পূব দিকের সীমা পর্যন্ত গেল। সেখান থেকে প্রাচীরটা বাঁক নিয়ে উত্তর দিকে চলে গেছে। এই দেয়ালের পূব পাশ বরাবর প্রশস্ত ফাঁকা জায়গায় ফলের বাগান। তার মাঝে মাঝে আঙুরের ঝাড়ও। বাগানের পর ফসলের ক্ষেত ও নদীর তীর বরাবর গিয়ে পাড়ের ঢাল দিয়ে প্রায় পানির কাছ পর্যন্ত নেমে গেছে।

খুশি হলো আহমদ মুসা। প্রাচীরের এদিক দিয়ে বাড়িতে প্রবেশ নিরাপদ হবে।

সার্কুলার রোড পার হয়ে আহমদ মুসা বাড়ির পূব পাশের প্রাচীরের গোড়ায় গিয়ে দাঁড়াল।

প্রাচীরের গোড়ায় একটা গাছের আড়ালে বসল আহমদ মুসা। বাড়িতে ঢোকার আগে গোটা বিষয়টা একবার ভেবে নেয়া দরকার। প্রথম কথা হলো, মি. আলদুনি সেনফ্রিড বাড়ির যে গোপন পথের বিবরণ দিয়েছেন, তার বাইরের

এক্সিটটা বাড়ির দক্ষিণ পাশে। দ্বিতীয়ত, দক্ষিণ পাশের কোথায় হতে পারে সেই এক্সিট? আপাতত শেষ প্রশ্নের সমাধানটাই প্রয়োজন।

ভাবল আহমদ মুসা, কিন্তু ফল হলো না। গোপন পথের এক্সিট নিশ্চয় ছোট বা বড় কোন ঘরে হবে। সেই ঘর খুঁজে পাওয়াটাই হবে প্রথম কাজ। অবশ্য কোন দেয়ালেও সেই এক্সিট দরজাটা থাকতে পারে, তবে তার সম্ভাবনা কম।

ঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে উঠে দাঁড়াল আহমদ মুসা।

রাত আড়াইটা বাজে।

তাকাল আহমদ মুসা প্রাচীরের মাথার দিকে।

এই প্রাচীর ডিঙানো তার জন্য কিছুই নয়, কিন্তু ওপারে কি আছে?

আহমদ মুসা লাফিয়ে উঠে নিজের দেহটাকে প্রাচীরের মাথায় শুইয়ে দিল। প্রাচীরের ওপারে তাকিয়ে তার মনে হলো ঘাসে ভরা উন্মুক্ত চত্বর। চত্বরের আলোটা বেশ দূরে। এদিকটা অনেকটায় আলো-অন্ধকার।

প্রাচীর থেকে ঝুলে পড়ে নি:শব্দে নিচে নামল আহমদ মুসা। তারপর ক্রলিং করে দ্রুত এগোলো বাড়ির দক্ষিণ পাশের দিকে। গিয়ে পৌঁছল দক্ষিণ পাশে। দক্ষিণের প্রাচীর থেকে বাড়ির ব্যবধান বেশ, প্রায় আট দশ গজের মত।

এই অংশটা মোটামুটি আলোকিত। রাস্তার আলোও কিছুটা পড়েছে এখানে। তাছাড়া বাড়ির নিজস্ব আলোও আছে দক্ষিণ পাশের দু'প্রান্তে দু'টো। রাতের কুয়াশার কারণে আলো ডিম লাইটের মত দেখাচ্ছে।

বাড়ির দক্ষিণ পাশটায় নজর বুলাল আহমদ মুসা।

বাড়ির এ দক্ষিণ পাশে কোন বারান্দা ও দরজা নেই। গোটা চারেক জানালা আছে। জানালাগুলো লোহার গরাদ দিয়ে বন্ধ, যা খুব স্বাভাবিক নয়। আহমদ মুসার মনে হলো গরাদের পর জানালায় লোহার গ্রীলও রয়েছে।

ঘরগুলোতে মানুষ থাকে কি? চাকর-বাকর থাকতেও পারে। আর এখন ব্ল্যাক লাইট তাদের কি পরিমাণ লোক এখানে রেখেছে, তা বলা মুশকিল। সুতরাং জানালার পথ নিরাপদ নয়। তার অভিযানটা গোপনে তথ্য সংগ্রহের জন্যে। সংঘাতে জড়িয়ে পড়লে এই কাজ সহজে হবে না। তাই গোপন পথ ব্যবহারের কোন বিকল্প নেই।

কিন্তু কোন্ ঘর কিংবা কোথায় পাওয়া যাবে সেই গোপন পথের মুখ?

বাড়ির দক্ষিণ প্রান্তটা সরল রেখার মত নয়। পূর্ব প্রান্তে, মাঝখানে ও পশ্চিম প্রান্তে তিনটি ঘর সামনে দক্ষিণ দিকে এগিয়ে আছে। মাঝের ঘরের দু'পাশে বর্গাকারের দু'টি চত্বরের সৃষ্টি হয়েছে যার দক্ষিণ প্রান্তই মাত্র খোলা।

সামনে বেড়ে যাওয়া তিনটি ঘরের দক্ষিণ দেয়ালে একটি করে জানালা। চতুর্থ জানালাটি মাঝের ঘরের পূব পাশের বর্গাকৃতি চত্বরের উত্তর দেয়ালে। কিন্তু মাঝের ঘরের পশ্চিম পাশের চত্বরের উত্তর দেয়ালে এ ধরনের কোন জানালা নেই।

আহমদ মুসা বাড়ির দক্ষিণ পাশের গোটা্ অবস্থা পর্যালোচনা করে এই একটাই অসংগতি পেল। শুধু সংগতি বিধানের প্রয়োজনেও এই জানালার দরকার ছিল। কিন্তু জানালা রাখা হয়নি কেন? জানালার স্থানকে কি অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছে!

এখানেই কি হতে পারে গোপন পথের এক্সিট ও এন্ট্রি?

দেয়ালটির দিকে এগোলো আহমদ মুসা।

পেন্সিল টর্চ ফেলল দেয়ালের উপর।

দেয়ালে খাড়া ও সমান্তরাল লাইন টানা। তার ফলে বর্গক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়েছে সেখানে। দু'পাশে সামনে বেড়ে যাওয়া দুই ঘরের দেয়ালেও টর্চের আলো ফেলল সে। দেখল সব দেয়ালেই অনুরূপ বর্গক্ষেত্র।

দেয়ালের আরও ক্লোজ হলো আহমদ মুসা। পেন্সিল টর্চটাকে আরও ক্লোজ করল দেয়ালের উপর। আহমদ মুসা লক্ষ করল, দেয়ালের প্রতিটি বর্গক্ষেত্রে এক বা একাধিক জার্মান বর্ণ খোদাই করা।

দু'পাশের দুই কক্ষের দেয়ালেও এটাই দেখল সে।

আহমদ মুসার টর্চ ফিরে এল জানালাহীন দেয়ালটিতে আবার।

আহমদ মুসার দুই চোখ খুঁজছে গোপন পথের এক্সিট ও এন্ট্রি ডোর। আহমদ মুসার বিশ্বাস এই দেয়ালেই তা হবে।

আহমদ মুসা দেয়ালটির তিন ফুট থেকে পাঁচ ফুট উঁচু সমান্তরালের প্রতিটি বর্গক্ষেত্র এক এক করে পরীক্ষা করতে লাগল। কারণ সে নিশ্চিত যে, এ রকম কোন দরজা এই দেয়ালে থাকলে এই উচ্চতার মধ্যেই তা থাকবে।

দেয়ালের মাঝ বরাবর এসে ঠিক তিন ফুট উচ্চতার লেভেলে একটা বর্গক্ষেত্রের উপর আহমদ মুসার টর্চ থেমে গেল। ব্যস্ত হয়ে উঠল আহমদ মুসার দুই চোখ।

বর্গক্ষেত্রটিতে তিনটি জার্মান বর্ণ বড় বড় হরফে খোদাই করা। এর মাঝে আহমদ মুসা দেখল সবগুলো জার্মান বর্ণ একটা ছকের আকারে সাজানো। এ বর্ণগুলোর রং দেয়ালের রঙের সাথে মিলানো বর্গক্ষেত্রের অন্যান্য বর্ণের রং থেকে আলাদা। বর্গক্ষেত্রের বড় বর্ণগুলো গাঢ় গ্রীন রংয়ের, কিন্তু ছকের বর্ণগুলো দেয়ালের পাথরের মতই অফ হোয়াইট রঙের। টর্চের ফোকাস একটু দূরে সরিয়ে নিলে এগুলোকে আলাদা চেনা যায় না।

ছকের উপর পেন্সিল টর্চের আলো আরও ঘনিষ্ঠ করে দেখল গোটা ছক একটা 'কী বোর্ড'-এর মত। আর প্রতিটি বর্ণ একটা করে 'কী'!

চোখ দু'টি আনন্দে নেচে উঠল আহমদ মুসার। আহমদ মুসা নিশ্চিত, গোপন পথে ঢোকার চাবিকাঠি পেয়ে গেছে সে। এখন কোড বা ধাঁধার সমাধার করার পালা।

মনে পড়ল আলদুনি সেনফ্রিডের কথা। এ অঞ্চলের জনপ্রিয় একটা নামকে কোড হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। সে জনপ্রিয় নামটা কি হতে পারে?

আহমদ মুসা ব্রুমসারবার্গের বর্তমান ও অতীত ইতিহাসের দিকে তাকাল। ব্রুমসারবার্গের একটি প্রিয় নাম 'স্যাক্সন'। এটা তাদের জাতিগত একটা নাম, গৌরবেরও নাম। কিন্তু স্যাক্সন নামে ছয়টি জার্মান বর্ণ আছে আর মি. সেনফ্রিড বলেছেন, কোডের নামটি হবে পাঁচ বর্ণের। স্যাক্সনদের প্রথম রাজা ছিল 'হেনরিও'। এ নামও প্রিয় এ অঞ্চলের স্যাক্সনদের কাছে। তার নামেরও ছয়টি বর্ণ। ব্রুমসারবার্গের নামকরণ স্যাক্সনদের যে মহান বীরের নামে, তার নাম 'ব্রুমসার'। এটা এ অঞ্চলের লোকদের কাছে অত্যন্ত প্রিয় নাম। তিনি ছিলেন ক্রুসেড ফেরত মহান বীর। কিন্তু তার নামেরও জার্মান বর্ণ ছয়। পাঁচ নয়। আবার

ক্রুমরারের মেয়ে 'মিসিলডিস'-এর নাম এ অঞ্চলের মানুষের ঘরে ঘরে। আত্মোৎসর্গকারী মিসিলডিস তাদের কিংবদন্তির নায়িকা। কিন্তু তার নামেও দশটি জার্মান বর্ণ রয়েছে।

তাহলে? তাহলে কি রাইনল্যান্ড হতে পারে। এতো এখানকার সবার প্রিয় জন্মভূমি। কিন্তু এতে তো নয়টি জার্মান বর্ণ।

ল্যান্ড বাদ দিলে থাকে রাইন। 'রাইন' নদী তো সকলের কাছে প্রিয় নাম! সংগে সংগেই আনন্দে নেচে উঠল আহমদ মুসার মন। হ্যাঁ, এতক্ষণ 'রাইন'-এর নাম তার মনে পড়েনি কেন? এই অঞ্চলের সমৃদ্ধি তো নদী 'রাইন'-এর দান। 'রাইন'ই তো এ অঞ্চলের মানুষের সর্বকালের সর্বপ্রিয় নাম! এই নামের বর্ণের সংখ্যাও তো পাঁচ।

সংগে সংগেই আহমদ মুসা দেয়ালের বর্ণের ছকে রাইনের বর্ণগুলোর উপর ক্লিক করল।

ক্লিক করেই দু'পা পেছনে সরে এল।

অসীম আশা নিয়ে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ দেয়ালের এই স্থানটার উপর।

কয়েক মুহূর্তের অপেক্ষা।

তার পরেই দেখল দেয়াল থেকে তিন ফুটের মত প্রশস্ত ও পাঁচ ফুটের মত উচ্চতার একটা অংশ নি:শব্দে দেড় ফুটের মত ভেতরে ঢুকে গেল এবং একই রকম নি:শব্দে এক পাশে সরে গেল।

আহমদ মুসা পেন্সিল টর্চের আলো ওয়াইড অপশনে নিয়ে ফোকাসটা উন্মুক্ত দরজা দিয়ে ভেতরে ফেলল। দেখা গেল আলো গিয়ে পড়েছে একটা ঘরের মেঝেতে।

আহমদ মুসা মেঝের এদিক ওদিক আলোটা ঘুরিয়ে ঢুকে গেল ঘরের ভেতরে।

দরজাটা বন্ধ হলো না। তার মানে দরজা বন্ধ হবার স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা নেই।

দরজা থেকে সরে যাওয়া দেয়াল খণ্ডের উপর আলো ফেলল আহমদ মুসা।

অনুসন্ধান করল সেই বর্ণের ছক। যখন দরজা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয় না, তখন দেয়ালের এপাশেও সেই বর্ণের ছক নিশ্চয় থাকবে।

ছকটা পেয়ে গেল আহমদ মুসা।

রাইনের বর্ণগুলো আবার টাইপ করল বর্ণের ছকের উপর্ দেয়াল খণ্ডটি একটু দরজার সামনে সরে এসে তারপর দেয়াল বরাবর পৌঁছেই সামনে সরে এগিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।

ঘরের চারদিকে আলো ফেলল আহমদ মুসা। ঘরটি স্টোর রুমের মত।

অনেক কনটেইনার বাক্স ঘরের চারদিকে সাজানো। একটা মাত্র বড় আলমারি উত্তর দেয়ালে।

ঘর চারদিক থেকে বন্ধ, দরজা জানালাহীন। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত।

দেয়ালটা প্রথমে ভালোভাবে চেক করল আহমদ মুসা। দক্ষিণ দেয়ালের মত আর কোন দেয়ালে গোপন দরজা থাকার সংকেত পাওয়া যায় কিনা!

ইঞ্চি ইঞ্চি করে আহমদ মুসা দেয়ালের সকল সম্ভাব্য স্থান চেক করল। কিন্তু কোন সংকেতই মিলল না।

মনে পড়ল আলদুনি সেনফ্রিডের কাছ থেকে শোনা একটা কথা। আলমিরার ভেতর দিয়ে গোপন পথের দরজা রয়েছে।

আলমারির দিকে এগিয়ে গেল আহমদ মুসা।

আলমারির দরজা খুলল।

ছোট ছোট টিনের কনটেইনারে সাজানো আলমারির তাক। তাক ধরে টানাটানি করল আহমদ মুসা। কোন দিকে নড়াচড়া নেই, স্থির তাক। আলমারি বন্ধ করে আহমদ মুসা এগোলো বড় বড় বাক্সের দিকে।

দক্ষিণ দিক ছাড়া সব দেয়ালের পাশ দিয়ে সাজানো বাক্স। একটি একটি করে সব বাক্স খুলল আহমদ মুসা। নানা ধরনের কনটেইনারে সাজানো বাক্সগুলো। কনটেইনার সরিয়ে বাক্সগুলোর তলাও চেক করল আহমদ মুসা। তলাগুলো ফিক্সড।

তাহলে গোপন এন্ট্রি পথ বা দরজাটা কোথায়? সন্দেহ নেই, এই ঘরেই সেটা থাকবে।

ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আহমদ মুসা ঘরের চারদিকটা আবার ভালো করে দেখল। যুক্তির দাবী, ভাবল সে, গোপন প্রবেশ পথটা উত্তর দেয়ালেই থাকবে। উত্তর দেয়ালেই আছে বিশাল আলমারিটা।

আহমদ মুসা আবার গিয়ে আলমারিটা খুলল।

আবার টানাটানি, ঠেলাঠেলি করল তাক ধরে। কিন্তু একটুও নড়াচড়া করল না কোনও দিকে।

আলমিরার তাকটা দূর নিয়ন্ত্রিতও হতে পারে, ভাবল আহমদ মুসা।

এবার আহমদ মুসা আলমারির ভেতরের গায়ের বোতাম, সুইচ বা এ ধরনের কিছু খোঁজ করতে লাগল। কিন্তু আলমারির গা পরিস্কার, সন্দেহ করার মত কোথাও কিছু নেই।

কন্টেইনার তুলে তাকগুলো পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিল আহমদ মুসা।

বাইরের দেয়ালে বেজমেন্ট থেকে তিন ফুট উপরে বর্ণের ছক পাওয়া গিয়েছিল। এবারও আহমদ মুসা তিন ফুট উপরের তাক থেকে অনুসন্ধান শুরু করল।

তাকের ডান দিক নয়, বাম প্রান্ত থেকে অনুসন্ধান শুরু করল। ইউরোপীয়রা সবাই কাঁটা চামচ দিয়ে খায়, এদের বাম হাত বেশি চলে। মুসলমানরা ডান দিককে প্রাধান্য দেয় বলে তারা ডান দিককে হয়তো বেশি পছন্দ করে। ক্রুসেডের সময় থেকে এ বিষয়টা আরও বেশি নজরে আসে।

বাম দিকের প্রথম কন্টেইনার তুলতেই আহমদ মুসা স্টিলের তাকে স্টিলের রঙেরই বোতাম আকৃতির একটা কিছু দেখতে পেল।

আহমদ মুসা কন্টেইনারটা পাশে রেখে ডান হাত দিয়ে বোতামটায় চাপ দিল। সাথে সাথেই মৃদু কেঁপে উঠল তাক।

পেছন দিকে সরতে লাগল তাকটা।

ওদিকটা দেখা যেতে লাগল।

দেখা গেল, ওদিকে আলমারির আরেকটা দেয়াল।

ধীরে ধীরে পেছনে সরে যাচ্ছিল তাকটা।

যাওয়ার মত স্পেস বের হতেই আহমদ মুসা দ্রুত ওপাশে গিয়ে আলমারির বন্ধ দরজার হাতল ধরে চাপ দিল। খুলে গেল আলমারির দরজা।

ঘরের দিকে নজর পড়তেই আঁৎকে উঠল আহমদ মুসা। বড়-সড় ঘর। অনেক বেড। ছয় জন লোক শুয়ে আছে, ঘুমুচ্ছে নিশ্চয় তারা। আরও ছয়টি বেড খালি। যারা শুয়ে আছে, তাদের প্রত্যেকের পাশেই মাইক্রো সাইজের মডার্ন স্টেনগান।

এরা নিশ্চয় বাড়ির প্রহরী হবে, ভাবল আহমদ মুসা। তাহলে যারা বেডে নেই তারাও প্রহরী, তাদের স্টেনগান নিয়ে তারা পাহারায় গেছে।

আহমদ মুসা ঘরের দক্ষিণ প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে। তবে উত্তর প্রান্তে আরেকটা দরজা দেখা যাচ্ছে।

আহমদ মুসা বিড়ালের মত নি:শব্দে এগোলো।

লোকগুলোকে দেখেই আহমদ মুসা মুখে মিনি সাইজের একটা গ্যাসমাস্ক পরে নিয়েছে। হাতে নিয়েছে ক্লোরোফরম গান। এই গান দিয়ে ৩০ গজ দূর পর্যন্ত মানুষকে সংজ্ঞাহীন করে ফেলা যায়।

আজ আহমদ মুসার নি:শব্দ অনুসন্ধানের দিন। আজ কোন সংঘর্ষে যাওয়া যাবে না। নিরপদ্রুপেই তাকে কাজ সারতে হবে।

ঘর থেকে বেরুবার সময় এদের ঘুম আরও গভীর করে দিয়ে যাবে, এই লক্ষেই ঘর থেকে বেরুবার জন্যে এগোলো আহমদ মুসা।

ঘরের মাঝখানে আসতেই আহমদ মুসা দরজার ওপাশে শব্দ শুনতে পেল। কেউ যেন দরজা খুলছে।

আহমদ মুসা দ্রুত একটা খাটের নিচে ঢুকে গেল।

দরজা খুলে ঘরে প্রবেশ করল চারজন।

ঘরের দরজা লাগিয়ে দিয়ে ওরা চারজন এসে তাদের নিজ নিজ বিছানায় শুয়ে পড়ল।

‘এই যে আমরা প্রতিদিন রাতে বাইরোটেশনে ৪ জন করে ফাঁকি দিয়ে এসে শুয়ে কাটাচ্ছি, ধরা পড়লে কি হবে বলতো?’ বলল চারজনের একজন।

‘কি আর হবে, প্রাণ যাবে? কিন্তু ধরবে কে? রাত ১টা ২টা পর্যন্ত ফুর্তি করে এখন বেঘোরে ঘুমুচ্ছে সবাই। তাছাড়া দু’জনতো পাহারায় আছেই। কেউ খোঁজ করলে আমরা জানতে পারব।’ বলল দ্বিতীয় এক জন।

‘শালা আমরা কাজের দায়ে ঘুমাতে পারি না, আর ওরা ফুর্তি করে ঘুমায় না। প্রতিদিন এটা ওরা কেমন করে পারে?’ বলল তৃতীয় আর এক জন।

‘পারবে না কেন, অর্ধেক দিন তো আবার ঘুমায়।’ বলল প্রথম জন।

‘রাখ এসব কথা, কাজের কত দূর বলত? আর কত দিন থাকতে হবে আমাদের এখানে?’ চতুর্থ জন বলল।

নিরব কিছুক্ষণ সবাই।

নিরবতা ভেঙে সেই প্রথম জন বলল, ‘একথা আমরা জানবো কি করে! তবে সেদিন রাতে আমি পাহারায় ছিলাম ম্যাডামের ঘরের সামনে। তিনি টেলিফোনে কাউকে বলছিলেন যে, ‘দস্তখতের সমস্যা ঠিক হয়ে গেছে। ফিংগার প্রিন্টটা ডেভলপ করছে, একটু সময় লাগবে। আমি মনে করছি, মাস খানেকের মধ্যেই স্যাক্সন স্টেটের হস্তান্তর হয়ে যাচ্ছে।’ ম্যাডামের কথা সত্য হলে মাস খানেকের মধ্যেই আমাদের এখানকার পার্ট চুকবে।’

আহমদ মুসা খাটের তলে গোগ্রাসে কথাগুলো গিলছিল।

প্রথম জনের কথা শেষ হতেই চতুর্থ জন বলে উঠল, ‘কিন্তু সেদিন কনরাড সাহেব ম্যাডামের সাথে বাড়িতে ঢুকতে ঢুকতে বলছিলেন, ‘সেনফ্রিড ও তার দুই মেয়েকে ধরে তারপর দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে না পারলে এখানকার কাজ আমাদের শেষ হবে না। স্টেটের হস্তান্তরও সম্ভব হবে না। কনরাড সাহেবের কথাকেই বেশি গুরুত্ব দিতে হবে।’

‘কিন্তু কয়েক বার ফাঁদে ফেলেও তো ওদের আটকাতে পারা গেল না। কবে আবার ওরা ধরা পড়বে?’ বলল দ্বিতীয় জন।

‘সেদিন এক সাহেব বললেন, এবারের মত জটিল অবস্থা নাকি অতীতের আর কোন প্রজেক্টে হয়নি।’ তৃতীয় জন বলল।

‘থাক এসব জটিলতা নিয়ে চিন্তা করে আমাদের লাভ নেই। কিছুই আমার মাথায় আসে না। ম্যাডাম তো এ সম্পত্তির মালিক। মালিক কোন কিছু হস্তান্তর

করলে জটিলতার প্রশ্ন আসে কি করে?' বলল প্রথম জন। তার কন্ঠে অধৈর্যের প্রকাশ।

'সেটাই তো আমরা বুঝি না। ম্যাডামের আচরণ দেখলে তো বুঝা যায় না তিনি সম্পত্তির মালিক। তিনি তো দেখি সবাইকে ভয় করে চলেন।' চতুর্থ জন বলল।

'রাখ এসব কথা। ঘুমাবো। সাধারণভাবে যে বেতন হয়, তার চারগুণ বেতন পাচ্ছি। মরে গেলে পরিবার সারা জীবন চলার মত টাকা পাবে। আর কি চাই! এস ঘুমিয়ে পড়ি।' বলল তৃতীয় জন।

চতুর্থ জন বলল, 'ঠিক বলেছে। কিন্তু আমার ওষুধ খাওয়া হয়নি। তোমাকে দিয়েছিলাম, আমার ওষুধটা দাও।'

'সেটা আমার ব্যাগের মধ্যে আছে। খাটের তলে আছে, বের করে দিচ্ছি।' বলে বিছানার উপর উঠে বসল তৃতীয় জন।

আহমদ মুসা যে খাটের তলায়, সে খাটটাই তৃতীয় জনের। সে ওষুধ নেবার জন্যে নামলেই তো ধরা পড়ে যাবে।

আহমদ মুসা আর এক মুহূর্তও নষ্ট করল না।

বাম হাতে মুখের গ্যাস মুখোশকে টাইট দিয়ে ডান হাত দিয়ে ক্লোরোফরম গানের ব্যারেল খাটের পাশ দিয়ে ঊর্ধমুখী করে ট্রিগার টিপল। অদৃশ্য এক পশলা গ্যাস বেরিয়ে গেল ক্লোরোফরম গান থেকে।

সংজ্ঞালোপকারী এই ক্লোরোফরম গ্যাস বাতাসের চেয়ে কয়েক গুণ দ্রুত গতিতে চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে পারে। একটা ফায়ারে যে পরিমাণ কনসেন্ট্রেটেড ক্লোরোফরম গ্যাস বের হয়, তাতে তিরিশ বর্গফুট এলাকার সবাইকে মুহূর্তেই সংজ্ঞাহীন করে ফেলতে পারে।

তাই হলো। আহমদ মুসা ফায়ার করার পর মুহূর্তেই তার খাটের উপরের লোকটি জ্ঞান হারাল। সে উঠে বসেছিল বিছানায়। আবার ঢলে পড়ল বিছানার উপর। তারপর ঘরের সবাই জ্ঞান হারিয়ে ফেলল।

আহমদ মুসা বেরিয়ে এল খাটের তলা থেকে।

সবার দিকে একবার তাকিয়ে ঘর থেকে বেরুবার জন্যে দরজার দিকে এগোলো আহমদ মুসা।

ঘর থেকে বেরিয়ে একটা করিডোরে পা রাখল সে। তাকাল এদিক-ওদিক। কোন্ দিকে ব্রুনার মা মানে এদের ম্যাডামের ঘর?

জ্যাকেটের পকেট থেকে আলদুনি সেনফ্রিডের এঁকে দেয়া বাড়ির ইনার স্কেচটি বের করে তার উপর চোখ বুলাল। বুঝল, তাকে বাম দিকে যেতে হবে। একটু এগোলেই আর একটা করিডোর পাওয়া যাবে। সে করিডোর ধরে পুব দিকে এগোলে আর একটা লাউঞ্জ পাওয়া যাবে। লাউঞ্জের পশ্চিম পাশে প্রশস্ত একটা স্পেস। সে স্পেসের পশ্চিম পাশে বড় একটা দরজা, বড় একটা ঘর। এ ঘরটাতেই থাকে ব্রুনার মা কারিনা কারলিন।

আহমদ মুসা ক্লোরোফরম গান বাগিয়ে ধরে করিডোর দিয়ে এগিয়ে চলল।

লাউঞ্জের দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। নজর বুলাল ভেতরের দিকে।

সেই মুহূর্তে পেছনে পায়ের শব্দ পেল আহমদ মুসা।

হাতের ক্লোরোফরম গানের ব্যারেল ঘুরাতে গিয়েছিল আহমদ মুসা। কিন্তু সেই সময়েই মাথায় স্টেনগানের নলের ভারি স্পর্শ অনুভব করল।

পেছন থেকে একটা কন্ঠ বলে উঠল, 'বোয়ার, তাড়াতাড়ি শালার কাছ থেকে রিভলবারটা কেড়ে নাও।'

আহমদ মুসা বুঝেছিল অবশিষ্ট যে দু'জন পাহারায় ছিল, তারাই তাকে ধরে ফেলেছে।

পেছনের কন্ঠটির কথা শুনেই আহমদ মুসা বলল, 'আচ্ছা, নিয়ে নাও রিভলবার।' বলেই হাতটা নিচে নামিয়ে ক্লোরোফরম গানের নল পেছনে ওদের দিকে ঘুরিয়ে পেছনে ঠেলে দিচ্ছিল হাত।

বোয়ার নামের লোকটি একটু ঝুঁকে পড়ে রিভলবার আহমদ মুসার হাত থেকে নিতে যাচ্ছিল।

হাতটা পেছনে ঠেলে দিয়েই ট্রিগার টিপেছে আহমদ মুসা।

রিভলবারের মত এর ট্রিগারে কোন শব্দ হয় না, বোতাম টেপার মতই অনেকটা নি:শব্দ।

ট্রিগার টেপার পর কয়েক মুহূর্ত। আহমদ মুসার মাথা থেকে স্টেনগানের নল সরে গেল। মেঝেতে ভারি কিছু পতনের শব্দ হলো। পেছনে তাকাল আহমদ মুসা, দু'জনের সংজ্ঞাহীন দেহ মাটিতে পড়ে আছে। তাদের স্টেনগান পড়ে আছে তাদের পাশে।

আহমদ মুসা দু'জনের সংজ্ঞাহীন দেহ এক এক করে নিয়ে তাদের ঘরে তাদের খাটে সাথীদের পাশে শুইয়ে রেখে এল। স্টেনগানও রাখল তাদের পাশে।

এবার আহমদ মুসা অনেকটাই নিশ্চিন্ত। প্রহরীরা সবাই ঘুমে। কমপক্ষে ছয় ঘন্টার আগে তাদের ঘুম ভাঙবে না। বাড়ির অন্য সদস্যেরাও ঘুমিয়ে আছে নিশ্চয়।

আহমদ মুসা রুনার মা'র ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়াল।

দরজার উপর নি:শব্দে চাপ দিল।

দরজা বন্ধ।

দরজার লকের দিকে তাকাল আহমদ মুসা।

ডিজিটাল লক, যা শুনেছিল তাই।

দরজার উপর দরজার গায়ের সাথে মেশানো একটা ডিজিটাল-লক বোর্ড। শূণ্য থেকে নয় পর্যন্ত জার্মান সংখ্যায় সাজানো ডিজিটাল বোর্ডটা।

কারিনার শোবার ঘরের দরজার নতুন কোড সম্পর্কে আলদুনি সেনফ্রিড কিছু বলতে পারেনি। তার মানে কোড তাকেই ভাঙতে হবে। কি হবে সেই কোডের সংখ্যাগুলো, কত সংখ্যার সেই কোড?

দ্রুত ভাবল আহমদ মুসা।

সময় নষ্ট করা যাবে না। আসল কাজ শুরুই করা যায়নি।

কোন নামের বর্ণের সংখ্যা দিয়েই কোড তৈরি সবচেয়ে স্বাভাবিক। আগের সেই নামগুলো ছাড়াও যে নামগুলো হতে পারে তার মধ্যে রয়েছে 'ব্রুমসারবার্গ ক্যাসল' যা স্যাক্সনদের প্রিয় দুর্গের নাম? এদের মানে খৃস্টানদের প্রোফেট 'ক্রাইস্ট' সে নামও হতে পারে। প্রহরীদের কথাবার্তায় জানা গেল,

ব্রুনাদের ‘এস্টেট’ (জমিদারি) দখলই ব্ল্যাক লাইটে’র লক্ষ। অতএব ব্রুমসার বা এ স্টেটের নামেও কোড হতে পারে। আবার ওদের সংগঠন ‘ব্ল্যাক লাইট’-

এর নামেও কোড হতে পারে। এই সব নাম নিয়ে আরেকবার ভাবল আহমদ মুসা। প্রহরী লোকদের কথা থেকে বুঝা গেল, ওরা এখানকার লোক নয়, স্টেটটা হস্তান্তর হলেই ওরা চলে যাবে। তাই যদি হয়, তাহলে ব্রুমসারবার্গ, ব্রুমসারবার্গ এস্টেট ইত্যাদি স্থানীয় কোন নাম, কোন হিরোর নাম ইত্যাদি কোড হিসাবে ব্যবহৃত হবার কথা নয়। ওদের সংগঠনের নাম ব্ল্যাক লাইট থেকে শুরু করতে চাইল আহমদ মুসা।

ডিজিটাল কী বোর্ডের দিকে হাত বাড়াল আহমদ মুসা।

কিন্তু প্রশ্ন জাগল মনে, ব্ল্যাক লাইটের ডিজিটাল কোডটা কি ধরনের হবে? ‘ব্ল্যাক লাইট’ শব্দ দু’টিতে ১০টি বর্ণ আছে। এই ‘১০’ ই কি হবে কোড নাম্বার? না, ১০টি বর্ণের প্রথম বর্ণ? প্রথম বর্ণটিকে এক ধরে পরবর্তী বর্ণগুলোর যে ক্রমিক মান দাঁড়ায়, সেগুলোর এক একটি নাম্বার কোডের ক্রমিক অংশ হবে? অথবা বর্ণগুলোর ক্রমিক নাম্বারের যোগ ফলটাও হতে পারে কোড নাম্বার। প্রথমটা ঠিক হলে ১০ হয় কোড নাম্বার। আর বিকল্প দ্বিতীয়টি কোড হলে কোড সংখ্যাটি দাঁড়ায় ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ ও শূন্য। আর এ সংখ্যাগুলোর নিজস্ব মানের যোগফল ৪৫ হয় তৃতীয় কোড সংখ্যা।

কোনটা হবে সঠিক কোড নাম্বার?

ধাঁধা’র বিচারে প্রথম ও তৃতীয়টি অধিকতর সম্ভাবনাময় কোড, দ্বিতীয়টি খুবই সাধারণ। অবশ্য সাধারণ বিষয় অনেক সময় অসাধারণ কোড হয়ে থাকে।

আহমদ মুসা ভাবল, ‘কোড-নেম’ বাছাইয়ের ক্ষেত্রে যেমন সে তার মনে পড়া নামগুলোর শেষটাকে গ্রহণ করেছে, তেমনি কোড নাম্বারের ক্ষেত্রেও শেষ কোডটাকেই গ্রহণ করা উচিত।

তাই করল আহমদ মুসা। সংখ্যা ৪৫-কেই কোড হিসাবে গ্রহণ করল।

বিসমিল্লাহ বলে আহমদ মুসা তার শাহাদাত অঙ্গুলি দিয়ে ডিজিটাল কী বোর্ডের ৪ ও ৫-এর উপর চাপ দিল।

শেষ চাপটার সংগে সংগেই দরজা নড়ে উঠল। দরজার দুই পাল্লা দুই দিকে দেয়ালের ভেতর ঢুকে গেল।

উন্মুক্ত দরজা সামনে। বেশ বড় ঘর।

ঘরের মুখোমুখি দুই দেয়ালের খাঁজে ডিম লাইট, যা চোখে পড়ে না। তবে তা থেকে বিচ্ছুরিত ভোরের আলোর মত স্নিগ্ধ আলোতে ভরে গিয়েছে ঘর।

ঘরে নজর বুলাল আহমদ মুসা।

হাতে তার বাগিয়ে ধরা ক্লোরোফরম গান।

দরজা থেকে দেখল ঘরের বাম অংশের দিকে ডিভানে শুয়ে আছে কেউ। নিশ্চল দেহ। নিশ্চয় ঘুমে অচেতন।

আহমদ মুসা ঘরে ঢুকল।

নি:শব্দে দরজা বন্ধ করে দিল।

এগোলো ডিভানের দিকে।

ডিভানের উপর অঘোরে ঘুমাচ্ছে একটি মেয়ে। দেহের গ্রোথ দেখে মনে হচ্ছে পঁয়ত্রিশ প্লাস হবে বয়স। কিন্তু চেহারা বলছে বয়স খুব বেশি হলে বিশ-বাইশের বেশি হবে না।

এই মেয়েটিই ব্রুনার মা কারিনা কারলিন।

আহমদ মুসা ক্লোরোফরম গান তুলে কারিনা কারলিনকে তাক করে একটা ফায়ার করল।

বেরিয়ে গেল সেই এক পশলা কনসেনট্রেটেড ক্লোরোফরম গ্যাস।

এবার হালকা বোধ করল আহমদ মুসা।

ক্লোরোফরম গানটা পকেটে ফেলে আহমদ মুসা তাকাল ঘরের চারদিকে।

ঘরের পূর্ব-উত্তর কোণে কাঠের একটা সুশোভিত আলমিরা ছাড়া বড় ধরনের আর কোন আসবাব পত্র নেই।

মাথার দিকে ডিভানের পাশে লাইট-টপ টেবিল। টেবিলে একটা ড্রয়ারও দেখা যাচ্ছে।

ঘরের পশ্চিম দেয়ালের দু'প্রান্তে দু'টি দরজা।

দরজা দু'টো কিসের? একটা টয়লেট হতে পারে। আরেকটা? ওটা কি ড্রেসিংরুম হতে পারে? হবে হয়তো। অতএব তাকে প্রথমে ঢুকতে হবে টয়লেটে।

কোনটা টয়লেট?

মনে পড়ল গৌরীর ডাইরির কথা। সে লিখেছে, দোতলার ল্যান্ডিং থেকে ভেন্টিলেটরের মধ্যে দিয়ে টয়লেট দেখা যায়। নিশ্চয় তাহলে দক্ষিণ পাশেরটাই টয়লেট হবে।

টয়লেটের দরজার সামনে দাঁড়াতেই দেখতে পেল, দরজার লকে চাবি। রাতে চাবি সরাবার প্রয়োজন মনে করেনি তাহলে, ভাবল আহমদ মুসা।

টয়লেটে প্রবেশ করল আহমদ মুসা।

বিরাট টয়লেট। তার এক পাশে ল্যাট্রিন। তার পাশে বাথটাব। অন্য পাশে লম্বাটে এ্যান্টিক ধরনের সুন্দর একটা টেবিল ও একটি চেয়ার। টয়লেট ও বাথ থেকে এই অংশটা সুন্দর পর্দা দিয়ে আলাদা করা।

টেবিলের উপর সব সময়ের ব্যবহার্য কিছু প্রসাধনী ছাড়া অন্য কিছু নেই।

টেবিলে দু'টি ড্রয়ার। দুই ড্রয়ারেই কী হোলে চাবি রয়েছে। তার মানে রাত বলেই হয়তো এখান থেকেও চাবি সরানো হয়নি।

খুশি হলো আহমদ মুসা। তার কাজ আল্লাহ অনেক সহজ করে দিয়েছেন।

চেয়ারে বসে প্রথম ড্রয়ারটা খুলল আহমদ মুসা।

ড্রয়ারেও নানা প্রসাধনী। তার সাথে চুলের হোয়াইট কালারের বিদেশি দামী বটল। একটা প্লাস্টিক কেইসে নতুন পুরাতন ক্ষুদ্র তুলি। এ টেবিলে আর তেমন কিছু নেই। কিছুটা হতাশ হলো আহমদ মুসা।

দ্বিতীয় ড্রয়ারটা খুলল সে।

এ টেবিলেও নানা ধরনের শিশি, প্যাকেট, ট্যাবলেট ছড়িয়ে আছে।

ড্রয়ারটি পুরোপুরি খোলার পর চামড়ার সুদৃশ্য একটা নোট-কেইসের মত কিছু একটা দেখতে পেল।

কেইসটির মুখের দিকে খোলা। ভেতরে দেখতে পেল চামড়ার একটা ফোল্ডার।

আহমদ মুসা বের করল ফোল্ডার।

কভারে কিছুই লেখা নেই। খুলল ফোল্ডার।

ফোল্ডারের বাম অংশটার অর্ধেক পর্যন্ত একটা পকেট। পকেটে কাগজ দেখা যাচ্ছে। ডান অংশটা মানি ব্যাগের মত। কেবিন আছে, কার্ড পকেট আছে বেশ কয়েকটি।

ফোল্ডারের উপর চোখ বুলাতে গিয়ে বাম অংশের বটমে কালো গায়ের উপর কালো একটা মনোগ্রাম ও কিছু লেখার উপর নজর পড়ল।

ফোল্ডারের ভেতরটা নিকষ কালো চামড়ার ও ফোল্ডারের ব্যাকটা লাল চামড়ার। ফোল্ডারটা আর একটু সামনে এনে ভালো করে দেখল।

মনোগ্রামটা পরিচিত, ব্ল্যাক লাইটের। কিন্তু লেখাটা বুঝল না। মনোগ্রামের নিচে একটু স্পেস দিয়ে কালো চামড়ার উপর কালো হরফে লেখা 'ক্লোন-৭'।

'ক্লোন-৭' বিষয়টা নিয়ে ভাবল আরও আহমদ মুসা। কিন্তু বুঝতে পারল না বিষয়টা কি। বিষয়টা চামড়ার সাথেও সংশ্লিষ্ট হতে পারে, ভাবল আহমদ মুসা।

এ চিন্তার মাঝেই আহমদ মুসা ফোল্ডারের পকেট থেকে কাগজ বের করল।

ভাঁজ খুলল কাগজটির আহমদ মুসা।

একটা প্রেসক্রিপশন।

লেটার হেডে ডাক্তারের নাম কারল হেইঞ্জ এমডি, বিশেষজ্ঞ ক্লোন মেডিসিন।

এটুকু পড়তেই ভ্রূকুঞ্চিত হলো আহমদ মুসার। ক্লোন মেডিসিনের ডাক্তারের প্রেসিক্রিপশন কেন?

আরও পড়ল প্রেসক্রিপশনটি।

বিস্মিত হলো, যার জন্যে প্রেসক্রিপশন, তার নাম নেই। শুধু লেখা 'ক্লোন-৭'।

বিস্ময়ে চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল আহমদ মুসার! তাহলে ব্রুনার মা কারিনা কারলিন কি 'ক্লোন-৭'! কেন? ক্লোনের সাথে তার সম্পর্ক কি? '৭'

শব্দটারই বা অর্থ কি? না, এটা ব্রুনার মা'র একটা সাংকেতিক নামমাত্র! এমনটা হতেও পারে।

আহমদ মুসা ড্রয়ারের ওষুধগুলোর দিকে নজর বুলাল। বিদঘুটে নামের সব ওষুধ! একটিও তার পরিচিত নয়। তবে ওষুধের প্যাকেটের পরিচয় পড়ে যা বুঝল তাতে এগুলো ক্লোন বিষয়ক কোন কিছুর ওষুধ। কিন্তু এ ওষুধগুলো ব্রুনার মা কারিনা কারলিনের ড্রয়ারে কেন? সে কি ওষুধগুলো ব্যবহার করে? কেন? ব্রুনার মায়ের জীবনের এই দিকটা সম্পর্কে তো আহমদ মুসাকে কিছুই বলা হয়নি। তার মায়ের জীবনের ছোটখাট বিষয় পর্যন্ত ব্রুনা ও তার বাবা আহমদ মুসাকে বলেছে, কিন্তু এই বিষয়টা তো বলেনি। তাহলে কি তারাও জানতো না?

আহমদ মুসার মনে হলো, এই রহস্যের সাথে ব্রুনার মায়ের আচরণের একটা ঘনিষ্ঠ যোগ থাকতে পারে। তার মায়ের এই দিকটার উন্মোচন হলে তাকে নিয়ে সমস্যা-সংকটের সমাধান পাওয়া যেতে পারে।

আহমদ মুসা তাড়াতাড়ি ডাক্তারের চেম্বারের অ্যাড্রেসের দিকে তাকাল। স্ট্রিটের নাম ফ্রেড স্ট্রিট, আর শহরের নাম অ্যারেন্ডসী।

খুশি হলো আহমদ মুসা। ডাক্তারের কাছ থেকেই ক্লোন মেডিসিন সম্পর্কে জানা যাবে।

আহমদ মুসার মনে হলো, টয়লেটে তার কাজ শেষ।

বেরিয়ে এল আহমদ মুসা টয়লেট থেকে।

এগোলো বেড সাইডের শেড-লাইটের টেবিলের দিকে।

টেবিলের ড্রয়ারটি খুলল।

তার ভেতরে টুকিটাকি অনেক কিছু দেখল। ছোট একটা মানি ব্যাগও।

ম্যানি ব্যাগ খুঁজে টাকা ছাড়া আর কিছুই দেখল না। রেখে দিল সে ম্যানি ব্যাগ।

ড্রয়ার বন্ধ করল।

চারদিকে তাকাল। দেখল ব্রুনার মায়ের বালিশের পাশে তার ছোট হ্যান্ড ব্যাগটি। এটাই খুঁজছিল আহমদ মুসা। শুনেছিল ব্রুনার কাছে, তার মায়ের হ্যান্ড ব্যাগে কাউকে সে হাত দিতে দেয় না।

হ্যান্ড ব্যাগটি নিতে কাত হয়ে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে থাকা ব্রুনার মায়ের এদিকে প্রসারিত তার দুই হাতের দিকে নজর পড়ল আহমদ মুসার। দেখল তার দুই হাতের বুড়ো আঙুলে বিশেষ ধরনের প্লাস্টিক ব্যান্ডেজ, গার্ডারের মত ফাঁপা।

হ্যান্ড ব্যাগটি নিয়ে খুলল আহমদ মুসা। ছোট্ট হ্যান্ড ব্যাগে লিপস্টিক ধরনের মেয়েদের সব সময়ের ব্যবহার্য কিছু জিনিসপত্র। তার সাথে দেখল চার ভাঁজ করা একটা কাগজ।

মাত্র কাগজটিই তুলে নিল আহমদ মুসা।

কাগজের ভাঁজ খুলে দেখল সেটাও একটা প্রেসক্রিপশন। ডাক্তারের নাম 'হের হারম্যান' প্লাস্টিক স্কিন স্পেশালিস্ট। ঠিকানা, মোবাইল ক্যাম্প, ফ্রেইড স্ট্রিট, অ্যারেন্ডসী।

আবার সেই অ্যারেন্ডসী! বিস্মিত হলো আহমদ মুসা।

আরও বিস্মিত হলো, এখানেও যার নামে প্রেসক্রিপশন, তার নামের জায়গায় লেখা হয়েছে, 'ক্লোন-৭'।

তার মানে ব্রুনার মা নিশ্চিতভাবেই 'ক্লোন-৭'! এর অর্থ তাহলে কি?

ব্রুনার মায়ের দুই হাতের দুই বুড়ো আঙুলে অদ্ভুত ধরনের ব্যান্ডেজ কেন?

হঠাৎ আহমদ মুসার মনে পড়ল প্রহরীদের কথা, 'দস্তখত ঠিক হয়ে গেছে, এখন ফিংগার প্রিন্ট ডেভলপ করছে।' বুড়ো আঙুলের ফিংগার প্রিন্ট ডেভলপ করার জন্যেই কি ঐ ব্যান্ডেজ? ঠিক, প্রেসক্রিপশনও তো প্লাস্টিক স্কিন স্পেসালিস্ট ডাক্তারের! ফিংগার প্রিন্ট ঠিক করার জন্যে প্লাস্টিক স্কিন স্পেশালিস্ট দ্বারা বিশেষ ধরনের অপারেশন বা কোন কিছু করা হয়েছে? হতে পারে।

আহমদ মুসার মনে হলো, তার এখানে আর কোন কাজ নেই। যা জানার মত তা জেনে ফেলেছে। সে রহস্যগুলো সামনে এসেছে, তার সমাধানের পরই পরবর্তী কাজের প্রশ্ন আসবে।

আহমদ মুসা প্রেসক্রিপশন, ব্যাগ যেমন ছিল তেমনিভাবে রেখে বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

বাইরে কোন সমস্যার সম্মুখীন হলো না। বুঝা যাচ্ছে, ভেতরে আর কোন প্রহরী নেই। শুধু সম্মুখের গেটেই আছে প্রহরী।

আহমদ মুসা ফিরে এল প্রহরীদের সেই কক্ষে। সংজ্ঞাহীন সবাই বেঘোরে পড়ে আছে তাদের বিছানায়।

আহমদ মুসা যে গোপন পথ দিয়ে ঢুকেছিল, সেই পথেই বেরিয়ে এল বাড়ি থেকে।

ফিরে এল নিজেদের বাড়িতে।

বাড়ির প্রধান ফটকের তালা খুলে বাড়িতে প্রবেশ করল।

ভেতরের চত্বরটা পেরিয়ে গাড়ি বারান্দা দিয়ে ওগুলো বাড়িতে প্রবেশের গেটের দিকে। দেখল দরজা খোলা, আলো আঁধারিতে দাঁড়িয়ে আছে কেউ দরজায়।

আহমদ মুসা বারান্দায় উঠতেই ছায়া মূর্তিটি নড়ে উঠল।

আহমদ মুসা দরজার কাছে যেতেই ছায়া মূর্তিটি এগিয়ে এল। দেখল সে ব্রুনা।

ব্রুনা আহমদ মুসার সামনে এসে লম্বা বাও করল। বলল, ‘ভাইয়া, আমাকে মাফ করুন। আমি বুঝতে পারিনি। আমাদের সমাজে তো দু’জন নারী-পুরুষ এমনভাবে যখন কাছাকাছি হয়, তখন তারা প্রেমিক-প্রেমিকা হয়, দৈহিক সম্পর্কই তাদের কাছে প্রধান হয়। তারা যে ভাইবোনও হতে পারে, এমন পবিত্র সম্পর্কের কথা আমাদের সমাজ ভুলেই গেছে। তাহলে আমি ভুল না করে পারি কি করে! আমাকে মাফ করুন ভাইয়া।’

ব্রুনার শেষের কথাগুলো কান্নায় জড়িয়ে গেল।

আহমদ মুসা তার মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, ‘তুমি মহাঅন্যায় করনি যে মাফ চাইতে হবে। আর আমাকে ভাইয়া বলার পর মাফ চাওয়ার কিছু থাকে না। আমি খুশি যে, তুমি তোমার সমাজের উপরে উঠে চিন্তা করতে পেরেছ। আল্লাহ তোমাকে সাহায্য করুন।’

‘এই চিন্তা করার শক্তি আপনিই দিয়েছেন ভাইয়া।’ চোখ মুছতে মুছতে বলল ব্রুনা। তার কন্ঠ ভারি।

‘সব শক্তি আল্লাহর কাছ থেকে আসে ব্রুনা।’ বলল আহমদ মুসা।

‘ভাইয়া, আপনি সব সময় সব প্রশংসা, সব কৃতিত্ব ও কর্তৃত্ব ঈশ্বর মানে আল্লাহকে দেন। মানুষের নিজস্ব কোন কৃতিত্ব, কর্তৃত্ব নেই? আপনি নিজের শক্তি, নিজের বুদ্ধিতে যা করেন, তার কৃতিত্ব কি আপনি পেতে পারেন না?’ ব্রুনা বলল।

‘যাকে আমি আমার কাজ বলি, তাতো আমি করি না। আমার হাত যা করে তার কমান্ড পায় মাথা থেকে। মাথার কমান্ড-স্ট্রাকচার কে করেছেন আর তা কার নিয়ন্ত্রণে? আল্লাহর। আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ সভ্যতার বিবেক বলে পরিচিত আর্নল্ড টয়েনবীও অবশেষে বলেছেন, মানুষের মাথা চিন্তার আকারে, ভাবনার আকারে কমান্ড পায় ঈশ্বরের কাছ থেকে। এজন্যেই সকল প্রশংসা, কৃতিত্ব আল্লাহর জন্যেই।’

আহমদ মুসা কথা শেষ করে একটু থেমে আবার বলে উঠল, ‘কিন্তু তা এখানে কি করছ? দাঁড়িয়ে কেন এখানে?’

‘ঘুমাতে গিয়েছিলাম ভাইয়া, কিন্তু ঘুমাতে পারিনি। আপনি ও বাড়িতে ঢুকে কি করছেন, কি হচ্ছে-এসব অস্থির ভাবনা আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে। আপনার পথের দিকে তাকিয়ে আছি। আর কিছু করার তো উপযুক্ত আমরা নই!’ ব্রুনা বলল। তার শেষের কথাগুলো অভিমান-ক্ষুব্ধ, ভারি।

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘আমি তোমাকে সাথে নিইনি এ কারণে যে, এমনভাবে আমাদের এক সাথে যাওয়া উচিত নয় বলে। তোমরা উপযুক্ত নও একথা ঠিক নয়। নারী-পুরুষকে আল্লাহ সমান শক্তি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। দুই পুরুষের শক্তি যেমন সমান হয় না, তেমনি নারী-পুরুষের শক্তিও সমান হয় না, এটা হয়ে থাকে নানা কারণে। নারী পুরুষের প্রকৃতিগত পার্থক্য একটাই। সেটা হলো, নারী সৃষ্টিগতভাবে দৈহিক দিক দিয়ে রক্ষণাত্নক, আর দৈহিক দিক দিয়ে পুরুষেরা আক্রমনাত্নক। এই আক্রমণের সুযোগ যাতে পুরুষরা না পায়, নারীদেরকে আক্রান্ত যাতে না হতে হয়-এজন্যে নারীদেরকে একটু সাবধানে চলতে হয়। নিজেদের দেহ-সৌন্দর্যকে পুরুষের আক্রমণাত্নক চোখের একটু

আড়ালে রাখতে হয়। নারীর প্রকৃতিগত এই বৈশিষ্ট তার যোগ্যতাকে বুদ্ধিকে অবশ্যই খাটো করেনি।'

মুগ্ধ, সম্মোহিত ব্রুনা কিছু বলতে যাচ্ছিল।

আহমদ মুসা তাকে বাধা দিয়ে বলল, 'চল, আর কোন কথা নয়। রাত শেষ হতে যাচ্ছে। ঘুমাতে হবে।'

বলে চলতে শুরু করল আহমদ মুসা।

ব্রুনাও।

চলতে চলতে ব্রুনা বলল, 'ভাইয়া, ঘুমাবেন কি করে? আপনার তো নামাজের সময় হলো।'

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ। ধন্যবাদ তোমাকে। গোসল করে ফ্রেশ হতে হতে ফজর নামাজের সময় হবে। নামাজ পড়েই ঘুমাব।' বলল আহমদ মুসা।

'ভাইয়া, আপনাদের প্রার্থনা আমার খুব ভালো লাগে। সত্যিই জীবন্ত ধর্ম আপনাদের। আল্লাহর সাথে আপনাদের সম্পর্ক সার্বক্ষণিক। আমাদের ধর্ম আমাদেরকে কোন কাজ দেয়নি। তাই ঈশ্বরের সাথে আমাদের সম্পর্কও নেই।' ব্রুনা বলল।

'ধন্যবাদ। তুমি দেখছি অনেক কিছু ভাবছ।' বলল আহমদ মুসা।

'আমি আপনাদের ধর্ম ইসলাম সম্পর্কে জানার চেষ্টা করছি। ইসলাম ও মুসলমানদের নিয়ে মানুষের মধ্যে অনেক ভুল বুঝাবুঝি আছে আমাদের দেশে। আপনাকে দেখে, আপনার কথা শুনে ইসলামকে আমি নতুন করে বুঝছি। আপনি খুশি হবেন না ভাইয়া?' ব্রুনা বলল।

'আল্লাহ খুশি হবেন।' বলল আহমদ মুসা।

'তিনি অনেক উপরে। আমি আপনার খুশির কথা বলছি।' ব্রুনা বলল।

'আল্লাহ যাতে খুশি হয়, বান্দাহ হিসাবে আমি তাতেই খুশি।' বলল আহমদ মুসা।

'আপনার ঈশ্বর প্রেম বিস্ময়কর ভাইয়া! আর কেউ মানে আমি বা আমরা কি এটা পারব?' ব্রুনা বলল।

'তোমার মনে যে এ কথা জেগেছে, এসেছে, এটাই প্রমাণ করে তুমি পারবে।' বলল আহমদ মুসা।

'ধন্যবাদ ভাইয়া। ভালো...।'

ব্রুনা কিছু বলতে যাচ্ছিল। আহমদ মুসা তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'আর কোন কথা নয়। তোমার পথ ওদিকে। যাও, এখন ঘুমাও।

'কিন্তু ভাইয়া, ভুলেই গেছি। জিজ্ঞাসা করা হয়নি আপনার অভিযানের কথা। কি হলো, প্লিজ একটু বলুন।'

'বলেছি কোন কথা নয়। এখন ঘুমাতে যাবে, ঘুমাবে। সব শুনবে সকালে।'

বলেই আহমদ মুসা দাঁড়িয়ে তার কক্ষের দিকে হাঁটা শুরু করল।

'ধন্যবাদ ভাইয়া। গুড নাইট!' পেছনে থেকে একটু উঁচু কন্ঠে বলল ব্রুনা।

সেও তার কক্ষের দিকে হাঁটা শুরু করেছে।

সকালে নিচে নেমেই হৈ চৈ শুরু করেছে কনরাড।

কনরাডকে বাড়ির ম্যাডাম কারিনা কারলিনের প্রেমিক মনে করা হয়। তার আচার-আচরণে বাড়ির লোকেরা এটাই মনে করে। সে মাঝে মাঝে এ বাড়িতে আসে। আসলে থাকে দোতলায় ব্রুনা কিংবা আনালিসার ঘরে। তাছাড়া সারা দিনই থাকে কারিনা কারলিনের সাথে।

হৈ চৈয়ের কারণ হলো সে উপর থেকে নেমে প্রহরীদের কাউকে পায়নি। নির্দিষ্ট স্থানগুলোতে ২৪ ঘন্টা পাহারার ব্যবস্থা। কিন্তু কনরাড এসে ম্যাডাম কারিনা কারলিনের ঘরের সামনেও কোন প্রহরী পায়নি। প্রহরীদের ঘরে গেছে। প্রহরীদের সবাইকে তাদের ঘরে ঘুমন্ত অবস্থায় পেয়েছে। ডাকাডাকি, চিৎকার-চেঁচামেচি করেও তাদের জাগাতে পারেনি।

অন্যদিকে ডাকাডাকি করেও কারিনা কারলিনের দরজা খোলানো যায়নি। অবশেষে ব্ল্যাক লাইট-এর মাস্টার কোড ব্যবহার করে তার ঘরে ঢুকেছে কনরাড। কারিনা কারলিনকেও ঘুমন্ত পেয়েছে কনরাড। ডাকাডাকি করে তাকেও তোলা যায়নি।

ইতিমধ্যে ব্ল্যাক লাইট কর্তৃপক্ষের যারা এ বাড়িতে ছিল, তারও এসে গেছে। ব্যাপার কি বুঝতে না পেরে ডাক্তার ডাকা হয়েছে।

ডাক্তার বলেছে, এক ধরনের ক্লোরোফরম গ্যাসের প্রভাবে তারা সবাই সংজ্ঞা হারিয়েছে। ডাক্তারের বিশেষ চেষ্টার পর তাদের সংজ্ঞা ফিরেছে। কিভাবে সংজ্ঞা হারায় তা দু'জন প্রহরী ছাড়া আর কেউ বলতে পারেনি। কারিনা কারলিনও নয়। দু'জনের জবান বন্দী থেকে কনরাডরা জানতে পেরেছে, কে একজন লোক বাড়িতে ঢুকেছিল। তারা তাকে পেছন থেকে জাপটেও ধরেছিল। কিন্তু কিভাবে যেন তারা দু'জনও সংজ্ঞা হারায়। লাউঞ্জের দরজায় তারা লোকটাকে জাপটে ধরেছিল। কিন্তু সেখানেই তারা সংজ্ঞা হারায়। কিভাবে তারা তাদের বিছানায় যায় তা তারা জানে না।

কারিনা কারলিন জ্ঞান ফিরে পেয়ে বলে যে, সে ঘুমিয়েছিল, সংজ্ঞা হারিয়েছিল কিনা সে জানে না। কিন্তু তার ঘরের বাতাস পরীক্ষা করে প্রমাণিত হয়েছে এক ধরনের ক্লোরোফরম গ্যাস ঘরের বাতাসে রয়েছে। ঘন্টা চারেক আগে এ গ্যাসের ঘনত্ব সংজ্ঞা লোপ করার মত অবশ্যই ছিল।

কিন্তু কেউ ভেবে পেল না মুক্ত বাতাস প্রবেশ করতে না পারা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে কিভাবে এমন ধরনের গ্যাস প্রবেশ করতে পারে।

বিষয়টা নিয়েই আলোচনায় বসেছে কারলিন, কনরাডসহ ব্ল্যাক লাইটের উপস্থিত কর্তা ব্যক্তিরা।

কারিনা কারলিন বলছিল, 'আমার ঘরসহ বাড়ির সব ঘর চেক করা হয়েছে, কিন্তু কোন জিনিস খোয়া যায়নি।'

'কিন্তু লোক তো এসেছিল, এটা ঠিক, দু'জন প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য এটা। তারা জড়িয়েও ধরেছিল তাকে। এ ঘটনা মিথ্যা নয়।' বলল কনরাড।

‘তাহলে কেন এসেছিল? এতগুলো লোককে সংজ্ঞাহীন করল কোন্ উদ্দেশ্যে? দু’জনে তাকে আগে দেখতে পাওয়ার পরও পেছন থেকে আক্রমণ করার পরও মাত্র একজনকে যখন আটকাতে পারেনি, তখন সেই লোকটি খুব সাধারণ নয়।’ বলল ব্ল্যাক লাইটের উপস্থিত একজন কর্মকর্তা।

‘তোমার কথা ঠিক। কিন্তু অসাধারণ এই লোকটি কে? কেন ঢুকেছিল এ বাড়িতে? কোন দিক দিয়ে ঢুকেছিল?’ বলল ব্ল্যাক লাইটের আর একজন।

‘ঠিক তো, সে কোন্ দিক দিয়ে ঢুকেছিল? সামনের গেট বন্ধ ছিল। গেট-বক্সে ছিল সিকুরিটির লোক। গোটা রাতে এ গেটে কেউ আসেনি। সেকেন্ড গেটেও সার্বক্ষণিক পাহারায় ছিল লোক। এ দু’গেটে ছাড়া বাড়ির ভেতরে ঢোকার, কোন ঘরে প্রবেশের দ্বিতীয় কোন পথ নেই। সারা রাতে এ দুই গেটে কেউ আসেনি। তাহলে এ লোক কোন দিক দিয়ে ঢুকল?’ বলল কনরাড।

‘এ বাড়িতে ঢোকার আর তো কোন পথ নেই। লোকটি তাহলে বাইরে থেকে আসেনি?’ কারিনা কারলিন বলল।

ভ্রূকুঞ্চিত করলো কনরাড। বলল, ‘ভেতর থেকে আবার কে হবে? প্রহরীদের কেউ? ওরা এই বিশেষ ধরনের ক্লোরোফরম পাবে কোথায়? আর তারাও তো সংজ্ঞাহীন ছিল।’

‘কিন্তু প্রশ্ন হলো, সে যেই হোক, কিছু চুরি করেনি, কাউকে খুন করেনি, তাহলে সে ঢুকেছিল কেন?’

প্রশ্নটার জবাব দিল না কেউ।

নিরব সবাই।

বেশ কিছুক্ষণ পর মুখ খুলল কনরাড। বলল, ‘বিষয়টি বস ব্ল্যাক বার্ডকে জানানো দরকার। যা ঘটেছে বিষয়টি ছোট নয়। শীর্ষ পর্যায়ের তদন্ত হওয়া প্রয়োজন।’

‘আমিও তাই মনে করি।’ বলল কারিনা কারলিন।

‘ঠিক আছে। এটাই এখন এই অবস্থায় করণীয়।’ বলল সবাই।

‘ঠিক আছে। ধন্যবাদ সবাইকে।’

বলে উঠে দাঁড়াল কারিনা কারলিন।

সবাই উঠল।

আহমদ মুসা এসে বসল সোফায়।

সামনের সোফায় ব্রুনা ও ব্রুনার বাবা আলদুনি সেনফ্রিড আগেই এসে বসেছিল।

মাঝের টেবিলে তিনটি কাপ ও কফি পট ছিল।

আহমদ মুসা বসতেই ব্রুনা একটু সামনে ঝুঁকে পড়ে তিন কাপ কফি ঢেলে একটি আহমদ মুসার দিকে তুলে ধরে বলল, 'ভাইয়া আপনি চা, কফি কিছুই খেতে চান না। সারা রাত পরিশ্রম করার পর গোসল করে ফ্রেশ হয়ে লম্বা ঘুম দিয়েছেন। এখন খাওয়া-দাওয়ার পর এই গরম কফি খুব ভালো লাগবে।'

পিতাকে কফির অন্য কাপটি দেয়ার পর নিজে একটি নিয়ে সোফায় সোজা হয়ে বসল ব্রুনা।

'ধন্যবাদ ব্রুনা, সত্যি ইচ্ছা করছিল কফি খেতে।' বলে আহমদ মুসা কফির কাপ তুলে নিল।

'ভাইয়া, আপনার সম্পর্কে কিছুই জানি না। কিছু জানার কি চেষ্টা করতে পারি?' বলল ব্রুনা।

'না, ব্রুনা। এখন উনি একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন। এ সময় ওকে বিরক্ত করো না।'

ব্রুনার বাবা আলদুনি সেনফ্রিড বলল।

'বাবা, ঐ গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শুরু করলে কফি খাওয়া হবে না। ভাইয়াও তো বললেন কফি খেতে তারও ইচ্ছা করছে। কফি খাওয়ার পর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা মানাবে ভালো।' বলল ব্রুনা ।

'ঠিক আছে। তুমি ভালো বলেছ ব্রুনা। কিন্তু ব্রুনা, হঠাৎ তুমি ওকে 'ভাইয়া' বলছ, অনুমতি নিয়েছ?' ব্রুনার বাবা আলদুনি সেনফ্রিড বলল।

‘মুসলমানদের মধ্যে কুলিন ও অকুলিন নেই। তারা একে অপরের ভাই, বোন। সুতরাং অনুমতির দরকার নেই। তবু তিনি তাঁকে ভাইয়া বলার অনুমতি দিয়ে আমাকে গৌরবান্বিত করেছেন বাবা।’ বলল ব্রুনা। তার কন্ঠ আবেগ-রুদ্ধ হয়ে উঠেছিল।

‘ধন্যবাদ ব্রুনা। এবার তুমি প্রশ্ন করো।’ আলদুনি সেনফ্রিড বলল।

ব্রুনা নিজেকে সামলে নিয়েছে।

সংগে সংগে অবশ্য কথা বলল না।

ব্রুনা হেসে উঠে তার কফির কাপটা পিরিচে রাখতে রাখতে বলল, ‘ভাইয়া, আপনার কে কে আছে? কোথায় থাকেন, এসব বিষয় জানার আমার খুব কৌতুহল।’

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘সেটা খুব ভালো খবর নয় ব্রুনা। রক্তের সম্পর্ক যাদের সাথে থাকে, তাদের যদি আত্নীয় বলা হয়, তাহলে সে ধরনের কোন আত্নীয় আমার নেই। আছে স্ত্রী, একটি লাভলী শিশুপুত্র। আমাদের একটি পবিত্র শহর মদিনায় তারা থাকে। এই হলো সংক্ষিপ্ত বিবরণ।’ থামল আহমদ মুসা।

‘ধন্যবাদ ভাইয়া, কিন্তু সব কথা হয়নি।’

‘আমি জানি, এটুকু সব কথা নয়। বাকিটা ভবিষ্যতের জন্যে থাকল।’

বলেই আহমদ মুসা কফির কাপ পিরিচের উপর রেখে সোজা হয়ে বসল। বলল, ‘কফি খাওয়া প্রায় শেষ, এখন কাজের কথা আমরা শুরু করতে পারি।’

‘হ্যাঁ, মি. আহমদ মুসা, আমরা রাত থেকেই উদগ্রীব হয়ে আছি, আপনি ফেরার পর উদ্বেগ যদিও এখন নেই।’ বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

‘হ্যাঁ, মি. সেনফ্রিড, আমিও উদগ্রীব কিছু জিজ্ঞাসার জবাব পাওয়ার জন্যে। ও বাড়িতে ঢুকে জানার চেয়ে জিজ্ঞাসাই বেশি সৃষ্টি হয়েছে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘বলুন মি. আহমদ মুসা।’ বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

‘বাড়িতে ঢুকে প্রথমে আমাকে যে ঘরে পা রাখতে হলো, সেটা একটা হল ঘর। চৌদ্দটি বিছানা পাতা খাটে। সেখানে...।’

আহমদ মুসার কথার মাঝখানে ব্রুনা বলে উঠল, 'আপনি কিভাবে ঢুকলেন সেটা তো বললেন না? কিভাবে ধাঁধা ভাঙলেন? এটাই সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং ও শিক্ষামূলক।'

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'আমি কথা সংক্ষিপ্ত করতে চেয়েছিলাম। ঠিক আছে, সংক্ষেপে সব কথাই বলি।'

আহমদ মুসা একটু থেমে আবার শুরু করল, 'কোন ঘর বা কোন স্থান থেকে গোপন পথ শুরু হয়েছে, তা খুঁজে পেতে খুব বেশি দেরি হয়নি আমার। তারপর....।'

আহমদ মুসার কথার মাঝখানে ব্রুনা আবার বলে উঠল, 'কিভাবে পেলেন? কোন প্রকার চিহ্নের কথা তো বাবা বলেননি?'

'বলেননি। ঘরগুলোর অবস্থান, জানালাগুলোর স্থান পর্যবেক্ষণ করে যে স্থানকে সন্দেহ করি, ঠিক সেখানেই খুঁজতে খুঁজতে ডিজিটাল লক পেয়ে যাই। কোড...।'

আহমদ মুসার কথার মাঝখানে আবার কথা বলে উঠল ব্রুনা। বলল, 'স্যরি ভাইয়া! ঘরগুলো ও জানালাগুলো পর্যবেক্ষণ করে কিভাবে কোন স্থানটিকে সন্দেহে করলেন?'

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'গোয়েন্দা হতে চাও নাকি? ঠিক আছে। তোমাদের বাড়ির একতলার দক্ষিণ দিকে বেড়ে যাওয়া তিন ঘরের দক্ষিণ দেয়ালে ১টি করে ৩টি জানালা আছে। চতুর্থ জানালাটি আছে পুবের ও মাঝের ঘরের মধ্যবর্তী স্থানের দেয়ালে। কিন্তু পশ্চিম প্রান্তের ও মাঝের ঘরের মধ্যবর্তী অনুরূপ স্থানের দেয়ালে কোন জানালা নেই। এটা নির্মাণ সামঞ্জস্য বিধানের দিক থেকে একটা বড় ধরনের ভারসাম্যহীনতা। এই ভারসাম্যহীনতা কেন? এই উত্তর খুঁজতে গিয়ে আমার মনে হয়, এই দেয়ালকে অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। এ থেকেই আমি মনে করেছি, এই দেয়ালেই গোপন পথের প্রবেশ পথ রয়েছে।'

আহমদ মুসা থামতেই আবার প্রশ্ন করতে যাচ্ছিল ব্রুনা।

আহমদ মুসা তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'আর কোন প্রশ্ন নয় ব্রুনা। তুমি যা জানতে চাও সবই বলব।'

একটু থেমে শুরু করল আহমদ মুসা। বলল কি করে পাথরের দেয়ালে ডিজিটাল কী বোর্ড খুঁজে পেল, কিভাবে কয়েকবার ব্যর্থ হবার পর কোড-ধাঁধা ভাঙতে পারল, তার ঘরের ভেতরের আলমারির ধাঁধার কথা বলল। সেটার সমাধান করে কি করে বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেল তা জানাল। তারপর প্রহরীদের সংজ্ঞাহীন করার কথা, দুই প্রহরী দ্বারা আক্রান্ত হবার কথা, ব্রুনার মায়ের ঘরে ঢোকার জন্যে কিভাবে তার দরজার ডিজিটাল লকের ধাঁধা ভাঙল। সব বলল আহমদ মুসা। ঘরে ঢুকে সন্ধানের সুবিধার জন্যে ব্রুনার মাকে ক্লোরোফরম ফায়ার করে সংজ্ঞাহীন করার কথা বলল। ঘরে সন্ধান করে কি পেয়েছে, কি দেখেছে তা বলে থামল আহমদ মুসা।

ব্রুনা ও তার বাবা অবাক বিস্ময়ের সাথে আহমদ মুসার কথা শুনছিল।

আহমদ মুসা থামতেই ব্রুনা অনেকটা সন্দেহের সুরে বলে উঠল, 'দক্ষিণ দেয়াল ও মা'র ঘরের দরজার প্রকৃত কোড কিভাবে পেলেন? কোড দু'টি কি?'

'কিভাবে পেলাম? চিন্তা করলে তুমিও পাবে। তোমার মায়ের দরজার কোডটা অংকের ধাঁধা, আর দক্ষিণ দেয়ালের কোডটা অক্ষরের ধাঁধা। কোড দু'টি কি তা এখন শুনতে চেয়ো না, তাহলে ও বাড়িতে ঢোকার ইচ্ছা হয়ে যেতে পারে। সমস্যা কেটে গেলে কোড দু'টি জানিয়ে দেব। তোমাদের বাড়ির কোড তোমাদের না জানলে চলবে কি করে?' আহমদ মুসা বলল।

'ঠিক বলেছেন মি. আহমদ মুসা! ব্রুনা, তুমি ছোটবেলা থেকেই অ্যাডভেনচারাস। তোমার না জানাই ভালো এখন।' বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

'ঠিক আছে বাবা। আমি বুঝেছি। কিন্তু আমার একটা বিস্ময় কাটছে না, তাড়াহুড়া ও টেনশনের মধ্যে কিভাবে সঠিক কোডটি আপনার মাথায় এল ভাইয়া?' ব্রুনা বলল।

'আল্লাহর সাহায্যে ব্রুনা। মানুষ যখন উপায়হীন অবস্থায় পৌঁছে, তখন আল্লাহ মানুষের সহায় হয়ে দাঁড়ান।'

'সব সময়ই?' ব্রুনার জিজ্ঞাসা।

'সব সময়ই, যদি মানুষ চায়।' আহমদ মুসা বলল।

'না চাইলেও আল্লাহ এই সাহায্য দেন না?' বলল ব্রুনা।

'দেন, আবার না দিতেও পারেন। 'আল্লাহ' নাম ছাড়া আল্লাহর আরও অনেক নাম আছে। তার মধ্যে দু'টি নাম হলো 'রাহমান' ও 'রাহীম'। দুই নামের অর্থ 'দয়ালু' ও 'দাতা'। এই দুই নামের ফাংশন ভিন্ন। 'রাহমান' হিসাবে আল্লাহ মানুষসহ সব সৃষ্টির প্রতি অত্যন্ত দয়ালু। এই দয়া তার কাছে চাইতে হয় না। সূর্যের কিরণ, চাঁদের আলো, পানির যোগান, খাদ্যের উৎস, দেহের প্রকৃতিগত স্বয়ংক্রিয়তা, বাতাসের সরবরাহ প্রভৃতি সব কিছুই আল্লাহর এই দয়ার ফল। তাঁর সৃষ্টিসমূহ রক্ষার জন্যে আল্লাহ এই দয়া দিয়ে থাকেন। কিন্তু 'রাহীম' হিসাবে আল্লাহর যে দয়া তা তাঁর কাছে চাইতে হয়। তুমি বিপদে পড়েছ, তখন তোমাকে আল্লাহর সাহায্য চাইতে হবে। যেমন খাদ্য নেই, তাঁর সাহায্য চাইতে হবে। তুমি....।'

আহমদ মুসা থেমে গেল। তার কথার মাঝখানেই কথা বলে উঠেছে ব্রুনা। বলল সে, 'না চাইলে সাহায্য এখানে তিনি কেন দেন না?'

'কারণ মানুষ যেমন বিপদ সৃষ্টি করে, বিপদ চাপায়, তেমনি মানুষ বিপদ থেকে মুক্ত হবারও সামর্থ্য রাখে। সেই সামর্থ্য ব্যবহার করে বিপদ থেকে মুক্ত হতে হবে।' আহমদ মুসা বলল।

'কিন্তু মানুষ যদি চেষ্টা করেও তার সামর্থ্য দিয়ে মুক্ত হতে না পারে, খাদ্য যোগাড় করতে না পারে, তাহলে?' বলল ব্রুনা।

'আল্লাহর সাহায্য চাইতে হবে। এজন্যেই নির্দেশ হলো, সব সময় সব ক্ষেত্রে চেষ্টার সাথে সাথে আল্লাহর সাহায্যেরও প্রত্যাশী হতে হবে। মানুষের সামর্থ্য যেখানে শেষ হয়, আল্লাহর সাহায্য সেখানে শুরু হয়।' আহমদ মুসা বলল।

'আরেকটা কথা ভাইয়া, আপনি বললেন, রাহমান হিসাবে আল্লাহ না চাইতেই তাঁর সৃষ্টির জন্যে পানি, খাদ্যের সরবরাহ দেন। কিন্তু বাতাস, সূর্যের রোদ যেভাবে আমরা পাই, পানি, খাদ্য তো সেভাবে পাই না? পানি ও খাদ্যের সংকট সৃষ্টি হয় কেন?' বলল ব্রুনা।

'বাতাস, রোদ থেকে পানি ও খাদ্যের মত বস্তু কিছুটা ভিন্ন। সৃষ্টির জন্যে আল্লাহ পানি ও খাদ্যের ব্যবস্থা দুনিয়াতে করেছেন। কিন্তু সে পানি ও খাদ্য মানুষকে উৎপাদন বা সংগ্রহ করতে হয়। আজ দুনিয়াতে এই উৎপাদন ও সংগ্রহ অবাধ নয়। ব্যক্তি, গোষ্ঠী, জাতি ও দেশগত বিভেদ সৃষ্টি করে এই উৎপাদন ও সংগ্রহের অবাধ প্রবাহকে বাধাগ্রস্ত করা হয়েছে। সংকট সৃষ্টি হওয়ার কারণ এখানেই। অংক কষে দেখতে পার, যে কোন যুগ বা কালের মানুষের সংখ্যা দিয়ে দুনিয়ার খাদ্যকে ভাগ করে দেখ খাদ্য উদ্বৃত্ত থাকবে। তবু দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে অনেক মানুষ খাদ্য সংকটে পড়ে, পড়বে। এ সংকট মানুষের তৈরি।' আহমদ মুসা বলল।

'চমৎকার ভাইয়া! অপরূপ এক তথ্য দিলেন। ধন্যবাদ আপনাকে ভাইয়া। এখন বলুন, এর সমাধান কি?' বলল ব্রুনা।

'সমাধান এক কথায় বলা যাবে না। আমাদের ধর্মে মানে ইসলাম ধর্মে আল্লাহ এর সমাধান দিয়েছেন দু'ভাবে-নৈতিক ও আইনি। এটা জানার জন্যে তোমাকে অনেক পড়াশুনা করতে হবে।' আহমদ মুসা বলল।

ব্রুনার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তার পরেই একটা দুষ্টুমি জেগে উঠল তার চোখে-মুখে। বলল, 'তাহলে তো ভাইয়া মুসলমান হয়ে যেতে হবে।'

'আমি তোমাকে মুসলমান হতে বলিনি। সমাধান খুঁজতে বলেছি।' আহমদ মুসা বলল। তারও ঠোঁটে হাসি।

'কেন বলবেন না মুসলমান হতে? আপনি তো মুসলমান।' বলল ব্রুনা। তার কন্ঠ ভারি, অভিমানের সুর তাতে।

'মুসলমান হওয়া না হওয়া ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের ব্যাপার ব্রুনা।' আহমদ মুসা বলল।

'কেন বড় ভাই ছোট বোনকে নির্দেশ দিতে পারে না?' বলল ব্রুনা।

'সব ব্যাপারে নয় ব্রুনা।' আহমদ মুসা বলল।

কথা শেষ করেই আহমদ মুসা আবার বলে উঠল, 'আর কোন কথা নয় ব্রুনা। কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমাদের আলোচনা হতে হবে।'

‘ব্রুনা, অনেক সুন্দর ও ভারি বিষয় তুমি শুনেছ ওর কাছে। আমারও খুব ভালো লেগেছে। এস, সেগুলো আমরা হজম করি। ওকে কথা বলতে দাও।’ বলল ব্রুনার বাবা আলদুনি সেনফ্রিড।

‘ঠিক বলেছেন বাবা।’ বলে চুপ করে গেল ব্রুনা। গা এলিয়ে দিল সোফায়।

আহমদ মুসা শুরু করল, ‘আমি ঐ বাড়ির যে বিবরণ আপনাদের দিয়েছি, যা আমি জেনেছি, তাতে কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সামনে এসেছে। যেমন, আপনাদের স্টেট হস্তান্তরিত হচ্ছে। তারপর ওরা সবাই এখান থেকে চলে যাবে। দ্বিতীয়ত, এই হস্তান্তরে সমস্যা দেখা দিয়েছে স্বাক্ষর ও বুড়ো আঙুলের টিপসহি নিয়ে। প্রশ্ন হলো, ব্রুনার মা তার স্টেট বিক্রি করছেন কেন? কোথায় যাচ্ছেন তিনি? আর স্বাক্ষর ও টিপসহি নিয়ে সমস্যা হবে কেন? তৃতীয়ত, ব্রুনার মায়ের ড্রয়ারে ক্লোন মেডিসিন পাওয়া গেছে। তার ওয়ালেট ফোল্ডারে, তার প্রেসক্রিপশনে তাকে ক্লোন-৭ বলে অভিহিত করা হয়েছে। তার দুই হাতের বুড়ো আঙুলে অদ্ভুত ধরনের ব্যান্ডেজ এবং তার হ্যান্ড ব্যাগে পাওয়া গেছে প্লাস্টিক স্কিন বিশেষজ্ঞের একটা প্রেসক্রিপশন। তাতেও ব্রুনার মাকে ক্লোন-৭ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো, তাকে ক্লোন-৭ বলা হচ্ছে কেন? ক্লোন মেডিসিন কেন তার টেবিলে? তার দুই বুড়ো আঙুলে কি হয়েছে? কেন তিনি প্লাস্টিক স্কিন বিশেষজ্ঞের চিকিৎসা নিচ্ছেন?’

বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেছে ব্রুনা ও তার বাবার মুখ। তাদের স্টেট বিক্রি, স্বাক্ষর ও টিপসহি নিয়ে সমস্যা, ক্লোন-৭, ক্লোন চিকিৎসা-এ সব কিছুই তাদের হতবাক করে দিয়েছে। কিছুক্ষণ তারা কথাই বলতে পারলো না।

অবশেষে কথা বলল আলদুনি সেনফ্রিড। বলল, ‘আমার স্ত্রী, ব্রুনার মা’র সাথে এসব কোন কিছুই মিলছে না মি. আহমদ মুসা। আপনি যে বললেন, টয়লেটের টেবিলের ড্রয়ারে ওষুধ পেয়েছেন। কিন্তু কারিনা কারলিন কোন দিন ওখানে ওষুধ রাখেননি। পারিবারিক স্টেট বিক্রির কোন প্রশ্নই ওঠে না। ব্রুনার মা এমন চিন্তা করতেই পারেন না। আর ব্রুনার মা যদি স্টেট হস্তান্তর করতেই চান, তাহলে স্বাক্ষর ও টিপসই প্রব্লেম হবার কথা নয়। শুধু সমস্যা হতে পারে আমাদের

দুই সন্তান ও আমাকে নিয়ে। কারণ আমরা বেঁচে থাকা অবস্থায় তার স্টেট হস্তান্তর পূর্ণাংগ হবে না। পারিবারিক দলিলে আছে, যিনি স্টেটের মালিক হবেন, তিনি স্টেট হস্তান্তরের অধিকারী হলেও তার উত্তরাধিকারীদের সম্মতি না থাকলে স্টেট হস্তান্তর আইনসিদ্ধ হবে না।' বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

আহমদ মুসা উদগ্রীবভাবে কথাগুলো শুনছিল। তার চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। বলল, 'ধন্যবাদ মি. সেনফ্রিড, আমার চিন্তার সাথে আপনার কথাগুলো সংগতিপূর্ণ। তিনটি বড় বিষয় এখন আমাদের সামনে। এক, ব্রুনার মায়ের স্টেট বিক্রি করাসহ অদ্ভুত সব পরিবর্তন কেন? দুই, তার ক্লোন মেডিসিন নেয়া, প্লাস্টিক স্কিন বিশেষজ্ঞের প্রেসক্রিপশন গ্রহণ করা ও তার বুড়ো দুই আঙুলে প্লাস্টিক ব্যান্ডেজের রহস্য কি? আর তিন, স্টেট হস্তান্তরে স্বাক্ষর টিপসই নিয়ে যে সমস্যা হয়েছে, তার সাথে ব্রুনার মায়ের প্লাস্টিক স্কিন চিকিৎসা ও দুই বুড়ো আঙুলের ব্যান্ডেজের সম্পর্ক আছে কি না? আসলে এই তিনটি বিষয় মিলে একটাই মেগা সাবজেক্ট আমাদের কাছে, সেটা হলো ব্রুনার এই মা আসলে ব্রুনার মা কিনা? এই মহাপ্রশ্নের...।'

আহমদ মুসার কথার মাঝখানেই আলদুনি সেনফ্রিড বলে উঠল, 'স্যরি মি. আহমদ মুসা, ব্রুনার মায়ের অনেক পরিবর্তন হয়েছে ঠিক। কোন কারণ হয়তো এর জন্যে দায়ী। কিন্তু আপনি কি তাকে ব্রুনার মা নয় বলে সন্দেহ করেন?'

'আমি নিশ্চিত নই এখনও মি. আলদুনি সেনফ্রিড, কিন্তু এই সন্দেহের পাল্লাই আমার কাছে ভারি বেশি।' আহমদ মুসা বলল।

'কিন্তু ভাইয়া, আমার মনেও অনেক সন্দেহ, এরপরও আমি মনে করি আমার মা ঠিক আছে। কিন্তু তার ভেতরে কিছু ঘটেছে বা ঘটানো হয়েছে। আর যে কোন কারণেই হোক একটা চক্রের দ্বারা ঘেরাও। এই চক্রের হাত থেকে মাকে উদ্ধার করতে পারলে এবং তার চিকিৎসা করালেই তিনি সুস্থ হয়ে যাবেন।' বলল ব্রুনা।

'আমিও তোমাদের মত করে ভেবে আসছিলাম। কিন্তু সেই ভাবনা রাখতে পারছি না। আমার নিশ্চিতই মনে হচ্ছে, আধুনিক বিজ্ঞানের এক

অপব্যবহারের মাধ্যমে তোমার মায়ের জায়গায় অন্য কাউকে এনে বসানো হয়েছে।' আহমদ মুসা বলল।

আঁৎকে উঠে সোজা হয়েছে ব্রুনা ও তার বাবা আলদুনি সেনফ্রিড। তাদের চোখে-মুখে বিস্ময়! বলল ব্রুনা, 'মায়ের বদলে অন্য কাউকে? কিভাবে? বিজ্ঞানের অপব্যবহারটা কি?'

'এখন পর্যন্ত আমার এটা নিছকই সন্দেহ যে, তোমার এই মা তোমার আসল মায়ের ক্লোন।'

আহমদ মুসার কথা শেষ হতেই 'মায়ের ক্লোন?' বলে আর্ত চিৎকার করে উঠে দাঁড়িয়েছে ব্রুনা। পরক্ষণেই আবার ধপ করে বসে পড়েছে সোফায়।

আলদুনি সেনফ্রিডেরও দুই চোখ বিস্ময়ে ছানাবড়া হয়ে গেছে।

দু'জনেরই কেউ কিছুক্ষণ কথা বলতে পারল না।

আহমদ মুসাও কোন কথা বলল না। ওদেরকে বিস্ময়টা হজম করার সুযোগ দিল।

আলদুনি সেনফ্রিড নিরবতা ভেঙে এক সময় বলে উঠল, 'এ কি সম্ভব মি. আহমদ মুসা?'

'তাহলে আমার মা গেল কোথায়?' কান্না জড়িত কন্ঠে বলল ব্রুনা।

'ক্লোন সায়েন্স অনেক দূর এগিয়েছে। কোন বিজ্ঞানী বা কিছু বিজ্ঞানী গোপনে হয়তো একে আরও এগিয়ে নিয়েছে। তবে যা বলছি তা নিশ্চিত নয়। আরও সন্ধান করলেই তা বুঝা যাবে। কিন্তু বিরাট এক রহস্য যে ব্রুনার এই মাকে ঘিরে তৈরি হয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। যে দু'টি প্রেসক্রিপশনের কথা বললাম, সে দুই ডাক্তারের নামও ভুয়া হতে পারে। আমি রাতে অভিযান থেকে ফিরেই ইন্টারনেটে 'অ্যারেন্ডসী' শহরের ডাক্তারের তালিকা বের করে দেখেছি, ঐ দুই নামে কোন ডাক্তার 'অ্যারেন্ডসী'তে নেই। তবে ঐ বিষয়ের ডাক্তার আছে অ্যারেন্ডসীতে।'

'তাহলে? ডাক্তারের মাধ্যমে সন্ধান নেবার পথও তাহলে থাকল না।' বলল আলদুনি সেনফ্রিড হতাশ কন্ঠে।

'সেপথ বন্ধ হলো বটে, অন্য পথ আল্লাহ খুলে দেবেন। আমাদের যেতে হবে অ্যারেন্ডসীতে। আমার মনে হচ্ছে, অ্যারেন্ডসীই হতে পারে কাহিনীর গোড়া।'

আলদুনি সেনফ্রিড ও ব্রুনা দু'জনেই নিরব। দু'জনেরই মুষড়ে পড়া ভাব।

আহমদ মুসাও ভাবছিল।

নিরবতা ভাঙল আহমদ মুসা। বলল, 'মি. সেনফ্রিড, ব্রুনার মার সাথে যখন আপনার বিয়ে হয়, তখন তার বয়স কত ছিল?'

'বিশ বছর। জার্মান স্টান্ডার্ডে আমাদের বিয়েটা বেশ আগেই হয় বলা যায়।' বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

'বিয়ের পর কি তিনি এমন কোন বড় অসুখে পড়েছিলেন যখন তাকে দশ পনের দিন হাসপাতালে থাকতে হয়েছে?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

'না, এমন কোন অসুখ হয়নি। হামবুর্গ হাসপাতালে তার ভর্তির বিষয়টা তো আমি আপনাকে বলেছি। এর আগে কখনো তাকে কোন হাসপাতালে থাকতে হয়নি।' বলল সেনফ্রিড।

'কিন্তু বাবা, বিয়ের আগে মা হাসপাতাল ছিলেন বেশ কিছুদিন।' বলল ব্রুনা।

'হতে পারে। বিয়ের পরের কথা আমি বললাম।'

'হামবুর্গ হাসপাতালে মা যখন ছিলেন, তখন কথায় কথfয় একদিন বলেছিলেন যে, এই হাসপাতালে আমি আর এক বার ছিলাম বন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালে সবে তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলাম। অনেক পুরানো এই হাসপাতাল।' বলল ব্রুনা।

'তখন বয়স কত ছিল?' জিজ্ঞাসা করল আহমদ মুসা।

'আঠার-ঊনিশ হবে।' বলল ব্রুনা।

'বন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তেন। কিন্তু হামবুর্গ হাসপাতালে কিভাবে এসেছিলেন?' আহমদ মুসা বলল।

'মার কাছে শুনেছি, বন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীরা এসেছিল হামবুর্গে শিক্ষা সফরে। মা হঠাৎ বিশেষ ধরনের নিউরালজিক পীড়ায় আক্রান্ত হয়েছিলেন, যার চিকিৎসায় হামবুর্গ জেনারেল হাসপাতাল ছিল স্পেশিয়ালাইজড।' বলল ব্রুনা।

'আর এবার তিনি কেন হামবুর্গ হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন?' আহমদ মুসা বলল।

'হঠাৎ ঐ বিশেষ ধরনের নিউরালজিক পীড়ায় আক্রান্ত হলে তাকে হামবুর্গ জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।' বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

'এবং এই পীড়ার চিকিৎসায় হামবুর্গ জেনারেল হাসপাতাল স্পেশালাইজড।' আহমদ মুসা বলল।

'ঠিক তাই।' বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

'এই দু'বার ছাড়া কি আর কখনো তিনি এ পীড়ায় আক্রান্ত হয়েছিলেন?' আহমদ মুসা বলল।

'আর কখনো তার ঐ রোগ হয়নি।' বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

ভ্রূকুঞ্চিত হলো আহমদ মুসার। দু'বারই হামবুর্গে অবস্থানকালে তার এমন রোগ হয়েছে, যে রোগের জন্যে হামবুর্গ জেনারেল হাসপাতাল স্পেশালাইজড। এই দুই ঘটনা কি কাকতালীয়, না এর পেছনে কোন পরিকল্পনা বা ষড়যন্ত্র ছিল? ষড়যন্ত্র হলে কি ষড়যন্ত্র, কেন ষড়যন্ত্র? এর সাথে ক্লোনের কি কোন সম্পর্ক আছে? থাকলে সেটা কি, কিভাবে? হিউম্যান ক্লোনিং-এর বেশ কয়েকটি পদ্ধতি আছে। ক্লোন সম্পর্কিত তার সন্দেহ সত্য হলে সে ক্লোনটা কিভাবে হয়েছে। আহমদ মুসার মনের অদৃশ্য এক প্রান্ত থেকে একটা কথা ভেসে এল, ভেড়া 'ডলি' থেকে ক্লোন করে ১৯৯৬ সালে আরেকটা হুবহু 'ডলি' তৈরি হয়েছিল 'নিউক্লিয়ার ট্রান্সফার ক্লোন' পদ্ধতিতে, সেই পদ্ধতিই কি এখানে ব্যবহার করা হয়েছে?

আহমদ মুসার মনে হলো, হ্যাঁ, এই পদ্ধতির ব্যবহার হতে পারে। কিন্তু এই বিষয় তদন্ত সাপেক্ষ। এমন দীর্ঘমেয়াদী ষড়যন্ত্র হলে তার পটভূমি কি ইত্যাদি অনেক প্রশ্ন রয়েছে। তবে বড় একটা কিছু ঘটেছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

আহমদ মুসা গভীর ভাবনায় ডুবে গিয়েছিল।

ব্রুনা অস্থির হয়ে কথা বলতে গিয়েছিল।

তার বাবা আলদুনি সেনফ্রিড ইংগিতে নিষেধ করেছে সংগে সংগেই। এ কয়েক দিনে আলদুনি সেনফ্রিড আহমদ মুসার এমন ভাবনায় ডুবে যাওয়ার সাথে পরিচিত হয়েছে। এই সময়টা আহমদ মুসার জন্যে মূল্যবান।

আহমদ মুসাই এক সময় চোখ তুলে তাকাল আলদুনি সেনফ্রিডের দিকে। বলল, 'মি. সেনফ্রিড, ব্রুমসারবার্গের কাজ আপাতত আমাদের শেষ। আমাদের পরবর্তী কাজ 'অ্যারেন্ডসী'তে। সেখান থেকে হামবুর্গেও মাঝে মাঝে যাওয়ার দরকার হবে। আজ রাতেই আমরা যাত্রা করব 'অ্যারেন্ডসী'র উদ্দেশ্যে।'

'ওখানে কি কাজ হবে আমাদের?' আলদুনি সেনফ্রিড বলল।

'ঐ দুই ডাক্তারের খোঁজ করা। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে রহস্যের জট ওখানেই থাকতে পারে! হামবুর্গ হাসপাতাল থেকেই যদি ঘটনার শুরু হয়ে থাকে তাহলে ঘটনার কেন্দ্র ওখানেই।' বলল আহমদ মুসা।

'আমরা কি এ বাড়ি ছেড়ে দেব?' বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

'না, আমাদেরই থাকবে। আগাম কয়েক মাসের ভাড়া ওদের দিয়ে দিন। ওদের বলুন, বাইরে একটু কাজ আছে। কাজ শেষে আমরা ফিরে আসব।'

'ঠিক আছে মি. আহমদ মুসা। আমি সব ব্যবস্থা করছি।' আলদুনি সেনফ্রিড বলল।

'ঠিক আছে। আমি তাহলে উঠছি।' বলে আহমদ মুসা উঠতে গেল। ব্রুনা বলে উঠল, 'ভাইয়া, আমার আসল মা কি বেঁচে আছেন, যদি ইনি আমার মা না হন?'

আহমদ মুসা তাকাল ব্রুনার দিকে। ব্রুনার চোখ অশ্রুসজল। আহমদ মুসা বলল নরম কন্ঠে, 'তুমি এসব চিন্তা করে মন খারাপ করো না। আমরা যেসব ভাবছি সবই ধারনার উপর। কোন কিছুই এখন নিশ্চিত নয়। আল্লাহ না করুন ইনি যদি তোমার মা না হন, তাহলে আমি বলছি, আমার মন বলছে, তোমাদের স্টেট হস্তান্তর না হওয়া পর্যন্ত তিনি বেঁচে থাকবেন।

'আর এর মধ্যে যদি স্টেট হস্তান্তর হয়ে যায়?' বলল ব্রুনা।

আহমদ মুসা সংগে সংগে উত্তর দিল না। ভাবছিল সে। ব্রুনার প্রশ্নটায় যুক্তি আছে। অবশেষে আহমদ মুসা বলল, 'আল্লাহ আমাদের সাহায্য করছেন। ভবিষ্যতেও তিনি আমাদের সাহায্য করবেন। আমরা তাঁর উপর ভরসা করছি ব্রুনা।'

'কোন কিছু মানুষের যখন সাধ্যের মধ্যে না থাকে, তখনই তো তাঁর সাহায্য আসে, আপনি বলেছেন। নিশ্চয় তিনি আমাদের সাহায্য করবেন।' বলল ব্রুনা অশ্রুরুদ্ধ কন্ঠে।

'আমিন!' বলে আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল।

ব্রুনা ও তার বাবাও উঠল।

৭

ব্রুনার মায়ের ঘরের সামনের লাউঞ্জ।

লাউঞ্জের সোফায় বসে আছে ব্রুনার মা কারিনা কারলিন, তার প্রেমিক কনরাড এবং এই বাড়িতে অবস্থানকারী ব্ল্যাক লাইট-এর আরও দু'জন কর্মকর্তা।

তাদের সবার চোখে-মুখে উৎকন্ঠা।

সেদিন রাতে এ বাড়িতে কে প্রবেশ করেছিল, সে বাইরের বা ভেতরের কেউ কিনা, কি জন্যে প্রবেশ করেছিল, কোথায় কোথায় গেছে, এসব ব্যাপারে বিশদ তদন্ত হয়েছে গতকাল সারা দিন ধরে। ব্ল্যাক লাইটের নিজস্ব বিশেষজ্ঞের সাথে বাইরের বিশেষজ্ঞও আনা হয়েছিল। কারিনার গোটা ঘর টয়লেটসহ সন্দেহজনক বাড়ির সকল স্থানের জুতা ও হাতের আঙুলের ছাপ নেয়া হয়েছে অত্যাধুনিক কেমিকেল ও অত্যাধুনিক মাইক্রো লেন্স ক্যামেরা ব্যবহার করে। খুঁটে খুঁটে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে সকলকে, বিশেষ করে প্রহরীদের।

এই তদন্তের আজ রেজাল্ট আসবে।

রেজাল্ট দেবেন স্বয়ং ব্ল্যাক বার্ড।

রেজাল্টটি কার মাধ্যমে আসবে কিভাবে তা তারা জানে না। তাদের নেতা ব্ল্যাক বার্ডের স্বাভাবিক আওয়াজ তাদের কেউ শোনেনি । দেখেনিও কেউ তাকে। সবার কাছে সে অদৃশ্য এক মহাশক্তি। সবার কাজ সে দেখে, সবার কথাও সে শোনে। কেউ যেহেতু তাকে দেখেনি, কেউ তার কথা শোনেনি, তাই সবাই আতংকে থাকে তাদের চারপাশের যে কেউ হতে পারে তাদের সেই নেতা। সবাই তাই সাবধানে কথা বলতে, কাজ করতে ও চলতে-ফিরতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। কেউ কখনো বেফাঁস কাজ করলে, কথা বললে তার ডাক পড়ে কোর্ট মার্শালে। তারপর সে আর ফিরে আসে না। ক্ষমা বলে কোন শব্দ নেই ব্ল্যাক বার্ডের অভিধানে। তবে কর্মীদের পারিশ্রমিক দেয়ার ব্যাপারে অত্যন্ত হাতখোলা। এখানে সাধারণ কর্মীরাও জার্মানির মন্ত্রীদের চেয়ে বেশি বেতন পায়। এ কারণেই সব কর্মী

কাজে আন্তরিক। যে কোন ঝুঁকি নিয়ে তারা কাজ করে। কেউ দায়িত্ব পালনকালে নিহত হলে তার পরিবার প্রতিপালনের সব দায়িত্ব নেয়া হয়। এই কারণে ব্ল্যাক বার্ডের কঠোর সাজাকে বিনা বাক্যে মেনে নেয় সব কর্মী।

উপস্থিত যারা লাউঞ্জে, তাদের সবাই অপেক্ষা করছে রেজাল্টের।

কারিনা কারলিন তার হাতঘড়ির দিকে তাকাল। ১১টা বাজতে ৫ মিনিট বাকি। ঠিক ১১ টায় রেজাল্ট আসবে বলে জানানো হয়েছে। তাহলে আর ৫ মিনিট বাকি, কেউ তো এল না। কখন আসবে, কখন রেজাল্ট দেবে!

কারিনা কারলিন তাকাল কনরাডের দিকে।

আর মাত্র দু'মিনিট বাকি।

কনরাড তার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আছে। তার কথার অন্যথা তিনি করেন না।

এগারটা বাজল।

ঘড়ির ঘন্টার কাঁটা ১১টা এবং মিনিট ও সেকেন্ডের কাঁটা ১২টায় পৌঁছার সংগে সংগে কারিনা কারলিন ও কনরাডর সামনে লাউঞ্জের দেয়াল কথা বলে উঠল।

কারিনা কারলিন, কনরাড সকলের বিস্ময়বিমূঢ় চোখ আঠার মত গিয়ে দেয়ালের উপর আটকে গেল। দেয়ালের ভেতর থেকে ধাতব কন্ঠ ভেসে এল, 'কনরাড, লাউঞ্জের দুই দরজা বন্ধ করে দাও। লাউঞ্জকে সাউন্ডপ্রুফ করা হয়েছে দরজা খোলা রাখার জন্যে নয়।

কনরাড দৌড়ে গিয়ে দুই দরজা বন্ধ করে দিয়ে এল। দেয়ালের কন্ঠ আবার কথা বলে উঠল, 'কক্ষের সবাই শোন, সেদিন রাতে বাইরের কেউ একজন বাড়িতে ঢুকেছিল। কোন দিক দিয়ে ঢুকেছিল তার কোন হদিস করা যায়নি। প্রহরীদের ঘর, লাউঞ্জ, মধ্যবর্তী করিডোর এবং কারিনা কারলিনের ঘর ও টয়লেট ছাড়া আর কোথাও তার জুতার ছাপ ও ফিংগার প্রিন্ট পাওয়া যায়নি। কি করে সে এভাবে ভেতরে উড়ে এল সে রহস্যের উন্মোচন হয়নি। ভেতরের কেউ যে এর সাথে জড়িত নয় ফিংগার প্রিন্ট ও জুতার ছাপ থেকে তা প্রমাণিত হয়েছে। বাড়ির কিছুই খোয়া যায়নি। প্রমাণিত হয়েছে সে অন্য কোন ঘরে কোন কিছুতেই হাত

দেয়নি। শুধু কারিনা কারলিনের বেডসাইড টপ টেবিলের ড্রয়ার হাতড়েছে, কারলিনের হ্যান্ড ব্যাগ খুঁজেছে, হ্যান্ড ব্যাগের ভেতরের প্রেসক্রিপশন সে হাতে নিয়েছে, টয়লেটের টেবিলের দুই ড্রয়ারই খুলেছে সে। টেবিলের ওষুধগুলোর কোন কোনটি সে হাতে নিয়েছে। ড্রয়ারের ভেতরে ফোল্ডার ওয়ালেটটা সে হাতে নিয়েছে, খুলেছে, ভেতরের আরেকটা প্রেসক্রিপশনও হাতে নিয়েছে। কিন্তু কিছুই নেয়নি সে। কারিনা কারলিনের বেডসাইড টেবিলের ড্রয়ার ও তার হ্যান্ড ব্যাগ মিলে লক্ষাধিক মার্ক ছিল। কিন্তু টাকায় সে হাত দেয়নি।

এ থেকে সুস্পষ্ট, যে এসেছিল তার একমাত্র টার্গেট ছিল কারিনা কারলিনের পরিচয় সন্ধান করা, তার সম্পর্কে জানা। যেসব জিনিস সে হাতে নিয়েছে, দেখেছে তাতে কতটা কি বুঝেছে সে, তা জানা যাচ্ছে না। কিন্তু প্রমাণ হলো যে, কারিনা কারলিনই এখন তাদের টার্গেট। তারা কারিনা কারলিনকে পুরোপুরিই সন্দেহ করেছে। তার বা তাদের পরবর্তী টার্গেট কি জানা যাচ্ছে না। তবে আমাদের করণীয় সম্পর্কে এখনি সচেতন হতে হবে। প্রথম কাজ হলো, কারিনা কারলিনের নিরাপত্তা। ধরে নিতে হবে কারিনা কারলিন যখন তাদের টার্গেট, তখন তাকে কিডন্যাপ তারা করতে পারে সব জানার জন্যে। সুতরাং এই মুহূর্তেই তাকে শিফট করতে হবে আমাদের এক নাম্বার স্থানে। তার স্টেট হস্তান্তরের দিনই শুধু তাকে নিয়ে যাওয়া হবে। দ্বিতীয় কাজ হলো, জুতার ছাপ ও ফিংগার প্রিন্ট পাঠানো হলো। লোকটিকে খুঁজে বের করতেই হবে।ব্রুমসারবার্গের প্রতিটি বাড়ি খুঁজতে হবে। তাকে খুঁজে বের করতেই হবে। কারিনা কারলিনের মেয়ে ব্রুনা ও তার বাবা আলদুনি সেনফ্রিডকেও খুঁজে বের করলেই লোকটিকে খুঁজে বের করা যাবে। লোকটি যে নকল আহমদ মুসাই হবে, সে আশংকাই বেশি। তৃতীয় কাজ হলো, কারলিনের স্টেট হস্তান্তরের কাজ দ্রুত করা। আর চতুর্থ কাজের কথা বলছি কারলিনকে, তার ঘরের ডিজিটাল লকের কোড শত্রুপক্ষ জানল কি করে! এটা একমাত্র কারিনা কারলিন ছাড়া এ বাড়ির আর কেউ জানে না। তাহলে কোডটা কেমন করে গেল তাদের হাতে, সেটা কারলিন কিছু জানে কিনা। কারও কাছে কোডটার কথা সে বলেছে কিনা। পরবর্তী বিষয় হলো, সেদিনের ঘটনার

অনুসন্ধান অব্যাহত থাকবে। কি করে সে বাড়িতে ঢুকল, কোন পথ দিয়ে ঢুকল? তা খুঁজে বের করতে হবে। কথা শেষ। কথাগুলো মনে রেখ।'

দেয়ালের কন্ঠ বন্ধ হয়ে গেল।

স্তম্ভিত সবাই গোগ্রাসে গিলছিল দেয়ালের কথাগুলো।

কথা বন্ধ হয়ে গেলেও সবাই নির্বাক।

মাথা নিচু করে বসেছিল কারিনা কারলিন।

অবশেষে নিরবতা ভাঙল কারিনা কারলিনই। ধীরে ধীরে মাথা তুলে বলল সে, 'ডিজিটাল লকের কোড ভেঙে ঘরে কি করে কোন মানুষ ঢুকতে পারে?

সেনফ্রিড ও ব্রুনারা চলে যাবার পর আমার ঘরের ডিজিটাল লকের কোড চেঞ্জ করা হয়েছে। এর কোড আমি ও বস ছাড়া আর কেউ জানে না। তাহলে কেউ ঘরে ঢুকল কি করে?'

'ঘরে কেউ ঢোকা যখন প্রমাণিত হয়েছে, তখন কেউ কোড ভেঙেই সে ঘরে ঢুকেছে। বুঝা যাচ্ছে কারলিন যিনি ঘরে ঢুকেছেন তিনি অসাধারণ লোক। দেখ, লক্ষাধিক মার্ক হাতের কাছে পেয়েও যে ছোঁয় না সে অসাধারণ নি:সন্দেহে।' বলল কনরাড।

'ভয়ে আমার বুক কাঁপছে। ইচ্ছা করলেই তো সে আমাকে কিডন্যাপ করতে পারতে! ঠিক সিন্ধান্ত হয়েছে। এখানে আমি আর দু'দণ্ডও থাকতে চাই না। একটা কথা ভাবছি, আমাদের সাথে টক্কর দিতে এসেছে ওরা কারা? একা ঐ লোকটির পক্ষে তো এটা সম্ভব নয়। আর সেনফ্রিড, ব্রুনারা তো এসব ক্ষেত্রে অপদার্থ। তাহলে কাদের ওরা সাহায্য নিল?' কারিনা কারলিন বলল।

যাদেরই সাহায্য নিক কোন লাভ হবে না। আর ক'টা দিন। স্টেটটা হস্তান্তর হয়ে গেলে তুমি আড়ালে চলে যাবে। তখন ওরা দৌড়াদৌড়ি করে কিছু করতে পারবে না। আর এর মধ্যে দেখো, ব্রুনা ও তার বাপকে আমরা ধরে ফেলব। কয়েক বার হাত ফসকে বেরিয়ে গেছে। আর পারবে না।'

কারিনা কারলিন কিছু বলার জন্যে হাঁ করেছিল। সে সময়েই তার মোবাইল বেজে উঠল। মোবাইলের স্ক্রীনের দিকে একবার তাকিয়েই ভীত-

চকিতভাবে নিজের অজান্তেই যেন দাঁড়িয়ে গেল। আর সেই সাথে মোবাইলে সে বলছিল, 'ইয়েস স্যার, আমি বিন্দী ব্রিজিট। কোন হুকুম স্যার?'

'তুমি বিন্দী ব্রিজিট নও, তুমি কারিনা কারলিন। দ্বিতীয়বার এই ভুল করলে শুট করব।' বলল ওপার থেকে ব্ল্যাক বার্ড।

ভয়ের প্রবল চাপেই হয়তো সে ধপ করে দেয়াল ধ্বসে পড়ার মত বসে পড়ল। বলল কম্পিত কন্ঠে, 'ইয়েস স্যার, আপনার ইচ্ছার অধীন আমরা।'

'শোন, আমাদের গোয়েন্দা সূত্রে আমি খবর পেয়েছি, আলদুনি সেনফ্রিড, ব্রুনা ও তাদের সাথের সেই কালপ্রিটটি গত রাত ১২টার দিকে ব্রুমসারবার্গ থেকে রাইন পার হয়ে উত্তরের হাইওয়ে ধরে যাত্রা করেছে। রাইনের সংশ্লিষ্ট টোল অফিস ও আমাদের অফিস থেকে জানা গেছে সেনফ্রিডদের গাড়ি রাইন পার হয়েছে। আমি আশংকা করছি তারা অ্যারেন্ডসীর দিকে আসছে কিনা। অ্যারেন্ডসীর নাম তোমার প্রেসক্রিপশনে দুই ডাক্তারই ভুল করে লিখে দিয়েছিল।' বলল ও প্রান্ত থেকে ব্ল্যাক বার্ড।

'তাহলে আপনার নির্দেশ স্যার?' কারিনা কারলিন বলল।

'তুমি ও কনরাড আজকেই হামবুর্গ চলে এস। তোমার আঙুলের আর কতটুকু প্রব্লেম আছে তা দেখে তাড়াতাড়ি আঙুল রেডি করে ফেলা দরকার। কোনও ভাবেই আর সময় নেয়া যাবে না। ঐ দুই বাপ-বেটিকে যদি এই মুহূর্তে ধরা নাও যায়, তবু স্টেটের হস্তান্তর করে ফেলতে হবে। কথা শেষ।' ও প্রান্ত থেকে কল অফ হয়ে গেল।

মুহূর্ত কয়েক আশ্বস্ত কারিনা কারলিন তাকাল কনরাডের দিকে। বলল, 'আজই আমদের হামবুর্গ যাত্রা করতে হবে।'

'কোন খারাপ খবর আছে কি?' কনরাড বলল।

'খারাপ নয়, তবে আমার মনে হচ্ছে আমাদের চেয়ে দ্রুত চলছে আমাদের শত্রুরা। আর ঘটনার কেন্দ্র আমাদের কেন্দ্রের দিকেই আগাচ্ছে মনে হচ্ছে। রাইনের তীর থেকে ঘটনা যাচ্ছে অ্যারেন্ডসীর দিকে।' বলল কারিনা কারলিন।

বলে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, ‘চিন্তা কর না কারিনা কারলিন, রাইনের চেয়ে অ্যারেন্ডসী অনেক বেশি শীতল।’ দু’জনেই লাউঞ্জ থেকে বেরুল।

পরবর্তী বই

রাইন থেকে অ্যারেন্ডসী

কৃতজ্ঞতায়ঃ

1. Zareen Firdegar Chowdhury
2. Md. Jafar Ikbal Jewel